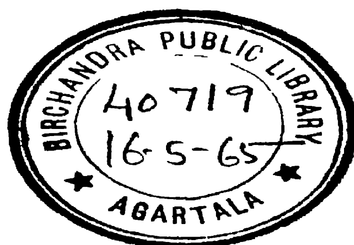
মেরু তুষারজয়ী নটিলাস

কমাণ্ডার উইলিয়ম আর এণ্ডারসন
ও
ক্লে ব্লেয়ার

অনুবাদক
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য



মিত্রালয়
১২ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মিত্রালয়, ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে সত্যশঙ্কর ভট্টাচার্য কর্তৃক
প্রকাশিত ও সোমা প্রকাশন ২-এ কেদার দত্ত লেন হইতে বাবুলাল
প্রামানিক কর্তৃক মুদ্রিত।

দিকে ডুবো পথে পাড়ি দেওয়ার আগের গোছগাছ নিয়ে মেতে রয়েছে—যাত্রার পূর্বক্ষণের নানা কাজ! আমি, নির্ধারিত পানামার পথে রওনা হওয়ার তোড়জোড় করার কথাই ওদের বলেছি—কোন্ পথে কিভাবে চলা হবে তারও ছক করে দিয়েছি। আমার কার্যনির্বাহক অফিসার লেঃ কমাণ্ডার ফ্র্যাঙ্ক এ্যাডাম্‌স্ এবং আমি—আমরা দুজনেই জুলাই-এর তিন তারিখ সন্ধ্যেবেলায় পানামাতে খাওয়ার নেমতন্ন নিয়ে বসেছি, সবদিক থেকেই পানামা যাত্রার নিশ্চয়তা নিয়ে গোলমাল নেই। এ্যাডাম্‌সের বাড়ি মিসিসিপি অঞ্চলে, ছিপ্‌ছিপে লম্বা মানুষটি আস্তে আস্তে কথা বলে যেন শান্ত নদীর ঢেউ। নটিলাসের জাহাজীরাও মনে মনে আশা করে রয়েছে তাদের উপহার উপঢৌকনগুলো পানামার দোকানপাট থেকে আদায় করে নেবে। এই তো মাস দুয়েক হল আমরা পানামার খাল বেয়ে এসেছি—সেই সময়ে খালের আনাচে-কানাচে জাহাজীরা হরেক কিসিমের মাল জমা করে রেখে এসেছে। এখন সেগুলো আদায় করে নিতে হবে!

আমাদের নটিলাসের পরমাণু চালিত ইঞ্জিনে হাওয়ার দরকারই হয় না। এ এমন এক যন্তর যে, এক দফায় একবারও ওপরে না উঠে, অবলীলাভরে পাথর-কঠিন জমাট বরফের তলা দিয়ে লম্বা চলে যেতে পারবে, অবশ্য এটা বৈজ্ঞানিকতত্ত্বে সম্ভবপর বলে অনুমানসিদ্ধ। নটিলাসের হালহকিকৎ হদ্দ বেতরিণ—যাকে বলে টিপ্‌টপ কন্‌ডিশন। এখনও পর্যন্ত নটিলাস ১১৫০০০ মাইলের ওপর জলপথের দৌড়দারিতে ছিটেফোঁটাও গাফিলী করে নি। একেবারে পোষা পায়রার মতো নির্ঝঞ্ঝাটে চলেছে—এবং বেশীর ভাগ দৌড়ই জলের তলায় ডুব-সাঁতার, এর মধ্যে একবারও তাকে নতুন ইন্ধন জোগানোর দরকার হয় নি। এ কথা অকপটে জাহির করলে সত্যের অপলাপ হবে না যে, পরমাণু শক্তির ওপর ষোল আনা নির্ভরশীল নটিলাস প্রমাণ করেছে—পরমাণু শক্তির প্রয়োগকুশলতা। এতটুকু খুঁত নেই!

তাহলে কি হয়, যিনি এর শক্তি-জনিত্র (Power-plant) পরিকল্পনা করেছিলেন এবং গড়েছিলেন সেই রিয়ার এ্যাড্‌মিরাল এইচ্. জি. রিকোভার এখনো এই জাহাজের ওপর দস্তুরমতো খবরদারী চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর তদারকীর অন্ত নেই। 'শুভদিনের যাত্রা'র সম্ভাবনা যে কয়েকজনের জানা আছে তার মধ্যে রিকোভারও একজন—বিশেষ করে

সেইজন্তেই তিনি জাহাজের শক্তি-জনিত্রকে চূড়ান্ত নিখুঁত রাখার জন্যে উদ্ব্যস্ত। ফলে, সিয়াট্‌লে আমরা যে ক'দিন রয়েছি, রোজই জাহাজের খুঁটিনাটি যন্তরপাতির আঁতি-পাতি বহালৃতবিয়ৎ টেলিফোন মারফতে রিকোভারকে জানাতেই হচ্ছে। ভদ্দরলোকের এমন নজর যে, কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না—অত দূর থেকে অন্তর্দৃষ্টির তীক্ষ্ণ দূরবীন দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবকিছু তিনি দেখবেনই।

সেদিন, আমি যখন শেষ হুকুমের জন্যে হাঁ-করে বসে রয়েছি, তখন হঠাৎ এ্যাড্‌মিরাল রিকোভার উড়ে চলে এলেন সেই ওয়াশিংটন থেকে—সরেজমিনে পরিদর্শন না করে ছাড়বেন না তিনি। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কৌতূহলী নজরে জনিত্রের গায়ের ওপর হাত রেখে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলেন, আর সেইসঙ্গে এঞ্জিনিয়ারদের এলোপাথাড়ি প্রশ্নের বর্ষণবানে নাস্তানাবুদ করতে লাগলেন। আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসার লেঃ কমাণ্ডার পল আর্লি যতক্ষণ ধরে প্রতিক্রিয়াশক্তির কর্মকুশলতা পরখ করবার জন্য জটিল যন্ত্রপাতিগুলো খুঁটিয়ে দেখছিলেন, ততক্ষণ ধরে রিকোভার ঠায় আর্লির পাশে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করলেন। এবং আর্লির পরীক্ষা চুকলো, তিনি যন্ত্রের অবস্থাকে ষোলআনা যাত্রার উপযুক্ত মনে করে নিশ্চিন্ত হলেন—বরং বলা যায় যে, শক্তি-জনিত্রের কাজ আগের চেয়ে আরো ভালোভাবে চলছে, এটাই সিদ্ধান্ত করলেন আর্লি, তখন আমি এবং এ্যাডমিরাল রিকোভার আমার খাস কামরায় ফিরে এলাম। তিনি আমার বিছানার ধারে বসলে পরে, দরজাটা বন্ধ করে আমি সিন্দুকের ভেতর থেকে মেরুসন্নিহিত অঞ্চলের নক্‌শা বার করলাম। এবং যদি শুভদিনের যাত্রা আদৌ বাস্তবে ঘটে তাহলে আমি কোন্ পথ ধরে কিভাবে চলব সেটা অল্প কথায় বুঝিয়ে দিতে লাগলাম। নক্‌শার উপর আঁক কেটে মোটামুটি খসড়ার হিসেব দিলাম—জমাট বরফের প্রান্তে পৌঁছবার সময়, উত্তর মেরুতে পৌঁছবার সময় এবং বরফের তলা দিয়ে আমাদের গ্রীন্‌ল্যাণ্ড সমুদ্র পরিক্রমার সমাপ্তির আনুমানিক সময়ের হিসেবও কষে দেখিয়ে দিলাম। অনেক আগে থেকেই আমি মনে মনে দু-তরফা সময়ের অঙ্ক কষে স্মৃতিতে সাজিয়ে রেখেছি—একটা হল সাধারণ বিবেচনায় যে সময়ের মধ্যে আমরা যাত্রা সমাধা করতে পারব বলে আন্দাজ করে

রেখেছি, আর একটি অন্যের জন্যে। অর্থাৎ যে অল্প জনকয়েকের কাছে আমাদের অভিযানের কথা বিশ্বাস করে বলতে পারি, তাদের কাছে এমন সাবধানে হিসেব দেব যে, যদি যথেষ্ট বিলম্বও হয় আমাদের চলতে-ফিরতে তাহলেও সেই সময়ের ওপারে পা পড়বে না। তাহলে তাদের মনে তেমন কোনও আশঙ্কা বা দুশ্চিন্তার মেঘও দেখা দেবে না। এ্যাডমিরাল রিকোভারের নক্‌শাতে আমি শেষোক্ত সময়ের অঙ্কই বসিয়ে দিলাম। তারপর নক্‌শাটিকে ভাঁজ করে একখানা খামে পুরে দিলাম—খামের উপর আগেই লেখা ছিল 'একান্ত গোপনীয়।' খামখানা তাঁর কাগজ-পত্র বোঝাই ব্রীফকেসের মধ্যে রাখতে রাখতে রিকোভার আমাকে বোঝাতে লাগলেন, যদি বরফের মধ্যে চরম বিপদে পড়ি আমরা তাহলে অনন্যোপায় অবস্থায় কি উপায়ে (রিএ্যাক্‌টর) প্রতিক্রিয়া যন্ত্রের ব্যবহার করতে হবে। তিনি যা বলতে চান তা আমার জানতে বাকী নেই ; মোদ্দা পুরশ্চালন জনিতের গুরুতর ক্ষতিকে গ্রাহ্য না করে জাহাজ আর নাবিকদের রক্ষা করতে হবে, এই হল তাঁর কথা।

বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর অভ্যাস-মাফিক প্রশ্ন করলেন, আমার জন্য তাঁকে কিছু করতে হবে কিনা। একটি কাজের কথাই আমার মনে পড়ল। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের নেভী লীগ আমাকে সুদৃশ্য সোনার রিষ্টওয়াচ উপহার দিয়েছে। ওয়াশিংটনে ফিরে ঘড়িটা আমার স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেন তো ভাল হয়, বলে ঘড়িটা তাঁকে দিলাম।

এ্যাড্‌মিরাল রিকোভার চলে যাবার ঠিক এক ঘণ্টা পরে আমি নটিলাসের প্রশস্ত ওয়ার্ডরুমে গিয়ে হাজির হলাম। প্রথম সাবমেরিন ফ্লোটিলার কমাণ্ডার, ক্যাপ্টেন জে, সি, ডেম্‌সের কানে কানে আস্তে বললাম—"দেখুন মশাই, আমার মনে হচ্ছে সময় হয়েছে।"

আমরা দুজনের নামে রিয়ার এ্যাডমিরাল এল, আর, ডাসপিটের কাছে টেলিফোনে সংযোগ চাইলাম—ডাসপিট হচ্ছেন ডুবো দরিয়ার সমরশক্তির নৌ-দপ্তরের পরিচালক, সাবমেরিনের সর্বময় কর্তা। ওয়াশিংটনে তাঁর বাড়িতে এ্যাডমিরালকে পাওয়া গেল। আমাদের বক্তব্য খুব সংক্ষিপ্ত, "নটিলাস যাত্রার জন্য তৈরী।" মুহূর্তকাল অপর তরফের কোনো সাড়া ছিল না।

অধীর আগ্রহের দুঃসহ যন্ত্রণায় আমার দেহ মন একাকার। আমি ভাবছি: আজ পর্যন্ত, এমন পাকাপোক্ত ভাবে আরও কোনও জাহাজ অভিযাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে পারে নি।

উত্তর দিকে আমাদের যাত্রার হুকুম দেওয়া ছাড়া অন্য কথা উঠতেই পারে না।

সেই স্তব্ধ মুহূর্ত যেন অনন্তকালের সীমাকে স্পর্শ করেছিল—আমার কাছে অপর প্রান্তের সাড়া আসতে বাস্তবে হয়তো বিশেষ সময় লাগে নি, কিন্তু আমার কাছে এই মুহূর্তের প্রতীক্ষা যেন যুগ-যুগান্তরের বিলম্বিত ধৈর্যের পরীক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারপর এ্যাডমিরাল ডাসপিট সাধারণ পুরনো ব্যবহারমলিন বাক্যগুলো উচ্চারণ করলেন—"শুভ দিনের যাত্রায় এগিয়ে যাও"; যে প্রচণ্ড গুরুত্ব এই কথা ক'টির মধ্যে নিহিত রয়েছে সেটুকু অবশ্য ডাসপিটের কণ্ঠের অকৃত্রিম গাম্ভীর্যে প্রতি-ধ্বনিত হয়ে উঠল। তা হলে ইংলণ্ড! ইংলণ্ডে আমরা যাচ্ছি—মেরু সন্নিহিত জমাট বরফের মধ্য দিয়ে, উত্তর মেরুর মধ্য দিয়ে ইংলণ্ডে যাচ্ছি আমরা।

মাসের পর মাস এই 'শুভদিন যাত্রা'র ব্যাপার নিয়ে ঠায় কাটিয়ে দিয়েছি! আহার নিদ্রাও ভুলে গিয়েছিলাম, শুধু এই অভিযানের ভাবনা আমায় ভূতের মতো পেয়ে বসেছিল। তাই 'এ্যাডমিরাল ডাসপিটের কথাগুলোর ষোল আনা গুরুত্ব আমার মগজে পৌঁছবার অনেক আগেই ফোনটা নামিয়ে রেখেছি, টেরও পাই নি। অভিযানে যাত্রার নির্দেশ আমার আদৌ অবাক করে নি। একটা স্বস্তির নিশ্বাস!

নৌ-বিভাগের সুদীর্ঘ ইতিহাসে দুঃসাহসিক অভিযাত্রার নজীর বিরল। এরকম কেন, কোনও রকম দুসাধ্য সংকল্পই নৌ-বিভাগের কার্যসূচীতে মেলা দুষ্কর—কি যুদ্ধের মধ্যে, কি শান্তির সময়ে। সেই জন্যেই আমার উদ্বেগ ছিল, কোনও একটা অজুহাতে যদি আমাদের অভিযানের পরি-কল্পনা ফেঁসে যায়! সেই উদ্বিগ্ন আতঙ্কের হাত থেকে নিষ্কৃতি মিলেছে। সেই মুহূর্তে যদি সামনের দিকে তাকিয়ে দেখার মতো দূরদৃষ্টি আমার থাকত, যদি টের পেতাম যে আমাদের নটিলাসের ভাগ্যে চূর্ণবিচূর্ণ ও নিশ্চিহ্ন হওয়াটা বাস্তবে প্রায় সম্ভব এবং জাহাজের উপর যতগুলি প্রাণী

বেঁচে রয়েছে তাদের প্রাণ মুছে যাওয়াটা খুব স্বাভাবিক—এই বোধটুকু আমার মনের গোচর হলে, বোধ হয় এতটা উৎসাহ আর প্রসন্নতায় আমি মশগুল হতে পারতাম না। সে যা-ই হোক, সেই সময়ে আমার খুব স্ফূর্তি হয়েছিল।

ক্যাপ্টেন ডেম্প্‌সের কাছে বিদায় নেবার মুহূর্তে আমার মনে এক ঝলক আলো পড়ল যেন—আমার ভাগ্যের সঙ্গে নটিলাসের ভাগ্য জড়িয়ে পড়ার ইতিহাসটা ঘটনার মালার মতো থরে থরে সাজানো দেখতে পেলাম সেই আলোতে। একসঙ্গে অনেক কিছুই আমার মনে মিছিলের মতো হাজির হয়েছে। এ্যাডমিরাল রিকোভারের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎকার। নটিলাসের কর্তৃত্ব পাওয়ার মতো বিচিত্র ও দুর্লভ সৌভাগ্যের কাহিনী। সুমেরু অঞ্চলের তুষারের সঙ্গে আমাদের প্রথম সংঘর্ষের রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা—যে রোমহর্ষক অভিজ্ঞতার স্বাদ গোটা একটি বছরেও অম্লান রয়েছে। আর সব চেয়ে বেশি মনে পড়ছে, আমাদের শুভদিনের অভিযানে, গৌরচন্দ্রিকাকে কেন্দ্র করে যে সব তাজ্জব লড়াই হয়েছে সেই সব ছবি। গত দুমাস ধরে এই নটিলাস জাহাজের উপরেই এমন সব নাটকীয় ঘটনার অবতারণা হয়েছে যে, যার ফলে এক এক সময় মনে করেছি যে আমাদের দিয়ে এমন অভিযান সাধিত হোক এটা যেন নিয়তির অভিপ্রায় নয়, শুধু শুধু আশার ছলনার পিছনে না ছুটে—এসব ছেড়ে দিই, এই রকম নিরাশ বিরক্তি হামেশাই এসেছে। শুভদিনের পরিকল্পনা চুলোয় যাক!

এখন মনে হচ্ছে, যেন এটা সত্য নয়, অথচ আবার ভাবছি এই তো আমাদের ভাগ্যের আকাশ উদার উন্মুক্ত হয়েছে। বিচিত্র অনুভূতি।

॥ দুই ॥

মেরু অঞ্চল পরিক্রমার চাঞ্চল্যকর অভিযাত্রায় আমার সঙ্গে নটিলাসের প্রথম সংযোগের সূত্রপাত ঘটে ১৯৫৬র জানুয়ারীতে—সেদিনটা ছিল মেঘলা, কন্‌কনে ঠাণ্ডা। তখন আমি কনেকটিকাটের নিউ ইংলণ্ডে অবস্থিত ইউনাইটেড স্টেট্‌স্ সাবমেরিন স্কুলে শিক্ষকতার কাজ করি—জলযুদ্ধে ডুবো-জাহাজ নিয়ে যুদ্ধের কৌশল শেখানোর প্রধান শিক্ষক আমি।

ডুবো-জাহাজীদের ঘরবাড়ির মতো একটা জায়গা নিউ ইংলণ্ড, এখানে পরস্পরের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ঘটে যায়। সাধারণ ডুবো জাহাজী এবং অফিসার, সকলকেই এখানে নৌ-বিদ্যার পাঠ নিতে আসতে হয়। দু'দিন আগেই হোক বা পরেই হোক প্রায় সব ডুবোজাহাজীকেই ঘুরে ফিরে পরিক্রমার কাজে নিউ ইংলণ্ডে হাজির হতে হয়—হয়তো স্কুলে নয়তো সাবমেরিনের নৌ-সেনাধ্যক্ষের কর্মচারী হিসেবে তাকে আসতেই হবে। আটলান্টিক নৌ-বহরের প্রধান ঘাঁটি এখানে। এই ঘাঁটি থেকে মাইল কয়েক দূরে, জেনারেল ডাইনামিকসের বৈদ্যুতিক নৌ-বিভাগ যত ডুবোজাহাজ তৈরী করে এত আর কোনো প্রতিষ্ঠান পারে না। রং, ঝালাই, মেরামত ইত্যাদি কাজের জন্য বিস্তর ডুবো-জাহাজকে নিউ ইংলণ্ডে এসে ধর্ণা দিতে হয়।

সেদিনও অন্যদিনের মতো নিয়মমাফিক কাজ শুরু করেছি, এমন সময়ে হঠাৎ একটা টেলিফোনের ডাকে সব ওলট-পালট হয়ে গেল। আটলান্টিকের ডুবো-জাহাজের সেনাধ্যক্ষ রিয়ার এ্যাডমিরাল ফ্র্যাঙ্ক ওয়াটকিন্স হুকুম করলেন, এক্ষুণি তাঁর আপিসে হাজির হতে হবে।

সেখানে পৌঁছবামাত্র এ্যাডমিরাল আপ্যায়িত করলেন বসতে বলে—সেই সঙ্গে এক পেয়ালা কফি। তারপর কথায় কথায়, জিজ্ঞাসাবাদ শুরু

করলেন, আমার অতীতকালের ডুবো-জাহাজী জীবনের খুঁটিনাটি সব খবর। কেন? সেটুকু ভাঙলেন না। অত্যন্ত স্বাভাবিক কৌতূহল যেন তাঁর, আপিসি চাল একটুও নেই। যা-ই হোক, এসব প্রশ্নের উদ্দেশ্য কি, না জেনেও সরাসরি সংক্ষেপে জবাব দিলাম—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এগারোটি পরিক্রমার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম Tarpon, Narwhal এবং Trutta সাবমেরিনে; আর যুদ্ধোত্তর আমলে আমি কাজ করেছি Sarda, Trutta এবং Tang-এ; আর সব শেষে, গোটা জাহাজের কর্তৃত্বভার নিয়ে দ্রুত আক্রমণশক্তিসম্পন্ন Wahoo সাবমেরিনেই কাজ প্রথম, ১৯৫৩-তে। পুরো দুটি বছর আমার তাঁবে ছিল ওয়াহু—হাওয়াই আর জাপানে গেছি এসেছি। তারপর অবশ্য এই সাবমেরিন স্কুলের দায়িত্বে বহাল হয়েছি।

আমার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত চুকলে পরে এ্যাডমিরালের সঙ্গে এই রহস্যময় সাক্ষাতের পর্বও শেষ হল। এ্যাডমিরালের কথার ভাবে সেটা টের পেলাম। তিনি বললেন—"উত্তম কথা! হ্যাঁ, ছাখো, শহরে এক ভদ্রলোক আসছেন। আমার ইচ্ছে, তুমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করো, আলাপ করো, বুঝলে! আচ্ছা, আজ রাত্রে তোমায় টেলিফোনে কোথায় পাওয়া সম্ভব?"

—"বাড়িতেই থাকব আমি।" এই বলে আমি এ্যাড্‌মিরালের দপ্তর থেকে রীতিমত ধোঁকা নিয়ে বেরুলাম।

বাড়িতে আমার পরিবার বলতে, আমার স্ত্রী বনি, আর আমার দুটি পুত্র—বড় হল মাইকেল তার বয়স এগার, আর ছোটটি বিল তার বয়স মাস ছয়েক। বন্দরের কাছাকাছি গ্রাম মিস্টিক—আমাদের বাড়িটি পুরনো ধাঁচার, এমনি বাসের পক্ষে বেশ ভালো কিন্তু দর্শনধারী চাকচিক্য নেই। সেদিন আমার বাড়ি ফিরতে একটু দেরি হল। আর সারাদিন ধরে কেবলই হাতড়ে মরেছি, সেই লোকটি কে হতে পারে—যার সঙ্গে আমাকে দেখা করিয়ে দিতে চান এ্যাড্‌মিরাল?

রাত্রে খাওয়া দাওয়া চুকে যাবার পর এ্যাড্‌মিরালের কাছ থেকে টেলিফোন এল।

এ্যাড্‌মিরাল ওয়াট্‌কিন্স বললেন—"ছাখো, খুব আফসোসের কথা,

এবারে তাঁর এমনই কাজের ভিড় যে, ভদ্দরলোক এযাত্রা আর তোমার সঙ্গে দেখা করার ফুরসত পাচ্ছেন না।"

—"ও, তাই নাকি স্যার! আচ্ছা।" বললাম।

ওয়াট্‌কিন্স নিশ্চয় টের পেয়েছিলেন যে কৌতূহলে আমার পেট ফুলে উঠেছে, খুব সম্ভব সেই জন্যেই তিনি ফিস্‌ফিসে সুরে বললেন—"দ্যাখো, একথা যেন আর কাউকে ব'লো না! তোমাকে যাঁর কথা বলেছি তিনি হলেন এ্যাড্‌মিরাল রিকোভার। একটা নতুন কাজ সামনে আসছে, বুঝলে। সেই কাজে তোমায় নেওয়ার কথা হচ্ছে, অবিশ্যি আরও কয়েক-জনের কথা উঠেছে, বুঝলে!"

—"হ্যাঁ স্যার বুঝেছি।"

তারপর তিনি এ্যাড্‌মিরাল রিকোভারের সঙ্গে দেখা করবার জন্য আমাকে ওয়াশিংটনে যাবার জন্য তৈরী হয়ে নিতে বলে টেলিফোন ছাড়লেন।

সব শুনে আমার হাত-পা হিম হয়ে যাবার দাখিল, সত্যিই আমি জড়-পিণ্ডের মতো চেয়ারে বসে পড়লাম। বিস্ময় বিমূঢ় আমি।

অবশ্য ডুবো-জাহাজীরা সকলেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে রিয়ার এ্যাড্‌মিরাল রিকোভারের পরিচয় ভালোভাবেই জানে। তিনি হলেন "পরমাণুশক্তি চালিত ডুবো-জাহাজের জনক।" ১৯৫৪-তে নটিলাস দরিয়ায় ভেসেছে, পুরো একটি বছর সে দস্তুরমতো কাজ করছে। নটিলাসের কাজের বহর তার নির্ভরযোগ্যতা সারা দুনিয়ার ডুবো জাহাজীদের তাক লাগিয়ে দিয়েছে—আর আমাদের নিউ ইংলণ্ডের লোকদের তো কথাই নেই। এই নটিলাস যে নৌ-যুদ্ধের ধারা ধরনে যুগান্তর এনে ফেলেছে তাতে আমাদের সংশয় নেই। আমাদের কাছে এই জাহাজটা বাস্তবিকই মহা-বিস্ময়ের বস্তু।

কিন্তু আমি কিছুতেই হদিস করতে পারছি না যে, এ্যাড্‌মিরাল রিকোভারের কোন্ কর্ম আমাকে দিয়ে হতে পারে? কেননা আমার এ কথা ভালো ভাবেই জানা আছে যে তাঁর উন্নয়নের অনন্য সংগঠনে বাছা বাছা বিশেষজ্ঞ পদার্থবিদ, এঞ্জিনিয়ার, গণিতশাস্ত্রী, নৌ-বিদ্যাবিশারদরা রয়েছেন। তাঁরা জাহাজ তৈরীর বিদ্যার জাহাজ, রিএ্যাক্টরের পরিকল্পনায়

তাঁরা পারঙ্গম। এই হল ওয়াশিংটনে রিকোভারের সংগঠনের চেহারা। আমার তো এর কোনও ব্যাপারেই তেমন অনন্য-সাধারণ এলেম্ নেই। তা হলে? তবে কোন্ যোগ্যতার অধিকারে রিকোভারের কাছে ঠাঁই পেতে পারি? এটা বুঝে উঠতে না পারলেও, এটুকু ভালো ভাবেই আমার বোঝা হয়ে গেছে যে দুনিয়ার যে-কোনো জায়গায় আমি কাজ করতে পারি। হয়তো তিনি আমাকে একটা চাকরি দিতে চান এই কল্পনা করে নিয়েই, তার জন্যে মনে মনে তৈরী হতে লাগলাম। এবং সেই সঙ্গে কিছু কিছু সতর্কতাও নিতে শুরু করলাম।

সপ্তাহ কয়েক পরে নির্দেশ এল। একটা শনিবার সকাল আটটায় এ্যাড্‌মিরাল রিকোভারের দপ্তরে হাজির হবার জন্য আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে। অতএব আমি হিসেব করে, শুক্রবার রাতে ওয়াশিংটনে উপস্থিত হলাম—আমার প্রাক্তন উপরওয়ালা কমাণ্ডার হিউয়ের ডেরাতেই উঠলাম। জিনিসপত্তর খুলে মেলে গুছিয়ে বসেছি এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল। যিনি ফোন করছেন তিনি রিকোভারের নৌ-কর্মচারী বলে নিজের পরিচয় দিলেন। তিনি জানালেন যে, এ্যাড্‌মিরাল রিকোভার সকাল থেকে খু। [illegible]স্ত থাকবেন, কাজেই আমার আর সকালে হাজিরা দেওয়ার দরকার নেই—বিকেলে গেলে তাঁর সুবিধে হয়।

"আচ্ছা! তা বেশ, খুব ভালো কথা।" বলে আমি ফোনটা নামিয়ে রাখলাম।

আমাদের জাহাজী মণ্ডলে রিকোভারের সঙ্গে 'সাক্ষাৎকার' খুব বিখ্যাত, বরং বলা যায় কুখ্যাত। তাতে সবই সম্ভব। [illegible]বার হয়েছিল কি, সাক্ষাৎকারীদের জন্যে এ্যাড্‌মিরাল একটা 'স্পেশাল' চেয়ার রেখে দিয়েছিলেন, সে চেয়ারের বৈশিষ্ট্য হল পিছনের পায়া দুটোর চেয়ে সামনের পায়া বেঁটে। এবং চেয়ারটা এমন জায়গায় রাখা হত যে খড়খড়ি দিয়ে ঠিক্‌রে পড়া রোদ সরাসরি সাক্ষাৎকারীর চোখের উপর পড়ে তার চোখ ধাঁধিয়ে দিতে। কত যে নব্য অফিসার সেই চেয়ারে বসে রোদের ধকলে অন্ধের মতো নাকাল হত, আর সেই সময়ে তাক বুঝে রিকোভার তাকে অবিশ্রান্ত প্রশ্নে জেরবার করতেন তার লেখাজোখা নেই—কেন না সেসব প্রশ্নের জবাব দেওয়া খুব কঠিন, অধিকাংশ প্রশ্নেরই জবাব হয় না।

রিকোভারের প্রশ্নের কোনো আইনকাহুন নেই। একবার তিনি এক এঞ্জিনিয়ারকে জিগ্যেস করে বসলেন—"আচ্ছা, তোমার মগজ চটপট্ উপায় বাত্‌লাতে পারে?"

"তা, হ্যাঁ, মানে—পারে বই কি স্যার!" এঞ্জিনিয়ার জবাব দিল।

"আচ্ছা ধরো, তোমার জাহাজটা ডুবে যাচ্ছে। জাহাজে তুমি ছাড়া আরও পাঁচ জন রয়েছে। এখন কথা হল, তোমাদের মধ্যে মাত্তর একজনকেই বাঁচানো সম্ভব এমনই অবস্থা। সেখানে তুমি কি করবে? তোমার মগজ কি উপায় বাত্‌লায় দেখি। তুমি কি তাদের কাছে একথা বুঝিয়ে বলতে পারবে যে, তাদের বদলে তুমিই—তোমারই বাঁচা দরকার?"

এঞ্জিনিয়ার বেচারী টেরও পেল না যে ব্যাপারটা আর একটু সুস্পষ্ট ভাবে বোঝা দরকার, সে ফস করে জবাব দিয়ে ফেল্‌ল—"হুঁ, তা পারব স্যর।"

এ্যাড্‌মিরাল চট্ করে কি যেন একটা ইঙ্গিত করলেন। অমনি, নিমেষের মধ্যে ঘরের ভেতরে পাঁচটি লোক ঢুকে পড়ে এঞ্জিনিয়ারকে ঘেরাও করল! আর রিকোভার বললেন—"আচ্ছা বাপু, এবারে তুমি বোঝাতে থাক।"

শুনেছি আর একবার তিনি এক তরুণ জাহাজী অফিসারকে ইণ্টার-ভিউতে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"তুমি হচ্ছ নাবিক অফিসার। ধরো একবার এমন পরিস্থিতি দাঁড়াল, ওয়াশিংটনের বাসিন্দেরা ঠিক করে ফেলল যে, তারা হয় তোমাকে হত্যা করবে, না হয় যে-লোকটা ঝাড়ু দিয়ে শহরের পথঘাট সাফা করে তাকে হত্যা করবে—একজনকে তারা খুন করবেই। এমন যদি হয় যে তুমি ওয়াশিংটনেরই বাসিন্দা, তাহলে এক্ষেত্রে কার মরা উচিত বলে তুমি বিবেচনা করো?"

ছোকরা অফিসারটি হয়তো ভেবেছিল যে রিকোভার তার শোভনতা-বোধ পরখ করতে চাচ্ছেন, সে চট্‌পট জবাব দিল—"আমারই অবিশ্যি মরা উচিত, স্যার!"

ডেস্কের ওপর কিল মেরে তিনি বললেন—"তাহলে, জবাবটা ভুল হচ্ছে।"

এবং তিনি বুঝিয়ে দিলেন—"এটুকু তোমার মগজে গেল না যে, ঝাড়ুদারের মরাটাই সমীচীন? এখানে যুক্তি হল এই যে, একজন নাবিক অফিসার দরকার হলে ঝাড়ুদারের কাজও করতে পারে, কিন্তু ঝাড়ুদারকে দিয়ে তো আর নৌ-অফিসারের কাজ হবে না। তাকে উপযুক্ত শিক্ষা পেতে হবে, তবে তো—!"

আমি জানি, উপযুক্ত প্রার্থীকে বিপদগ্রস্ত করার জন্য কিংবা হেয় প্রতিপন্ন করার মতলবে এ্যাড্মিরাল রিকোভার এইসব প্রশ্ন করেন না—তিনি বাজিয়ে দেখে নিতে চান। অল্পক্ষণের মধ্যে মোটা বুদ্ধির, গতানুগতিক অনগ্রসর মনের মানুষকে বাদ দিয়ে তিনি চট্পট প্রত্যুৎপন্নমতি যথার্থ কাজের মানুষকে বেছে নেওয়ার কৌশল হিসেবেই এই প্রশ্নগুলো করে থাকেন। তাঁর ধারে-পাশে এই প্রত্যুৎপন্ন-বুদ্ধি মানুষেরাই নিযুক্ত। যাঁরা এতটুকু ফাঁকি দেবে বলে তিনি টের পান, তাদেরই সর্বাগ্রে বিদায় দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত থাকার পক্ষপাতী।

এ্যাড্মিরালকে টেক্কা দেবার স্পর্ধা আমার নেই তা আমি জানি, এবং সেরকম দুর্মতিও আমার নেই। তবে এও ঠিক যে, আমার ওপর তাঁর সুনজর আকর্ষণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টায় আমি দৃঢ়সংকল্প। বিশেষ করে সেই জন্যেই টেলিফোনটা পাওয়ার পর থেকে আমার খুব ভাবনা হল। এই যে, আমার সাক্ষাৎকারের সময়টা হঠাৎ পিছিয়ে দেওয়া হল এর পিছনে কোনো উদ্দেশ্য নেই তো? টেলিফোনের মধ্যেই হতো রিকোভারী প্যাঁচ রয়েছে। আমার চিঠিতে পাক্কা সকাল আট টায় হাজির হওয়ার নির্দেশ লিখিত! যাকে আমি চিনি না তার কাছ থেকে টেলিফোন পেয়ে আমি গরহাজির হলে তো সেটা আমারই দায়িত্বের উপর পড়ে—নির্দেশ পালনে আমার অক্ষমতাই প্রমাণিত হয়! অনেক ভেবে শেষে এই সিদ্ধান্তই করলাম, টেলিফোনের ব্যাপারটা আমল না দিয়ে সোজা সকাল আটটায় রিকোভারের দপ্তরে হাজির হব। তাই করলাম।

সত্যিই এ্যাডমিরাল ব্যস্ত রইলেন সারা সকালটা। আমি তাঁর দপ্তরে বসেই রইলাম। বিকেলের দিকেও তিনি কথা বলবার ফুরসৎ পেলেন না। এ্যাড্মিরালের খাস কামরার পাশেই দর্শনার্থীদের বসবার ঘর। আমার চারপাশের কর্মব্যস্ততায় মানুষগুলো চরকীর মতো ক্ষিপ্র-

গতিতে চলাফেরা করছে—দেখছি আমি। তারিফ করতে ইচ্ছে হয়, এদের এই অসাধারণ কর্মময় আবহাওয়ার। মনে হচ্ছে এই মস্তবড় বাড়িটার মধ্যে একটা মানুষে হেঁটে হেঁটে চলছে না, পিঁপড়ের মতো যথাসাধ্য ছুটে চলছে।

বিকেলের পড়ন্ত বেলায় আমার ডাক এল। এ্যাড্‌মিরাল আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য তৈরী! টুপীটা হাতে নিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকলাম। এ্যাড্‌মিরালের পরনে অসামরিক পোশাক, মাথার চুলগুলো রূপালী শুভ্রতায় চক্‌চকে, তিনি এক এক বার নিজের চেয়ারে ডেস্কের উপর ঝুঁকে বসছেন, আবার কখনো বা পিঠের দিকে হেলে টেলিফোনে কোনো দুর্ভাগ্য এঞ্জিনিয়ারকে বাজখাঁই মেজাজে ফরমাস করছেন। টেলিফোনটা বাঁ-হাতে থাকছে, কিংবা নামানো থাকছে। ডান হাতখানা কিন্তু সর্বক্ষণ প্যাডের উপর লিখছে, খসড়া করছে। অফিস ঘরখানার চতুর্দিকে আমার দুচোখ ঘুরতে লাগল। আমি যতগুলি এ্যাড্‌মিরালের আপিস দেখেছি তার সঙ্গে এর মিল নেই—এর মেঝেতে কার্পেট বা কম্বল বিছোনো নেই। ঘরখানা বই-এর আলমারিতে বোঝাই আর বই-এর আলমারীগুলো বই পত্তরে ঠাসা। এ্যাডমিরালের ডেস্ক এবং কন্‌ফারেন্সের টেবিলের উপর স্তূপাকার কাগজপত্র আর মডেল, ছবি, আরও হরেকরকমের রিপোর্ট ইত্যাদি পাহাড় প্রমাণ জমে আছে। হঠাৎ দেখে এ ঘরকে আপিস মনে হবে না। অন্ততঃ আমার তো মনে হল যে এটা যেন একটা লাইব্রেরী। এবং এখানে দশ বারোটি ছাত্র তাদের গবেষণার কাজ করতে করতে বাইরে চলে গেছে! তাদের বইপত্র তাই এইভাবে পড়ে রয়েছে।

তিনি যখন আমাকে বসতে বললেন তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। আমি তাহলে প্রথম আধমিনিট নিরাপদে পার করে দিয়েছি। মনে মনে আমি সেই ঝাড়ুদারকে দুনিয়া থেকে মুছে ফেলেছি এবং মজ্জমান জাহাজের কল্পিত পাঁচটি আগন্তুকের সঙ্গে কি ভাবে কথাবার্তা কইবো তাও মোটামুটি গুছিয়ে ভেবে রেখেছি। দেখলাম যে সেই বিশেষ কায়দার চেয়ারও আজকের সাক্ষাৎকারের বিষয়ীভূত নয়! অবিশ্যি তাতেও আমি দমে যেতাম না। আমাকে যে-চেয়ারে বসতে বলা হয়েছে

তার কোন পায়া না থাকাও বিচিত্র ছিল না। তার জন্যেও তৈরী ছিলাম আমি।

আমার মুখের ওপর এ্যাডমিরালের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, বেশ অনুভব করছি। এবং তিনি আগড়ুম-বাগড়ুম না আউড়ে, বা কোনো গৌরচন্দ্রিকা না করে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি কোথায় লেখাপড়া করেছ?"

প্রশ্নটা আমার ক্ষেত্রে একটু গোলমেলে। আমার বাবা ডেভিড এইচ. এণ্ডারসনের পূর্ব পুরুষেরা টেনেসিতে চাষবাসের কাজ করতেন, অতএব তিনিও চাষীই হয়েছিলেন। মন্দার বাজারে আমাদের হামেশাই এখান-ওখান করে বেড়াতে হয়েছিল। তারপর চরম দুরবস্থার ধাক্কা সামলে, বাবা ১৯২৯-এ নিজে নিজস্ব কাঠের কারবার ফাঁদলেন। কাজেই, ছেলেবেলায় আমি যখন যেখানে থেকেছি সেখানকার স্কুলেই তখন লেখাপড়া করেছি। অবিশ্যি হাইস্কুলের শেষ দুটো বছর আমি টেনেসির কলম্বিয়া মিলিটারী একাডেমীতে পড়েছি।

কতকটা ইচ্ছে করেই আমি গোড়াগুড়ি সব ঘটনা ফলাও করে বলতে শুরু করলাম।

মাঝখানে এ্যাডমিরাল বাধা দিয়ে বললেন—"ত্যাখো এ্যাণ্ডারসন, তোমার জীবনবৃত্তান্ত রাখো। আমি শুধু জানতে চাই তুমি কোথা থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়েছ, ব্যস্!"

"কলম্বিয়া মিলিটারী একাডেমী।" উত্তরটা দেবার সময় আমি যেন চুপসে গেলাম। আমার এত জল্পনা-সংকল্প সত্ত্বেও আমি যে- গোড়াতেই ডুবতে শুরু করেছি—আরম্ভটা ভালো হল না।

যদিও এ্যাডমিরাল মুখে বললেন যে তিনি আমার জীবনবৃত্তান্ত জানতে চান না, কার্যত তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সংক্ষেপে সেটাই আদায় করে নিলেন আমার কাছ থেকে।

১৯২১-এর ১৭ই জুন টেনেসির বেকারভিলে গোলাবাড়িতে আমার জন্ম। বাবার তিন সন্তানের মধ্যে আমি কনিষ্ঠ। ছ-সাত বছর বয়সে আমি বাবার কাঠের কারখানাতে যাতায়াত শুরু করি। পরিবেশের নিয়মে এটা স্বাভাবিক যে, কাঠের কাজের দিকেই আমার ঝোঁক হবে। আমার যখন দশ বছর বয়স তখন বাবা আমাকে একটা ছোট্ট কাঠের

দোকান করে দিলেন। আর, কিছুদিন যেতে না যেতে আমি চেয়ার, টেবিল এইসব বানাতে শুরু করলাম—সেগুলো বিক্রিও হয়ে যেত। মাঝে মাঝে ভিন্ন ধরনের আসবাবপত্রও মাথা খাটিয়ে তৈরী করতাম। একবার আমি দুটো দাঁড়টানা ছোট বোটও বানিয়ে ফেললাম তারপর, আমাদের বাড়ির কাছাকাছি ছোট নদীতে সে দুটো দিব্যি চালু করা হল। উৎসাহ বেড়ে গেল। ছেলেবেলার বন্ধু জেম্‌স বেকহামের পরামর্শে, দুটো নৌকোর একটাকে ডুবো জাহাজে রূপান্তরিত করার মতলব মাথায় গেল। বানালাম সাবমেরিন। তবে সেটা গেঁয়ো জাতের ডুবো জাহাজ হল। বোটখানার ডেক্‌কে বেশ ভালো ভাবে ঢেকে ঢুকে, বোটখানা উপুড় করে উল্টে দেওয়া হল। যাতে আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসে অসুবিধে না হয় সেজন্য বাতাস ঢোকার জন্যে কয়েকটা ছেঁদা রাখা হল। ব্যস, আমরা ইউবোটের ক্যাপ্টেন হওয়ার খেলা খেলতে শুরু করলাম।

আমাদের সব চেয়ে বিস্ময়কর এবং অভিনব অবদান হল চাকা লাগানো বোট। আমাদের ও তল্লাটে সাড়া পড়ে গেল, কলের নৌকো বানিয়েছি! কিন্তু, যন্ত্রবিজ্ঞানের কোথাও একটা গলদ ছিল, যার ফলে নৌকো একটু মোড় নিতে বা ঘোরাফেরা করতে গেলেই বসবার আসনগুলো ওলট-পালট খায়। আমেশাই বাচ্ছাড়া হুমড়ি খেয়ে উল্টে পড়তে লাগল, দুটো তিনটে দুর্ঘটনার খবর বড়দের কানে পৌঁছনোর পর আর কলের খেয়া চালানো গেল না। কর্তাদের কড়া শাসনে অমন সাধের চক্কর খাওয়া খেয়ার কারবার বন্ধ করতেই হল।

আমাদের পরিবারের সাঁজোয়া এলেমদারীর ঐতিহ্য ছিল বলে শুনি নি। আমার বয়স তখন এগার কিংবা বারো, বাবা ঠিক করলেন যে, আমাকে ওয়েষ্ট পয়েন্ট কিংবা আন্নাপলিসে দেওয়া হবে। যেহেতু অমন দামী উঁচু-দরের শিক্ষা দেওয়ার মতো অর্থবল তাঁর নেই, সেইজন্যই স্কুলের শেষ দু'বছর মিলিটারী একাডেমীতে রাখা হয়েছিল। প্রথম ধাপটা টপ করে পেরিয়ে গেলাম। গ্রাজুয়েট হওয়ার পর বাড়তি এক বছর ওই কলম্বিয়াতেই রয়ে গেলাম, কঠিন মিলিটারী পরীক্ষার জন্যে তৈরী হওয়ার উদ্দেশ্যে। উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৩৯-এ আমি নৌ-বিভাগীয় একাডেমীতে ভর্তি হলাম।

একাডেমীতে আমার সাফল্য মোটামুটি গোছের ছিল। খুব ত্বরিত বীরত্ব বা কর্মকুশলতা বলতে বিশেষ কিছু ছিল না আমার। আমরা ঢোকবার পর অল্প দিনের মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল। ফলে আমাদের শিক্ষার কাজও দ্রুতবেগে ছুটল। ১৯৪২-এ স্নাতক হলাম। ফল মাঝারি। দুশোজনের মধ্যে আমার স্থান আধা-আধির মধ্যে রইল। কতকগুলো কড়া নিয়ম আমাদের ক্ষেত্রে শিথিল করা হল। আমাদের আমলেই আন্নাপলিসের স্নাতকরা সরাসরি সাবমেরিন স্কুলে প্রবেশের জন্য দরখাস্ত করবার অধিকার পেল। আমাদের ক্লাশ একটা গ্রীষ্ম সামরিক জাহাজে পরিক্রমা করেছিল—১৯৪০-এ। সেই সমুদ্রযাত্রা হয়েছিল টেক্সাস, নিউইয়র্ক এবং আরাকান্‌সাসে। সেই পরিক্রমা থেকে আমার নিজের এই ধারণা হয়েছিল যে, বড় জাহাজের ঝঞ্চাট ঝকমারী আমার পোষাবে না। আমার মনে হয়েছিল যে, সাবমেরিনের সব কিছুই অল্পস্বল্পের মধ্যে, এখানে কেতাকানুনের মারপ্যাঁচও নেই—দায়িত্বের ঝুঁকি হাতে আসতে বেশি দেরি হয় না সাবমেরিনে। এই জন্যেই সাবমেরিনে কাজ করার ঝোঁক আমার বেশি হল। ব্যস, দরখাস্ত করে দিলাম। কপাল ভালো, প্রথম যে চল্লিশজনকে নেওয়া হল তার মধ্যেই ঠাঁই জুটে গেল আমার।

দরিয়াতে সাবমেরিনের ওপর জীবনযাপনে ধরাবাঁধা নিয়মফন্দের বালাই বলতে কিছু নেই। অল্পদিনের মধ্যেই আমার অভিজ্ঞতা হল যে, যুদ্ধের সময় সাবমেরিনকে বেশির ভাগ সময়ই বন্দরের বাইরে একা একা ঘুরতে হয়। এই পরিক্রমার মধ্যে একটা বেপরোয়া মেজাজ আছে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ আমরা চলি, ভয়লেশহীন আমাদের গতি—কখনো শত্রুর বন্দরের ভেতরে ঢুকিয়ে যাই, তাদের খাঁড়ীতেও চলাফেরা করি, তাদের জাহাজ ডুবিয়ে দিই, আবার কখনো প্রতিপক্ষের ধড়িবাজ এ্যান্টিসাবমেরিনের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য ক্ষিপ্রগতিতে এধার ওধারে গা ঢাকা দিতে চেষ্টা করি। ডুবো-জাহাজে মৃত্যুর হার খুব বেশি—নৌবিভাগের অন্য যে কোনো কাজের তুলনায় ডুবো-জাহাজের কাজে মানুষ বেশি মরে। তা ছাড়া এইভাবে চলাফেরা মোটেই আরামপ্রদ নয়। আবার যখন যুদ্ধ নেই, সেই শান্তির সময়েও সাবমেরিনের কপালে

বিশ্রাম জোটা দুষ্কর। সাধারণতঃ কাজের উপযুক্ত সাবমেরিনের সংখ্যাও প্রয়োজনের তুলনায় কম। সেইজন্য ভারপ্রাপ্ত সাবমেরিনগুলির ঘাড়ে কাজের চাপ থাকে বেশি। আমাদের ছাত্রদের হাতে-কলমে সাবমেরিনের কাজ শেখানো, এ্যান্টিসাবমেরিন বাহিনীকে, শত্রুর জাহাজকে কিভাবে আক্রমণ করতে হবে সেই কৌশল রপ্ত করা—এই রকম সব ফিরিস্তি লেগেই থাকে সব সময়।

নিয়ম মোতাবেক চলার যেমন ছিরিছাঁদ নেই তেমনি আবার ডুবো-জাহাজীর কপালে কিছু কিছু সূক্ষ্ম ইনাম জোটে। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল তার সহকর্মীদের অনন্যসাধারণ চরিত্র—এই জাতের অদ্ভুত দুঃসাহস, ধৈর্য এবং চরিত্রবল বড়ই বিরল। এই ধরনের ডুবো-জাহাজী সহপাঠি এবং সহকর্মী বন্ধু আমার কম ছিল না, তাদের অনেকেই আজ বেঁচে নেই—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাদের মরতে হয়েছে। বরাত জোর যে আমি টিকে রয়েছি। মনে মনে আমার এই গর্ব যে, জাপানীদের অনেক সাঁজোয়া জাহাজ ফাঁসিয়ে অতলে তলিয়ে দেওয়ার মধ্যে আমারও কিছু ভূমিকা ছিল; জাপানীদের সব চেয়ে বড় সৈন্যবাহী জাহাজটাও আমার হাতেই নিশ্চিহ্ন হয়েছে। আরও গর্ব এই যে, আজও আমাদের এই সুনিপুণ বাহিনীর সঙ্গে তালে তাল দিয়ে শক্ত হাতে কাজ করতে পারছি।

সামরিক টহলদারীর চক্করের ভেতরেই এক ফাঁকে দশ দিনের ছুটিতে ১৯৪৩-এর জুনে রাষ্ট্রে এসে বনিকে বিয়ে করে ফেললাম। বনির নাম ইভোনে, বিখ্যাত রসায়নবিদ ডঃ গাস্টো এট্জেলের মেয়ে। ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নৌ-বিদ্যালয়ের বন্ধুর মারফতে—সে বন্ধুটি আর আমি হস্টেলে এক ঘরের বাসিন্দে ছিলাম। বনি চিলওয়ার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েট হয়ে অল্পদিনের জন্যে বিমান বাহিনীর পরিচর্যাকারিণীর কাজ করেছে। আমি যখন ১৯৪৪-এ একটা নতুন সাবমেরিনের সঙ্গে সাঁজোয়া টহলদারীতে দরিয়ায় ঘুরছি, সেই সময় খবর পেলাম আমাদের প্রথম পুত্র মাইকেলের জন্ম হয়েছে।

এত কথা সবই এ্যাডমিরাল রিকোভারকে আমি বললাম—না, তার চেয়ে বলা যাক, তিনি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে শুনলেন আমার কাছ থেকে।

কিন্তু যতই বলতে লাগলাম ততই যেন ডুবো-জাহাজী জীবনের বৈচিত্র্যহীন নীরস এবং অসম্পূর্ণতা আমার সামনে ভেসে উঠতে লাগল। পিছনে ফিরে নিজের এই গন্ধময়, ডুবো-জাহাজী জীবনটাকে দেখছি। আমার মনে হয়, ডুবো-জাহাজীর জীবন যেমনটি হয় আমি তেমনই ব্যক্ত করেছি এবং সেইজন্যই বোধ হয় এ্যাডমিরাল আমাকে কোন কূট প্রশ্ন করেন নি।

পরিশেষে তিনি জিগ্যেস করলেন—"আচ্ছা এ্যাণ্ডারসন, গত দু' বছরে তুমি যেসব বই পড়েছ তার নাম করো, আর তার লেখকের নাম বলো। গ্যাখো, গত মাসে তুমি যা পড়েছ তার কথা বলো না যেন। সেগুলো আমি ধরব না, তুমি এখানে আসবে সেটা স্থির হওয়ার পর কি পড়েছ সেটা আমাদের হিসেবে ধরা চলবে না।

দরিয়ার বুকে নামবার সময় বরাবরই অনেকগুলো বই সঙ্গে নেওয়া আমার অভ্যেস, সব রকমের বই—উপন্যাস, ইতিহাস, যন্ত্রবিজ্ঞানের বই, যেটা নিতে খেয়াল হয় যোগাড় করে নিই পরিক্রমার মুখোমুখী সময়ে। অবিশ্যি আমি বই-এর পোকা নই, তবে আমার ধারণা সাধারণ পড়ুয়ার চেয়ে আমার বইপত্তর অনেক বেশি পড়া হয়ে গেছে। ওয়াহু সাবমেরিনে যখন টহল দিই, কোরিয়ার যুদ্ধের শেষ মুখে, তখন আমি খান পঁচিশেক বই পড়ে ফেলেছি। কিন্তু হঠাৎ এই মুহূর্তে আমি কিরকম ধোঁকা খেয়ে গেলাম। কিচ্ছু মনে পড়ছে না,—না একটা বই-এর কথা না একজন লেখকের নাম!

আমার চোখের সামনে একটা ছবি ভেসে উঠল। ঘটনাটা ১৯৩৪-এর। আমার বয়স তখন তের। ওয়েনেস্‌বরোর ব্যাকরণের স্কুল থেকে আমার স্নাতক পরীক্ষা দেবার কথা। আমাকে বিদায় ভাষণ দেবার জন্যে মনোনীত করা হল। আমাদেব পরিবারের একজন পরিজন, তিনি বোধ হয় কবি কিংবা দার্শনিক হবেন, তিনি আমার জন্যে একটা বক্তৃতা লিখে দিলেন—বেশ বাছা বাছা গালভারী সব দাঁত ভাঙা কথায় বোঝাই সেই বক্তৃতা। তাহলেও বক্তৃতাটা লম্বা নয়, ছোট্ট। তিন দিন তিন রাত ধরে সেই বক্তৃতাটা কণ্ঠস্থ করলাম। তারপর এল সেই স্মরণীয় দিনটি। আমি সকলের সামনে দিয়ে সগৌরবে স্টেজে গিয়ে উঠলাম। আমার সামনে সব পুত্র গৌরবে গর্বিত পিতা-মাতারা

ভিড় করে বসে রয়েছেন। তার মধ্যে অবিশ্যি আমার মা-বাবাও আছেন। কিন্তু, আমি একেবারে চুপসে গেলাম। কাঠ! মনে নেই কিছুই—একেবারে ফাঁকা আকাশের মতো মন! বক্তৃতার একটি কথাও মাথা খুঁড়ে বার করতে পারলাম না! 'ধন্যবাদ!' বলে বসে পড়লাম।

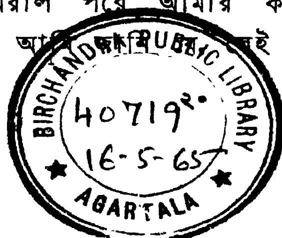
আজ আবার সেই রকম অবস্থা হল রিকোভারের সামনে। কত ভাবে অন্তত একখানা বই-এর কথা মনে আনতে চেষ্টা করলাম। একখানা বই-এর কথা কুঁথিয়ে উল্লেখ করলাম। কিন্তু লেখকের নাম ভুলে গেছি। রিকোভার ভ্রূ কুঁচকে একবার দেখলেন। তারপর বললেন—"আচ্ছা! আজকের মত বিদায়!"

ফিরেএলাম আমার গাঁয়ের বাড়িতে। মুখচোখের চেহারা দেখে বনি টের পেয়েছিল, একটা কিছু গলদ ঘটেছে। ওর অনুমান মিথ্যে নয় সেটা বুঝিয়ে দিলাম—"ভাবো একবার অবস্থাটা। গত দু'বছরে যা যা পড়েছি তার একটা ফর্দ চাইলেন ভদ্রলোক। আর আমি কিনা একটা বই-এরও নাম মুখে উচ্চারণ করতে পারলাম না! জানি না, তিনি কি কাজ দেবার জন্যে আমায় ডেকেছিলেন, কিন্তু এটা ঠিক জানি যে চাকরি আমার কিছুতেই হতে পারে না।"

পরে কতকটা অভ্যেসবশেই লাইব্রেরী ঘরে ঢুকলাম। সাজানো বইগুলোর ওপর চোখ বুলোতে বুলোতে মনে পড়ল, "এটা আমি ওয়াহুতে বসে পড়েছি।" এটা, এটা, এটা—! স্ত্রীর সহায়তায় তখুনি অন্ততঃ চব্বিশখানা বই-এর তালিকা করে ফেললাম—এগুলো সবই দুবছরের মধ্যে পড়েছি, আরও আছে।

বনিকে বললাম—"ভাখো! হয়তো বেয়াদপী হবে, তা ছাড়া এর কোনো মানে হয় না, তবু আমাকে লিখতেই হবে। মানে, যাতে লোকটা সব সাবমেরিন অফিসারকে বুদ্ধু ভেবে না বসে সেই জন্যেই ভদ্রলোককে জানিয়ে দেওয়া ভালো যে আমি গত দু'বছরে—" সেই দিনই চিঠি লিখলাম, বই-এর তালিকাও লিখে দিলাম। পরদিনই টাইপ করা চিঠিখানা দ্বিধাকুণ্ঠিত হাতে ডাকে দিয়ে এলাম।

যদিও এ্যাডমিরাল পরে আমার কাছে সরাসরি সেকথা উল্লেখ করেন নি, তবে আমি জানি, এই চিঠিখানা পেয়েই তিনি মত



পরিবর্তন করেছিলেন—সাক্ষাৎকারে আমার সম্বন্ধে তাঁর যা ধারণা হয়েছিল চিঠি পেয়ে তা বদলেছিল নিশ্চয়ই! চিঠি পাওয়ার আগে তিনি আমাকে বাতিল করে দিয়েছিলেন। আমাকে দেখে তাঁর খুব আরামপ্রিয় এবং শান্ত মনে হয়েছিল, এ মন্তব্য তিনি করেছিলেন। চিঠি পেয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত পাল্টে গিয়েছিল। এবং তার অল্প দিনের মধ্যেই, আমার কাছে খবর এল যেন অবিলম্বে রিকোভারের দপ্তরে কাজে যোগ দেবার জন্য হাজির হই—আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম বই কি! আমার যে কাজটা কি সে কথা কোথাও উচ্চারিত নেই। হয়তো কয়েক মাসের মধ্যেও তা জানতে পারব না, কে জানে!

॥ তিন ॥

নিউ ইংলণ্ডের ডুবো-জাহাজের ঘাঁটি থেকে আমি বদলি হয়ে ওয়াশিংটনে এ্যাড্‌মিরাল রিকোভারের নৌ-বিভাগীয় রিএ্যাক্টর শাখায় (NRB) এলাম, ১৯৫৬-র জুলাইতে। এখানে পা দেবার পর কয়েক দিনের মধ্যেই আমি বুঝতে পারলাম যে, কমাণ্ডার জিম্ কল্‌ভেটের সঙ্গে আমাকেও একটি পরমাণুশক্তি চালিত ডুবো-জাহাজের সম্ভাব্য কর্তৃত্বভার দেবার উদ্দেশ্যে বেছে নেওয়া হয়েছে। স্পষ্টভাবে কেউ মুখে বল্‌ছে না যে আমাকে কর্তৃত্ব দেওয়া হবে, তবে আমি যে 'সম্ভাব্য ব্যক্তি' একথা ঠিক।

কিন্তু কোন্ পরমাণু চালিত সাবমেরিন? নতুন জাহাজগুলোর মধ্যে কোনো একটি—স্কেট্, সোর্ডফিশ, স্কিপজ্যাক? না কি সেটা নটিলাস? প্রায় দু'বছর ধরে ক্যাপ্টেন ইউজেন পি, উইল্‌কিন্‌সন্ নটিলাসের কম্যাণ্ডার ছিলেন। সম্ভবতঃ নটিলাসের দায়িত্বপূর্ণ পদটিই শিগ্‌গির খালি হবে। কিন্তু, নিজেকে ওই মহাকীর্তিমণ্ডিত জাহাজের কর্তা হওয়া আমার ভাগ্যে জুটবে এটা কল্পনাই করা যায় না। এ যেন রূপকথার মতো আজগুবি! একদিন আর থাকতে না পেরে একথা এ্যাড্‌মিরাল রিকোভারকে জিগ্যেসই করে ফেললাম। তিনি জবাবটা এড়িয়ে গেলেন।

তিনি বললেন—"তোমার ট্রেণিং-এর জন্যেই ধরো আমরা নটিলাসকে আপাততঃ স্থির করেছি, এমনও তো হতে পারে!"

যে পুরনো ঝরঝরে বাড়িটায় এন, আর, বি'র অস্থায়ী দপ্তর আপাততঃ রয়েছে, তারই একখানা ছোট ঘরে আমার আপিস হল। আমি দেখি-শুনি পড়াশুনো করি আর হা-পিত্যেশ করে বসে থাকি। আর আশপাশে সব ইঞ্জিনিয়ার আর বৈজ্ঞানিকরা ব্যস্তত্রস্ত কাজে হিমসিম খাচ্ছে—রিএ্যাক্টরের পদার্থবিদ্যা এবং বাষ্পপ্রবাহ চালিত শয়ানচক্রের জটিল সমস্যায় তাদের মাথার চুল খাড়া হয়ে থাকে, আমি হাঁ করে দেখি সবই। কিন্তু

আমার নিজের কোনো দায়িত্বভার নেই। আমার ঘরে ফাঁকা ডেস্কের সামনে আমি একাই বসে থাকি। এইভাবে পরপর দুটো দিন কেটে যাবার পর, আমি সোজা এ্যাড্‌মিরালের মহাযজ্ঞশালার মতো দপ্তরে হাজির হলাম। আমি যে এখানে রয়েছি সেটা তাঁকে মনে পড়িয়ে দিলাম, —আমার কি কাজ সেটা তো ঠিক হওয়া দরকার।

তিনি জবাব দিলেন—"আচ্ছা এ্যাণ্ডারসন এক কাজ করো না কেন, তোমার কি কি করা উচিত সেটার মোটামুটি খসড়া বসে বসে লিখে আমার কাছে দাখিল করে দাও। ধরো সেটাই তোমার প্রথম কাজ!"

"তা বেশ তো। তাই করছি স্যার।" বলে আমি চট্‌পট তাঁর অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম।

তা দায়িত্বটা মন্দ নয়। পরমাণুশক্তি চালিত ডুবো-জাহাজের আমি স্থির করব যে, ভবিষ্যৎ অধিনায়কের কি শিক্ষা করা অপরিহার্য? গণিত-শাস্ত্র? রিএ্যাক্টর পদার্থ বিদ্যা? রসায়ন? আমার কিছু কিছু ধারণা রয়েছে। তবু আমি নিজের ওপর ষোল আনা ভরসা না করে রিকোভারের খাস দক্ষিণ হস্ত গোছের লোকদের সঙ্গে এ নিয়ে এক হপ্তার ওপর আলাপ-আলোচনা করলাম—হ্যারি ম্যাণ্ডিল, টেড্‌ রকওয়েল, বব্‌ প্যানফ্‌ এবং ক্যাপ্টেন জেম্‌স ডানফোর্ড সকলের সঙ্গেই পরামর্শ করলাম। তারপর, মোটামুটি তাদের ধারণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটা প্রস্তাবিত খসড়া লিখে খাড়া করা গেল। তার সঙ্গে যোগ করে দিলাম যে, নটিলাস জাতীয় জনিত্রের গঠন কাঠামো কিভাবে তৈরী হয়ে থাকে তার সম্বন্ধে সরেজমিন পর্যবেক্ষণের জন্য কয়েক সপ্তাহ আর্কো, ইডাহোতে কাটানো দরকার; আর যেহেতু ওয়াশিংটনে ইঞ্জিনগুলো তৈরী হয়েছে সেখানেও গিয়ে তার সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে নিতে হবে; আর ইলেক্‌ট্রিক বোট্‌ কোম্পানীর কার-খানায় গিয়ে সাবমেরিন তৈরী হওয়ার ব্যাপারটা ভালো করে জেনে নেওয়া দরকার; তারপর নটিলাস কবে কি কাজ করেছে তার আদ্যন্ত ইতিহাসটাও অনুধাবনের প্রয়োজন রয়েছে। আর সব শেষে পরমানবিক পুরশ্চালন তত্ত্বের সম্পর্কে যাবতীয় বিষয়গুলি নিজে ভালো করে শিখে পড়ে নেবার জন্যে একটা বিস্তারিত পাঠ্যসূচী অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন। আমার এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে এ্যাড্‌মিরাল কোনো কথাই বললেন না। বরং,

আমার যে সব অফিসার অধিনায়কত্বের শিক্ষানবিশী করতে এসেছে তাদের বেলায় হুবহু আমার তৈরী খসড়াটাই প্রয়োগ করা হয়েছে।

এই জাহাজের পরিকল্পনার ইতিহাস জটিল হলেও বিচিত্র এবং কৌতূহলোদ্দীপক। রিকোভার ক্যাপ্টেন হিসেবেই দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের আমলে নৌ-দপ্তরে কাজ করেছেন। জাহাজের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থাপনার উন্নয়নই তাঁর বিশেষ তদারকীতে ছিল। ১৯৪৬ সালে পারমানবিকশক্তি কমিশনের ওক রীজ্ প্ল্যাণ্ট রিয়্যাকৃটর পদার্থবিদ্যায় গবেষণার জন্য দরখাস্ত করলেন। আরও তিনজন নৌ-অফিসার লো রডিস, জিম্ ডানফোর্ড এবং রে ডিক্ এই একই কাজে যোগ দিলেন। তারপর যা ঘটেছিল তার ষোল আনা হিসেব-নিকেশ না দিয়ে এক কথায় সংক্ষেপে বলতে পারি যে, তাঁরা চারজনেই প্লুটোনিয়াম তৈরীর জন্য যে রিয়্যাকৃটর প্রক্রিয়া অনুসৃত হয় তাকে সাবমেরিনের মধ্যে যাতে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করা যায় সেই চেষ্টায় পাগলের মতো মেতে উঠলেন। রিয়্যাক্টরকে যথাসম্ভব চাপ দিয়ে অল্লায়তনে নিবদ্ধ করাই তাঁদের সংকল্প হল। তাহলেই সেটা ডুবো জাহাজে ব্যবহারোপযোগী হবে।

ব্যাপক নিয়মে দেখলে ধারণাটা অত্যন্ত সরল। ওক্ রীজের রিয়্যাক্টর-গুলি ইউরেনিয়ম দিয়ে তৈরী এবং এর জ্বালানী দণ্ডগুলি যত্নসহকারে পৃথকভাবে বিন্যস্ত। সেগুলিকে নিকটস্থ করলে যে প্রতিক্রিয়া ঘটে, তা নিয়ন্ত্রণের সুব্যবস্থাও রয়েছে। আনবিক বোমার ক্ষেত্রে যে নিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর নয়, এক্ষেত্রে সেটা আয়ত্তীকৃত করা হয়েছে। এই প্রতিক্রিয়ার ফলে রিয়্যাক্টরের অন্তর্দেশে প্রচণ্ড তাপ সৃষ্ট হচ্ছে। এই উত্তাপকে নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখবার জন্য ওক্ রীজের এঞ্জিনিয়াররা রিয়্যাক্টরের ভেতর দিয়ে পাম্প করে জল চলাচল করিয়ে থাকেন। তার ফলে, রিয়্যাক্টরের একটা মুখ দিয়ে ঠাণ্ডা অবস্থায় জল ঢোকে, আর এক মুখ দিয়ে যখন সেই জল বেরোয় তখন তা টগবগে ফুটন্ত গরম এবং সে জল তেজস্ক্রিয় হয়ে পড়ে। রিকোভারের মগজে একটা চিন্তার উদয় হল, তিনি বললেন যে, যদি রিয়্যাক্টর থেকে নিঃসৃত উত্তাপকে কোনও উপায়ে এমন ভাবে রূপান্তরিত করা যায়, যাতে করে ওই রূপান্তরিত উত্তাপ তেজস্ক্রিয়ামুক্ত হতে পারে—তাহলে সেই উত্তাপ বা শক্তিকে বাষ্পীয় পুরশ্চালনের কাজে ব্যবহার করা

যাবে। এ নিয়ে তিনি রীতিমত তর্কও করলেন।

রিকোভারের এই তাত্ত্বিক প্রণালী, সাবমেরিন পরিচালনের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব আদর্শ পদ্ধতি হবে, তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তিও খাড়া করলেন। তিনি বললেন, এই পদ্ধতিতে সামান্যমাত্র জ্বালানীর খরচায়— মাত্র এক পাউণ্ড ইউরেনিয়ামের দ্বারা যে শক্তির সৃষ্টি হবে, পুরনো প্রথায় পরিচালিত সাবমেরিনের সেই শক্তি উৎপাদন করতে গেলে দশ বিশ হাজার গ্যালন ডিজেল পুড়বে। এই প্রণালীর আরও একটা বড় সুবিধে হচ্ছে, যেহেতু রিয়্যাক্টরের 'অগ্নি' রাসায়নিক আগুন নয়, তা (ফিসন) পারমানবিক প্রতিক্রিয়ার দ্বারা বিভক্ত হওয়ার প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট, সেহেতু এই আগুনকে জিইয়ে রাখার জন্যে বাইরের বাতাস কিংবা অক্সিজেন জোগানোরও দরকার হবে না। তার ফলে সাবমেরিণে ষ্টোরেজ ব্যাটারী মজুত রাখারও দরকার হবে না, জাহাজের ভেতরে জায়গাও অনেক বেড়ে যাবে। আর, রিকোভারের তত্ত্বানুসারে অনুমান করা যাচ্ছে অনির্দিষ্ট দীর্ঘকাল ধরে সাবমেরিন জলের তলায় কাটাতে পারবে। জুলেভার্ণের স্বপ্ন তাহলে সত্যিই বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছে!

রিকোভারের এই আজগুবি গবেষণার কথায় অনেক বাস্তববিচক্ষণ ইঞ্জিনিয়ার হাসিতে ফেটে পড়েছিলেন। বড একটা তামাশার খোরাক হলেন রিকোভার। পয়লা নম্বর উদ্ভট কল্পনা, রিয়্যাক্টরের বিপুল কায়াকে ক্ষুদ্রাকারে পরিণত করার দুঃসাধ্য সমস্যা। ওক্ রীজে যে রিয়্যাক্টর রয়েছে, তার আয়তন দু'টো নগরের মতো প্রায়— তাকে সাবমেরিণের ভেতরে কি ঢোকানো সম্ভব? তারপর আসছে, রিয়্যাক্টরের মধ্য দিয়ে চালিত তেজস্ক্রিয় জলকে স্বাভাবিক বাষ্পীয় টারবাইন প্রণালীতে পরিবর্তিত করার উপায়টাও তো বার করতে হবে! তেজস্ক্রিয় জল-প্রণালীর মধ্যে ব্যবহারের উপযোগী পাম্পও হওয়া চাই বিধাতার মতো অমোঘ। তার ক্ষয় বা লয় হওয়া চলবে না, তা বিগ্ড়ে গেলেও চলবে না কেননা মেরামত করার কোনো রাস্তা নেই। এই আদর্শ পাম্পকে যতক্ষণ খুশি চালু রাখা যায়, এমন বস্তু হতে হবে তা। তাছাড়া রিয়্যাক্টরকে রক্ষা করার জন্যও খুব মজবুত জবরদস্ত আচ্ছাদন দরকার হবে।

(Naval Reactor Board)-এর অঙ্কনশালায় পারমাণবিক এঞ্জিনের প্রাথমিক চেহারা চিত্রিত হতে থাকল। দিনে দিনে এমনি করে কাজ এগিয়ে যায়। অকল্পনীয় অল্পকালের মধ্যেই রিকোভারের কর্মিসংগঠন, সাবমেরিনের পরমাণুশক্তি পরিকল্পনার একটা পূর্ণাঙ্গ হুবহু-নমুনা ডাঙার ওপর বানিয়ে ফেলল। এবং আণবিকশক্তি কমিশনের (এ-ই-সি) যে পরীক্ষণশাখা ইডাহোর আর্কো মরুভূমিতে রয়েছে, সেখানে সত্যিকার সাবমেরিনের খোলের মধ্যে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ চালু করা হল। এর অল্পদিন পরেই নটিলাসকে ভাসানো হল, দরিয়ায় সে সফরে বেরুলো, তারপর এল সীউল্‌ফ, তার এঞ্জিনের গঠন কৌশল অন্য ধরনের।

এন, আর বির পুরোদস্তুর কাজ চলবার প্রায় সাত বছর পরে আমি এখানে এসেছি—আর রিকোভারের পরিকল্পিত আনবিক-শক্তি চালিত সাবমেরিনের ধারণার বয়স তখন দশ। তিনি তাঁর কুশলী এঞ্জিনিয়ার দলের সহযোগিতায় রীতিমত অব্যাহত গতিতে নিজের ধারণাকে রূপায়িত করার কাজে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর সবচেয়ে যোগ্য সহযোগী রক্‌ওয়েল, ম্যাণ্ডিল, প্যানফ এবং অন্যান্য এঞ্জিনিয়ারদের সাহায্যে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত—কি করে আরও অল্প খরচে উন্নততর সাবমেরিন রিয়্যাক্টর তৈরী করা যায়, বিমানবাহী জাহাজে, রণপোতে, ডেষ্ট্রয়ারে, আনবিক শক্তির এঞ্জিন ব্যবহার করার উপায় নিয়ে তাঁদের জল্পনা-কল্পনার কামাই নেই। এই দশকের সবচেয়ে মারাত্মক বস্তু এই আনবিক-শক্তি চালিত সাবমেরিন যা অলক্ষ্যে থেকে অনায়াসে ক্ষেপণাস্ত্র প্রয়োগ করতে পারে—তা কল্পনার গুটি ছেড়ে বাস্তবে প্রায় সম্ভব হয়ে এসেছে। রিকোভার এবং তাঁর সহকর্মীরা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম পূর্ণাঙ্গ আনবিক-শক্তি চালিত তড়িৎ উৎপাদক জনিত্র গড়ে তুলছেন—এটা অবশ্য পার্শ্ব-পরিকল্পনা; সাধারণ ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহারের জন্য শেষোক্ত পরিকল্পনাটি কার্যকরী হবে।

এই আশ্চর্য সুদক্ষ বিশেষজ্ঞ দলের বিস্ময়কর আভ্যন্তর কর্মধারা এবং তার বিপুল সার্থকতা-সমৃদ্ধ বিকাশরূপ, প্রথম দর্শনে যে কোনও মানুষকে

স্তম্ভিত করে দেবে। সেই বিপুল বিস্ময়কে যথাযথভাবে ব্যক্ত করার ভাষা আমার নেই।

সেই কারণেই নটিলাস যে আমাকে অকৃত্রিমভাবে আকৃষ্ট করবে এ তো খুবই স্বাভাবিক। ক্যাপ্টেন উইল্‌কিন্‌সনের বিবরণী আমি আঁতি-পাতি পড়লাম এবং সে সম্পর্কে নৌ-বিশেষজ্ঞদের বক্তব্যও মনোযোগ দিয়ে পড়ে দেখলাম।

১৯৫৫-র জানুয়ারীতেই নটিলাস দরিয়ার তলায় প্রথম ভাসতে শুরু করে—কনেক্‌টিকাটের ইলেক্‌ট্রিক বোট কোম্পানী গ্রোটনে তাকে প্রথম ভাসায়। সে-ই প্রথম 'আনবিকশক্তির দ্বারা জলের নীচে চলার' খবর দুনিয়ায় প্রচার করে। ডক্ থেকে ধীরে ধীরে গড়িয়ে চলেছিল নটিলাস, কিন্তু তারপর, যখন জলের রাজ্যে নেমে এল তখন আর নটিলাসের চলাফেরায় মন্থরতার চিহ্নমাত্র রইল না। সমুদ্র পরিক্রমার পরীক্ষামূলক পর্যায়ে নটিলাস সবাইকেই অবাক করে দিয়েছিল, এমনকি যাঁরা তাকে গড়বার পরিকল্পনা করেছিলেন এবং তৈরী করেছিলেন, তাঁরাও নটিলাসের নৈপুণ্যে অভিভূত হয়েছিলেন। জলের তলে নটিলাস ঘণ্টায় ত্রিশ মাইলের চেয়েও বেশি চলতে পারে, যতক্ষণ খুশি ততক্ষণ সে এই গতিবেগ বজায় রাখতে পারে। প্রথম পরিক্রমায় সে প্রায় নব্বই ঘণ্টার মধ্যে ১৩৮১ মাইল জলের তলায় সহজেই চলেছিল। সাবমেরিনের পক্ষে এটা অসাধারণ ব্যাপার। আর অন্যদিকের কথাই যদি ধরা যায় তবে পুরনো ধরনের সাধারণ সাবমেরিনের অনুপাতে এর দক্ষতা পঞ্চাশগুণ অধিক, সমুদ্রের গভীরতম দেশে নেমে যেতে নটিলাসের ড়ি মেলে না, এ্যান্টিসাবমেরিনের চোখে ধুলো দেবার দক্ষতার কথা আগেই বলেছি।

খুব তাড়াতাড়ি আমি শিক্ষাসূচীর গহ্বরে ঢুকে পড়লাম। নটিলাসের রিয়্যাক্টর কিভাবে খুঁটিনাটি জানবার জন্যে আর্কোতে যাওয়া, ইলেট্রিক বোট এবং ওয়েস্টিংহাউসের কারখানায় খোঁজখবর করাই আমার কাজ হল। অল্প দিনেই আমার কাজের গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে থাকল। এন, আর, বি'র কাজের সময় সকাল আটটা থেকে বিকেল সাড়ে পাঁচটা অবধি, সপ্তাহে একদিন ছুটি। কিন্তু এইটুকুই কাজের সময় নয়, বাড়িতে প্রচুর খাটতে হয়। রাত্রে বাড়তি কাজ করতে হয়। অবশ্য সেটা কেউ

করতে বলে না। কিন্তু রিকোভারের নিজের কর্মতৎপরতা এত প্রচণ্ড যে, আর সবাই পিছিয়ে পড়ে থাকে, সেই ঘাটতিটুকু পূরণ করতে হলে না খেটে উপায় কি! নিজের গরজেই এখানে সবাই কাজ করে। আজ পর্যন্ত আমি যতলোক দেখেছি এ্যাডমিরাল রিকোভার নিঃসন্দেহে যোগ্যতম নেতা। এন, আর, বি'তে কেউ কাউকে কিছু করতে আদেশ দেয় না। রিকোভারের সুদক্ষ বিশেষজ্ঞরাই প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। একটা আশ্চর্য কথা এই যে, রিকোভার তাঁর আশেপাশের কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক সকলের মনেই স্বতোৎসারিত অনুরাগের আসন পেয়েছেন।

ধৈর্যহীন, নির্মম বলে এ্যাডমিরাল রিকোভারের বদনাম আছে। তাকে অনেকে হৃদয়হীন বুদ্ধিজীবী বলে আনন্দ পায়। কেউ কেউ বলে যে, রিকোভারের মতে, দুটি বিন্দুর মধ্যে যোগসাধনের দূরত্ব ঘোচাতে হলে, মাত্তর ছটি এ্যাডমিরালকে চটপট্ চিরে ফেলতে হবে, সেটাই সহজতম পন্থা! আমিও তাঁকে ওই রকমই দেখেছি। যখন কোনো অতি বিচক্ষণ ধুরন্ধর প্রশাসক ফ্যাকড়া গজিয়ে রিকোভারের কোন্‌ও পরিকল্পনাকে অযথা বিলম্বের বাগড়া দিতে চেষ্টা করে, কিংবা তাঁর ব্যুরোর কোনো কর্তা তাঁরই কোনও অনুবর্তীকে ঘাঁটাতে চেষ্টা করে তখন রিকোভার আপন অস্ত্র প্রয়োগে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না। আমি, হ্যাঁ, আমারও প্রথমে রিকোভারকে কাঠখোট্টাই মনে হয়েছিল, কিন্তু যখন তাঁকে চিনলাম, খুব কাছাকাছি এসে জানলাম তখন সে ধারণা সম্পূর্ণ বদলে ফেলতে হল। এরকম আত্মত্যাগী, উদার এবং সদাশিব মানুষ আমি কমই দেখেছি। সুরসিকও বটে।

পর্ষদে (এন, আর, বি) কয়েক সপ্তাহ কাটবার পরেই হঠাৎ একদিন দেখি যে, এ্যাডমিরাল আমাদের "বীরপুরুষ" বলতে শুরু করেছেন— আমরা যারা আগামী কর্তৃত্বপদের সম্ভাব্য গুরুত্ব কল্পনায় মনে মনে একটু তেতে উঠেছিলাম, বোধ হয় তাদের গায়ে ঠাণ্ডা জল ঢেলে শায়েস্তা করার জন্যেই তিনি আমাদের এইভাবে ঠাট্টা করতেন। এমনকি দপ্তরের স্মারকপত্রগুলির ললাটেও 'Heroes' তক্‌মা মেরে দিতেন তিনি, সেই অবস্থাই সেগুলো ঘুরত।

স্যালি হিগিন্‌স্‌ তরঙ্গ বিভাগের লেফ্‌টেনাণ্ট, তার গানের গলা অসাধারণ মিষ্টি, যে কোন বৃত্তিধারী গাইয়ের চেয়েও ভালো। একদিন স্যালি কি একটা কাজে এ্যাড্‌মিরালের দপ্তরে গিয়ে পড়েছিল। প্রত্যুৎপন্নমতি রিকোভার খুব অল্পেই একটা মানুষের গুণ বা দোষ ধরতে পারেন। তাই স্যালির এই বিশেষ দক্ষতাও টের পেতে তাঁর মোটেই দেরি হল না। তখুনি, সেখানেই স্যালিকে গান শোনাতে বললেন। ও গাইল—গানটা এখন আমার ঠিক মনে নেই।

গান শুনে এ্যাড্‌মিরাল বললেন—"ত্যাখো, তুমি তো আমার জন্যে অনেক করলে! আমি বলছি কি, আমাদের ওই হলঘরে জনকয়েক বীর রয়েছে, তুমি যদি সেখানে গিয়ে 'My Hero' গানটা গেয়ে তাদের শোনাও তাহলে আমি খুব খুশী হব। আর একটা কথা, ওরা হচ্ছে বীর, তাই বলি কি ওদের অফিসে তুমি জুতো খুলে ঢুকলেই ভালো হয়।" তাঁর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে স্যালি পালন করেছিল। এরপর থেকে স্যালি হিগিন্‌সের মোজা পায়ে 'My Hero' গান গাওয়াটা প্রতি মাসে এন, আর, বি'র নিয়মিত অনুষ্ঠানে পরিণত হয়ে দাঁড়াল।

এন, আর, বি'র অনেক স্মৃতিই আমার মনে আজও জাগে, কিন্তু যে ছবিটা আমার কাছে প্রিয়তম সেটাই বলি,—একদিন নৌ-বহরের প্রধান সেনাপতি রিকোভারকে তাঁর সামরিক পোশাক পরতে অনুরোধ করলেন, সেদিন ওঁদের দুজনেরই একটা বিশেষ নেমন্তন্নে খানা-পিনার কথা। আমার কপালে অনেক জরুরী অবস্থায় তৎপরতা দেখা জুটেছে, কিন্তু সেদিন রিকোভারের দপ্তরে যে হৈ চৈ পড়েছিল তেমনটি আমি আর কোথাও কখনো দেখি নি। তাঁর দপ্তরের সব কটি মেয়ে উঠে পড়ে লেগে গেল এ্যাড্‌মিরালকে যথাযথ ভাবে সাজে সজ্জিত করার কাজে। আমি সেখানে দৈবক্রমে গিয়ে পড়েছি, দেখি ওরা হিমসিম খাচ্ছে। কিন্তু বেবাক ওলট-পালট। ইউনিফর্মের যে দিকে রিবন থাকা নিয়ম ওরা ঠিক তার উল্টো দিকে লাগিয়েছে, টুপীর ঢাকনার রং বেখাপ্পা—সে এক বিচিত্র দশা। সাধারণ অসামরিক পোশাকে অভ্যস্ত এ্যাড্‌মিরাল এই কেতাদুরস্ত পোশাকে সাজতে নারাজ।

আমি চট্‌পট তাঁর পোশাকটা দুরন্ত করে টুপীর মাথাটা মানানসই রং-এর আচ্ছাদনে গুছিয়ে দিলাম। এজন্য মেয়েরা নিশ্চয় আমার ওপর কৃতজ্ঞ হয়েছিল। সেদিন দুপুরে খেতে বসে ক্যাপ্টেন ডারফোর্ডের কাছে সেই গল্প করতে করতে হেসে বললাম—"জানো জিম্, জীবনে এই প্রথম একটা এ্যাড্‌মিরালের টুপীর আচ্ছাদন পাল্টে দিলাম।"

কফির পেয়ালায় হাসি ছলকে জবাব দিল—"বহুৎ আচ্ছা এ্যান্ডি, তুমি যা করেছ সেটা কম্যাণ্ডারেরই যোগ্য কাজ, তাই না!"

ততদিনে এটা আমার ভালো ভাবেই জানা হয়ে গেছে যে, আমিই নটিলাসের ভবিষ্যৎ কম্যাণ্ডার কিন্তু তখনও কল্পনা ছিল না যে, আমার কর্তৃত্বের সমগ্র কালটাই সুমেরুর তুষারাচ্ছন্ন অঞ্চলের তলদেশ দিয়ে অভিযানের পরিকল্পনা আর সত্যকার তুষারভেদী অভিযানেই নিয়োজিত হবে। কে জানত তা!

॥ চার ॥

সুমেরু সমুদ্রের জলরাশি জমাট বরফে ঢাকা, এর আয়তন ভূমধ্য মহাসাগরের পাঁচগুণ, আমাদের এই গ্রহের মাথায় এর অবস্থান। দক্ষিণ মেরু অঞ্চল যেমন কঠিন মৃত্তিকাভূমি, তার উপর বরফ আর তুষারের আচ্ছাদন, উত্তরমেরু ঠিক তার বিপরীত—সম্পূর্ণ তরল। প্রচলিত ধারণায় সবাই জানে যে উত্তর মেরুর সমুদ্রের বরফের সবটাই কঠিন বরফ, কিন্তু আসলে তা নয়, তার কোনো কোনো অংশ জমাট বরফের চাঁই আবার কোথাও বা ভাসমান বরফের নীচে তরল জলরাশি, আবার এক এক জায়গায় থাকে থাকে ছোট বড় বরফের স্তর, হঠাৎ সেগুলো দেখলে অখণ্ড জমাট বরফ বলেই ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। জায়গায় জায়গায় প্রণালী রয়েছে, কোথাও বা বরফের মধ্যে ফাটল রয়েছে, আবার কোথাও বা হিমানীহীন জলরাশি, এক এক জায়গায় অনেকখানি উন্মুক্ত জলরাশি তাকেই সুমেরুর লগুন বলে থাকে লোকে। এই বরফদল প্রায়শঃই গতিশীল অবস্থায় থাকে। শীতকালে যখন হিমাঙ্কের অনেক নীচে তাপমাত্রা নেমে যায় তখন বরফের রাজ্য পূর্বে গ্রীনল্যাণ্ডের তীরভূমি ছাড়িয়ে চলে যায় আর পশ্চিমে বেরিং প্রণালী পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয় এই বরফ।

এই অঞ্চল জনমানবহীন, শীতশীর্ণ, অজন্মার শূন্যতায় আচ্ছন্ন—যুগ যুগ ধরে তাই এই অবাধ্য অঞ্চল অভিযানকারী আবিষ্কারের নেশায় পাওয়া মানুষদের আকৃষ্ট করে এসেছে। আরও হাল আমলে সমর দূরদর্শীদের নজর পড়েছে এই দিকে—তাঁদের ধারণা দূর ভবিষ্যতে উত্তর মেরুই যুদ্ধের সম্ভাব্য অকুস্থল হবে।

আমিও ১৯৫৬-র গোড়াতে উত্তরমেরু সম্পর্কে সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি কিছু জানতাম না। হঠাৎ যদি প্রশ্ন করা হত আমাকে, তাহলে

কিছুতেই বলতে পারতাম না যে, উত্তরমেরু বরফের গভীরতা চার ফিট না চারহাজার ফিট। অথচ মাত্র একটি দিনেই আকস্মিকভাবে আমার ধারণা বদলে গেল, যখন আন্দাজ পেলাম যে পেন্টাগণের কয়েকজন অফিসার নটিলাসকে সামনের গ্রীষ্মে উত্তরমেরুতে পাঠাবার জল্পনা-কল্পনা করছেন।

কাছাকাছি নৌ-বিভাগের যে লাইব্রেরীটা রয়েছে আমি সটান সেখানেই হাজির হলাম। আমার কাছে এ গবেষণা নিছক জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করাই তো নয়। যদি একই রকম একটা অভিযাত্রা আদৌ সম্ভব হয় তাহলে —আর অন্য কোনো গোলমাল না হয়, তবে আমিই তো নটিলাসের পরিচালন কর্তৃত্ব করব। আর যদি দেখি যে সুমেরু অভিযানের ঝুঁকিটা নেহাৎ পাগলামি হবে তাহলে যেমন করে পারি সেটা রদ করবার চেষ্টা করব।

এরপর কয়েক সপ্তাহ ধরে দিনরাত সুমেরু অভিযানের কাহিনী পড়লাম। আমাকে নেশার মতো পেয়ে বসল এইসব দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার বিবরণ। কতো মানুষ কী কষ্টই ভোগ করেছে এই দুর্গম বাধাকে অতিক্রমের সাধনায়। এর মধ্যে অনেক কাহিনীই জানা— যেমন শ্লেজে করে সুমেরুর বরফের উপর দিয়ে যাত্রা, কিংবা বেয়ার্ডের এরোপ্লেনে মেরু পরিক্রমার কাহিনী। আমার তো ওসবে দরকার নেই, জাহাজে মেরুপথে যাত্রার কথাই আমার আসল লক্ষ্য।

তার খোঁজখবর খুবই অল্প, যেগুলো পেলাম তার মধ্যে অধিকাংশই বিয়োগান্ত। কোনো কোনো অভিযাত্রীদল বরফের প্রথম বাধাকে পেরুতে পেরেছে। সে তুলনায় ব্যর্থতার সংখ্যাই বেশি। দুটি জাহাজ আজ পর্যন্ত আংশিকভাবে সফল হয়েছে—নরওয়ের 'ফার্ম' আর রুশের 'সেডভ্'। তারাও শেষ পর্যন্ত অসহায়ভাবে বরফের ভাসমান দুর্গে ভেসে বেড়িয়েছে। ফার্ম এইভাবে পঁয়ত্রিশ মাস ভেসে পঁচাশী ডিগ্রি সাতান্ন মিনিট উত্তর অক্ষরেখায় পৌঁছতে পেরেছিল—উত্তর মেরু হল পুরো নব্বই ডিগ্রি উত্তরে। সেডভের পরিক্রমার কালসীমা সে তুলনায় কম—সাতাশ মাসে ৮৬ ডিগ্রি ৫৭ মিনিট উত্তর অক্ষরেখায় তার যাত্রা শেষ হয়। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে মুষ্টিমেয় এক রুশ দল উড়োজাহাজে করে উত্তর মেরুর এক

প্লাবমান তুষারের মধ্যে নেমে পড়েছিল, তারপর নয়মাস ধরে বরফের মধ্যে ভেসে ভেসে গ্রীন্‌ল্যাণ্ডের খোলা দরিয়ায় পৌঁছয়।

সাবমেরিনে করে মেরু অঞ্চলে অভিযানের নজীর খুবই বিরল। সর্বপ্রথম এবং সম্ভবতঃ সমধিক খ্যাত অভিযানটি ব্যর্থ হয়েছিল—সেই অভিযানের নায়ক ছিলেন স্যার হুবার্ট উইল্‌কিন্স, তাঁর ডুবোজাহাজের নামও নটিলাস। উইল্‌কিন্সের মেরু প্রত্যক্ষ পর্যটনের অভিজ্ঞতা থেকে ধরণা হয়েছিল যে, সমুদ্রের মধ্যে অনেক প্রণালীপথ আর হিমহীন জলরাশি রয়েছে যার মধ্যে দিয়ে ব্যাটারীশক্তি চালিত ডুবো-জাহাজে সমুদ্র অতিক্রম করা সম্ভব। যেখানে সেরকম দুর্ভেদ্য বরফ পড়বে সেখানে সাবমেরিন জলের গভীরতম দেশে ডুবে চলবে, আবার খোলা জল পেলে ব্যাটারীকে চার্জ করে নেওয়া যাবে। তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে বরফের তলার দিকটা যথেষ্ট কোমল হবে। তাঁর মগজে আরও অনেক রকম কলকৌশল ছিল।

যুক্তরাষ্ট্র তাঁকে একখানা সাবমেরিন দিয়েছিল, তিনি নিজের অভিযানের উপযোগী যন্ত্রপাতি তাতে লাগিয়ে নিলেন—বরফের তলায় চলবার মতো ষোলআনা বন্দোবস্ত করার সঙ্গে তিনি এমন ব্যবস্থাও করে নিলেন যাতে ক'রে জাহাজখানা বরফের মধ্যে আটকে গেলেও সেই বরফকে কেটে চিরে আবার জাহাজ বেরিয়ে আসতে পারে। ঘনঘটা, জাঁকজমকের প্রচারের মধ্যে উইল্‌কিন্সের অভিযান শুরু হল।

উইল্‌কিন্স-এর নটিলাস ১৯৩১-এর অগাষ্টে স্পিট্‌সবার্গ এবং গ্রীনল্যাণ্ডের মধ্যবর্তী জমাট বরফের মুখোমুখী পৌঁছেছিল। কিন্তু বস্তুগত অঘটনপত্তিই অভিযাত্রীদের বিপত্তি ঘটিয়েছিল। হঠাৎ দেখা গেল যে জাহাজের গলুই-এর বেঁদা খোয়া গেছে, কোথায় যে হারালো তার হদিস নেই। এই অবস্থায় জলের নীচে ডোবা বা জাহাজকে সামলানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার, বিপদজনক তো বটেই তবুও সাবমেরিনকে বরফের তলায় নামিয়ে দেবার চেষ্টা কয়েক বার করা হল। তার ফলে সাবমেরিনের খোলের ভেতরে তুষার জমে উঠল। এই দেখে নাবিকদের ভেতরে মেরু অভিযানের উদ্যম জুড়িয়েজল হয়ে গেল। অবশেষে, ওই জমাট বরফের মুখোমুখী অবস্থায় কতকগুলি বৈজ্ঞানিক লক্ষ্যার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা

হওয়ার ফলে এই অভিযানকে ব্যর্থ বিবেচনা করে জাহাজ দক্ষিণ মুখে পশ্চাদবর্তন করল।

এরপর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে আর কোন ডুবোজাহাজ এই চেষ্টা করেছিল বলে আমার জানা নেই। যুদ্ধের সময় অবশ্য কয়েকটা নাৎসী সাবমেরিন জমাট বরফের আনাচে-কানাচে আত্মগোপন করে থেকেছে। তারপর, হয়তো একটা কনভয়ের উপর আক্রমণ চালিয়ে, এইসব বরফের ধারে-পাশে গা-ঢাকা দিয়েছে—মিত্রশক্তির এ্যান্টিসাবমেরিন জাহাজের নাগালের বাইরে পালিয়ে। অবিশ্যি এগুলোর মেয়াদ স্বল্পকালীনই হত এবং এ সম্পর্কে তেমন কোনও বৈজ্ঞানিক তথ্যও সংগৃহীত হয়নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বিভাগের ইলেকট্রনিক গবেষণাগারের এক বৈজ্ঞানিক, নাম তাঁর ডক্টর ওয়াল্ ডোলয়ন্, ভদ্রলোক নামকরা পদার্থবিদ্—তিনিই প্রস্তাব করলেন যে যুক্তরাষ্ট্রের একটি সাবমেরিনকে সুমেরু অঞ্চলের সামরিক কাজে নিযুক্ত করা হোক। এই কাজের নাম হল হাইজাম্প। আমার সঙ্গে ভদ্রলোকের পরিচয় ঘটল অল্পদিনের মধ্যেই, তিনি ধীরে ধীরে কথা বলেন—ভারি ভালো লেগে গেল আমার। ডক্টর লয়নের গোষ্ঠী ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ থেকে সান্ ডায়েগোর গবেষণাগারে; ডুবোজাহাজ এবং সমুদ্রের পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে মাথা ঘামিয়ে চলেছেন। যদি সমুদ্রের জমাট বরফের মধ্যে কোনো সাবমেরিন গিয়ে পড়ে তাহলে কি অবস্থা দাঁড়ায় সেটা জানতে ডক্টর লয়নের অদম্য কৌতূহল। তাঁর প্রস্তাবিত কাজ নির্বাহিত হ'ল এবং ডক্টর লয়ন্ সান্ ডায়েগোতে ফিরে এলেন, মানে তাঁর মেরু অঞ্চল সম্পর্কে উদগ্র আগ্রহ নিয়ে। তাঁর ইচ্ছানুযায়ীই তাঁর কর্ম-শাখার নাম বদলে রাখা হল "সাবমেরিন ও সুমেরু গবেষণা বিভাগ।"

তার এক বছর পরের কথা, যুক্তরাষ্ট্রের 'বোর্‌ফিশ' নামক ডুবোজাহাজখানি অতি সন্তর্পণে জমাট বরফের রাজ্যের ছ'মাইল অভ্যন্তরদেশে ঢুকে পড়েছিল—বরফের তলা দিয়ে ধীরে ধীরে সাবমেরিন একটু একটু করে এগিয়েছিল। সে-বার ডক্টর লয়ন্ স্বয়ং বোর্‌ফিশে চড়ে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে তিনি এমন এক অধোমুখী ফ্যাদোমিটার তৈরী করলেন যার সাহায্যে বরফের ঊর্ধ্বদেশে সৃষ্ট শব্দ বরফ ভেদ ক'রে ওই

মিটারে প্রতিধ্বনিত হবে এবং তা থেকে ধরতে পারা যাবে সাবমেরিন বরফের তলায় কত দূরে পৌঁছেছে।

১৯৪৮-এ এই যন্ত্র উপরের ডেক্-এ লাগিয়ে নিয়ে ডুবোজাহাজ 'কার্প' বরফের তলদেশ দিয়ে কিয়দ্দূর পরিক্রমা করেছিল।

এর মধ্যে হল কি, সেই বছরেই বরফের তলা দিয়ে সাবমেরিন চালানো সম্পর্কে আর একটা নূতন মহলে কৌতূহল দেখা দিল। মন্‌টেরির নৌ-বিদ্যালয়ে কিছুদিনের জন্য শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত কম্যাণ্ডার রবার্ট ম্যাক্যথির ওপর ফরমাশ হল—এক সপ্তাহকাল ধরে তাঁকে সুমেরু সমুদ্রের নাব্যতার উপর বক্তৃতা দিতে হবে। কম্যাণ্ডার ম্যাক্যথি ডুবোজাহাজী মানুষ, সুমেরু দরিয়ায় সফর-ব্যাপারে তাঁর বিশেষ কিছু জানা নেই। একটু মুশকিলই হল ভদ্রলোকের। তবে তিনি এ খবরটা রাখতেন যে বিমানবাহিনীর তরফ থেকে সুমেরু-নাব্যতার কলাকৌশল নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ হচ্ছে। কাজেই ম্যাক্যথি বৃথা কাল ব্যয় না করে, একটা কায়দা করে এয়ারফোর্সের একটা প্লেনে চড়ে মেরুর উপর দিয়ে পাড়ি মারলেন এবং আঠারো হাজার ফিট উপর থেকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন যে সমুদ্রের বুকে শুধু কঠিন বরফই জমে নেই, হিমানীহীন জলরাশি এবং প্রণালীও যথেষ্টই রয়েছে।

বিমান বহরের জনৈক মুখপাত্র ম্যাক্যথিকে জিজ্ঞাসা করেছিল—"তোমরা কেন এই সব জায়গায় ডুবোজাহাজ চালাতে পারো না?"

ম্যাক্যথি বিমর্ষভাবে জবাবে বলেন—"আমি ঠিক জানি না।"

এই থেকেই নূতন ধারণার জন্ম হল। এবং এর পর থেকে ম্যাক্যথির মাথায় এই পোকাটা নড়াচড়া করতে লাগল—তিনি আর সব ছেড়ে দিয়ে মেরু দরিয়ায় সাবমেরিন চালনার সম্ভাব্যতা নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগলেন। ১৯৪৯ সালে তিনি এই মর্মে নৌ-দপ্তরের কাছে এক আর্জি পাঠালেন যে, তাঁকে তুষারচূর্ণী জাহাজ বার্টন-আইল্যাণ্ডে নিযুক্ত করা হোক। একজন ডুবোজাহাজীর পক্ষে এ ধরণের ইচ্ছা মোটেই স্বাভাবিক নয়। মেরু অঞ্চলের আকর্ষণ তাঁকে পেয়ে বসেছিল বলেই তিনি এই কাজটা যেচে নিতে চাইলেন। আলাস্কার কাছাকাছি প্রাণীবর্জিত অঞ্চলের বরফ জমাট এলাকায় একটা মুক্ত জলরাশি থেকে অপর এক

মুক্ত জলের মধ্যবর্তী চাঁই চাঁই বরফকে চৌচির করে দিয়ে ম্যাক্যথির জাহাজ চলে, ডুবোজাহাজ—ঠিক হুবার্ট উইল্‌কিন্সের মতো তিনিও স্বপ্ন দেখেছিলেন, এমনি করেই একদিন তুষার প্রাচীরের বাধা অতিক্রম করে অবলীলাভরে উত্তর মেরুতে পেঁছবার স্বপ্ন। ফ্যাদোমিটারের হিসেবে কোনো গোলমাল নেই, সে ঠিক হিসেব দিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের গভীরতার হিসেব—এর আগে এমন করে এই এলাকার তলদেশের খবর আর কেউ পায় নি। বার্টন-আইল্যাণ্ডের সংগৃহীত খবর আমাদের কাজে লাগবে বই কি।

ডক্টর লয়েন্ এসেছিলেন বার্টন-আইল্যাণ্ড জাহাজে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে। গবেষণার উদ্দেশ্যে একটা অল্পদিনের পরিক্রমা করেছিলেন এই জাহাজে চড়ে। ডক্টর লয়েন্ আর ম্যাক্যথির মনের গড়ন, মানে, চিন্তার ধারা একই খাতে চলেছিল, সম্ভবতঃ সেই জন্যেই নৌবহরের প্রধান সেনাপতির কাছে ঘন ঘন চিঠি আসতে লাগল। তাঁদের উভয়ের পত্রের বক্তব্য এক —সুমেরু অঞ্চল ডুবোজাহাজের দ্বারা অতিক্রম করা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। সহজসাধ্য নয়, বাধাবিপত্তি অবশ্যই রয়েছে। তা থাক, সেগুলো ডিঙোনো যায়। প্রধানতঃ ডক্টর লয়েনের চেষ্টাতেই ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে ‘রেড্‌ফিশ’ ডুবোজাহাজের উপর নির্দেশ এল—জমাট বরফের বাধা ভেদ করতে হবে। তারপর রেডফিশের অভিযান। ডক্টর লয়েনের আবিষ্কৃত গিয়ার লাগিয়ে নিয়ে জাহাজ ডুব দিল বরফ জমা এলাকায়, কুড়ি মাইল গিয়েছিল সেই রেড্‌ফিশ, আট ঘণ্টা ছিল বরফের তলদেশে। এরপর উপর মহলে মেরু অঞ্চলে ডুবোজাহাজ পাঠানোর উৎসাহে ভাটা পড়ল।

কিন্তু ডক্টর লয়েন বা ম্যাক্যথি হাল ছাড়েননি। ১৯৫৬-র শেষ দিকে ম্যাক্যথি চীফ অব দি নেভাল অপারেশানসের (সি-এন-ও) দপ্তরের মর্যাদাসম্পন্ন পদে বহাল হয়ে গেলেন। এই সময়ে সেনেটর হেন্‌রি জ্যাক্‌সনের কাছ থেকে সি-এন-ও এই মর্মে এক পত্র পেলেন—বরফ জমাট এলাকায় আনবিক শক্তিপরিচালিত সাবমেরিন পরিক্রমা সম্ভব কি না? সেনেটর জ্যাক্‌সন সদ্য উত্তর মেরু ঘুরে এসেছেন উড়োজাহাজে করে। সি-এন-ও চিঠিখানার জবাবের ভার ম্যাক্যথির হাতে

দিলেন। এবং বলাই বাহুল্য যে তিনি খুব জোর কলমে সমর্থনসূচক 'হাঁ' লিখে দিলেন।

খাতায় কলমে আনবিকশক্তি চালিত ডুবোজাহাজ মেরু অভিযানের পক্ষে যোগ্যতম যন্ত্র তাতে সন্দেহ নেই। যেখানে বরফের বাধা সব চেয়ে দুর্ধর্ষ মেরু অঞ্চলের সেই সব দুর্ভেদ্য দরিয়ার গভীরতম তলদেশে ডুবো-জাহাজ নেমে যেতে পারে। আর, এতে বাতাসের বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই। ব্যাটারীশক্তি চালিত সেকেলে জাহাজের মতো এর দম অল্প কালের মধ্যে ফুরিয়ে যাবার আশঙ্কা নেই। পরন্তু যতক্ষণ খুশি এই জাহাজ জলের নীচে অক্লেশেই থাকতে পারে। খুশি মতো একে ধীর মন্থরে বা খুব দ্রুতগতিতে চালানো যায়। প্রণালী বা হিমানীশূন্য খোলা জলের মুখ চেয়ে একে চলতে হয় না। অবিশ্যি ইচ্ছে করলে সে সুযোগ নেবার ক্ষমতাও এর রয়েছে। নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের উষ্ণ আরামে এই জাহাজের নাবিকরা থাকতে পারে। অতএব তাদের কপালে দৈহিক দুর্ভোগ কিছু নেই। জলের চরিত্র, বরফের বৈশিষ্ট্য এবং সমুদ্রগর্ভের নানা খুঁটিনাটি অবগতি ও লিপিবদ্ধ করার জন্য যত রকম যন্ত্রপাতির প্রয়োজন তা এই জাহাজে নিতে কোন অসুবিধে নেই।

সেনেটর জ্যাক্সনের চিঠির জবাব দেবার সময় নৌবহরের প্রধান সেনাপতি এ্যাড্মিরাল বার্ক তাঁর কর্মিবর্গকে বললেন—"সত্যি, এ ব্যাপারটায় আমাদের মন দেওয়া দরকার।" আর তারপরই মন দেওয়া হল। তাই আমি নৌ-বিভাগের কেন্দ্রীয় পাঠাগারের বইপত্রের রাজ্যে বলা যায় তাঁবু গেড়ে বসেছি।

সুমেরু সমুদ্রের সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম—বরফের দুর্ভেদ্য কঠিন বাধাকে অতিক্রমের চেষ্টার নাটকীয়, রোমহর্ষক কাহিনীগুলি পড়তে বসলে বুঁদ হয়ে যাবার দশায় পায়। কিন্তু আমার তো সেটাই লক্ষ্য নয়, আমার চাই খবর: (১) বরফ কতখানি পুরু হতে পারে? (২) দরিয়ার জল কতো গভীর? (৩) ভাসমান হিমপ্লবগুলির মারাত্মক গতি কি জমাট বরফের তলদেশেও ধাবমান হতে পারে?—এসব বিষয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্য যা পাওয়া যাচ্ছে তাতে একটির সঙ্গে অপরটি পরস্পরবিরোধী,—তার মধ্যে রুশের প্রকাশিত খোঁজ-খবরও রয়েছে। সত্যি কথা স্বীকার করতে হলে একথা

বলতে হয় যে আজ পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য কোনও পর্যটনতথ্য মেরুঅঞ্চল সম্পর্কে প্রকাশিত হয়নি। উত্তরমেরু এখনও মুখ্যতঃ অনাবিষ্কৃত অঞ্চল। কেন না, এর সম্বন্ধে কোনও প্রসঙ্গেই দুটি প্রামাণ্য মতের মিল দেখা যাচ্ছে না।

তাহলেও একটা কথা ঠিক যে, আমি যতোই পুঁথিপত্র পড়ছি মনের মধ্যে মেরু অভিযানের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে ততোই উদ্দীপনা বেড়ে যাচ্ছে। আমার ভরসা দিন দিনই বাড়ছে—সমুদ্র যাত্রার ধারাধরণ যা-ই হোক না কেন, ঝাঁপিয়ে পড়াটা আমার মনের কথা। ম্যাক্যথির প্রস্তাব হল, উত্তর-পশ্চিম দিক ধরে যাত্রা শুরু হোক, আলাস্কার নিকটবর্তী কূল বরাবর ম্যাক্লিওর প্রণালী এবং ক্যানাডিয়ান দ্বীপপুঞ্জের মধ্য দিয়ে উপকূলরক্ষী সপার, ব্রাম্বল এবং স্টরিজ এই তিনখানি জাহাজ যাত্রা করুক ১৯৫৭-তে। কিন্তু খুব জলদি এই প্রস্তাব বানচাল হয়ে গেল। আমার নিজের মতে আণবিক-শক্তিচালিত ডুবো জাহাজের যাত্রা শুরু হওয়ার প্রকৃষ্টতম স্থান হওয়া উচিত গ্রীন্ল্যাণ্ড এবং স্পিট্স্বার্জেনের মধ্যবর্তী অথৈ দরিয়াতে—যেখানে স্যর হুবার্ট উইল্কিন্সের দুর্ভাগ্য চিহ্নিত হয়েছে, সেই জমাট বরফই তো আসল পরীক্ষার ক্ষেত্র। আমার চোখের সামনে পর পর অনেকগুলি ভেদ-প্রচেষ্টার পরিকল্পনা ভাসছে, গ্রীষ্মকালই এই পরীক্ষার প্রশস্ত সময়। প্রত্যেকটি প্রচেষ্টা তার আগের চেষ্টার চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হবে। এবং সমগ্র অভিযানটি কয়েক বছর সময় নেবে।

আমি যার সঙ্গেই এ নিয়ে আলাপ করি সে-ই দেখি অভিযাত্রার সপক্ষে উৎসাহী। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে এটা বুঝতে পারলাম, যাদের উপর এই যাত্রা মুখ্যতঃ নির্ভরসাপেক্ষ, মানে পুরনো উঁচুদরের কম্যাণ্ডারেরা প্রত্যেকেই এই অভিযানকে পাগলামি বলে ঠাউরে বসেছেন। তাঁদের মোটামুটি মত—"ওই একটা অজানা অঞ্চলে পা-বাড়িয়ে নাহক আমাদের একমাত্র আণবিক-শক্তি চালিত ডুবো জাহাজকে বিপন্ন করার কোনো মানে হয় না।" একজন এ্যাড্মিরাল আমাকে স্পষ্টই বলে দিলেন—"তুমি যে পাড়ির কথা বলছো সেটা কস্মিনকালে হবে না। বাপু হে তুমি নিশ্চিন্তে আরাম করো।"

কিন্তু একবার যার মগজে মেরু অভিযানের পোকা ঢুকেছে তার ভাগ্যে

আরাম লেখে না। ১৯৫৭-র বসন্তকালের মধ্যে আমি আমার সামান্ত শক্তিতে যতটা সম্ভব সবরকম চেষ্টাই করেছি, অবশ্য ম্যাক্যথিরও চেষ্টার কসুর নেই—আমরা দু'জনে মিলে দশ হাজারের উপর অফিসার এবং পঁয়ত্রিশ জন এ্যাডমিরালের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালিয়ে বিরোধের ভিতকে ঘায়েল করে ফেললাম। বাস্তবিকই দেখা গেল যে হাওয়া আমাদের অনুকুলে ঘুরে গেছে। ততদিনে সমরকৌশলবিদ্ পরিকল্পনা-কারীদের মগজে এটা পরিষ্কারভাবে ধরা পড়েছে যে, যখন আণবিক-শক্তি চালিত, ক্ষেপণাস্ত্র প্রয়োগপটু সাবমেরিন বাস্তবের করায়ত্ত হয়েছে তখন সোভিয়েট তীরভূমির তিন হাজার মাইলের উপর কড়া পাহারা রাখার সুযোগ হস্তগত করার জন্য মেরু অভিযান অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ব্যাপার হবে। পক্ষান্তরে ঠিক এর উল্টো আশঙ্কার কথাও তাঁদের মনে উদয় হয়েছে। রাশিয়াও আণবিক সাবমেরিন তৈরী করছে তাতে সন্দেহ নেই। তারাও তো এই একই উদ্দেশ্যে উত্তরমেরুর উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করতে পারে। তার পর, এই বাদ-বিসম্বাদটি আটলান্টিকের সাবমেরিনের খোদ বড়কর্তা রিয়ার এ্যাডমিরাল সি. ডব্লু. উইল্‌কিন্সের সকাশে উপস্থাপিত হল। তিনি দূরদর্শী এবং দুঃসাহসী, তিনি নিজেই উঠে-পড়ে লেগে গেলেন এই অভিযানকে ত্বরান্বিত করার উদ্যোগে।

অবশেষে ১৯৫৭-র জুনে অর্থাৎ এন-আর-বি' তে এ্যাডমিরাল রিকোভারের কাছে প্রায় এক বছর কাজ করবার পর, আমি ওয়েষ্টকোষ্ট অভিমুখে যাত্রা করলাম—নটিলাসের কর্তৃত্ব গ্রহণের জন্য। এবার আর ১৯৫৭ র গ্রীষ্মে মেরু অভিযান সম্পর্কে আমার কোনো ধোঁয়া রইল না মনে। অবিশ্যি এখনও সরকারী হুকুমের ছাড়পত্র হাতে পাওয়া বাকী রয়েছে।

॥ পাঁচ ॥

সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কোতে যখন পা দিলাম তখন আমার মন জুড়ে আগামী মেরু দরিয়ায় সফরে জল্পনা-কল্পনা—কিন্তু এখানে এসে যে সমস্যার মুখোমুখী হতে হল সেটা বিশেষ জরুরী, আর রীতিমত জটিলও বটে। এখন আমার কাজ, ক্যাপ্টেন উইল্‌কিন্সনের হাত থেকে নটিলাসের কর্তৃত্বভার বুঝে নিয়ে তাঁকে মুক্ত করা এবং জাহাজের নাবিকদের আস্থা এবং শ্রদ্ধা অর্জন করা। জাহাজীদের মনে তেমন ঠাঁই করে নিতে না পারলে ত একচুলও এগোনো যাবে না! জাহাজের কর্তৃত্ব নেওয়ার পরমুহূর্তেই তাদের কাছে পাড়ির ব্যাপারটা বোঝাতে বসতে হবে—এটাই বড় অস্বস্তিকর মনে হচ্ছে।

নটিলাস এখন মাঝ দরিয়াতে রয়েছে। আমাকে জাহাজে পৌঁছে দেবার জন্য হেলিকপ্টারের বন্দোবস্ত করা হল। আপাততঃ জাহাজের সঙ্গে আমি সিয়াটল বন্দরে যাবো, সেখানে পৌঁছে আনুষ্ঠানিকভাবে আমার দায়িত্ব নেবার পালা।

আমরা যখন দরিয়ার ওপর ভাসতে শুরু করলাম তখন মনে কোনো নূতন উদ্দীপনা অনুভব করিনি। আমার কেবলই সন্দেহ হচ্ছিল যে আমার পাইলটের বোধ হয় কখনো কোনো সাবমেরিনের ডেকে মানুষ নামানোর অভিজ্ঞতা ঘটেনি। অবশ্য তার পরেই দেখতে পেলাম জলের নীচে নটিলাসের চকচকে দেহের কালো ছায়াটে অবয়বটা উপরের দিকে উঠে আসছে। জাহাজের লোকেরা হেলিকপ্টার থেকে আমাকে নামাবার কাজে ব্যস্তভাবে ঘোরাফেরা করছে। আমরা জাহাজের ডেকের মাথার কাছাকাছি পৌঁছলাম। তারপর বাকী দূরত্বটা ঝুলে ঝুলে নেমে পড়লাম। উইল্‌কিন্সন্‌ আমাকে সাদর অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত করলেন। তার একটু পরেই সিয়াটলের পথে আমাদের ডুবো সফর শুরু হল।

নটিলাসের আণবিক শক্তিজনিত্রের সম্বন্ধে এতাবৎ অনেক কথা শুনেছি, বিস্তর লেখাও পড়েছি তার আশ্চর্য কলাকৌশল সম্পর্কে। দিন কয়েক এই জাহাজে বাস করে দুটি বিশেষ তাৎপর্যময় তথ্য আমার নজরে পড়েছে, একটি হল এর নাবিকদের তৎপরতা এবং অপরটি এর আরাম —যাকে আমাদের জাহাজী ভাষায় বলে 'বাসযোগ্যতা'।

সাধারণ সাবমেরিনের তুলনায় নটিলাসের কলেবর রীতিমত বড়ই বলা চলে। দৈর্ঘে নটিলাস একটা ফুটবলের মাঠের চেয়েও লম্বা—৩২০ ফিট লম্বা, আর প্রস্থে ২৮ ফিট। এর সব চেয়ে বড় সুবিধে এই যে, বিরাট ব্যাটারীর বহর বইতে হয় না বা ইঞ্জিনের জ্বালানির জন্যে ডিজেলও মজুত রাখার দরকার হয় না এতে, পুরনো আমলের সাব-মেরিনের মতো—ওই সব তোড়জোড়েই ত ডুবোজাহাজের আধখানা খোল জুড়ে থাকে। এই সব ঝামেলা না থাকার ফলে বসবাসের সুবন্দোবস্ত বেশ ফলাও ভাবে করা সম্ভব এতে।'

সাধারণ সাবমেরিনে ওয়ার্ডরুম (যাতে উচ্চপদস্থ অফিসারদের মেস ঘর) যে মাপের হয় এর ওয়ার্ডরুম আয়তনে তার চতুর্গুণ! নাবিকদের মেস ঘরও বিরাট—এত বড় যে, একসঙ্গে ছত্রিশজন অনায়াসে বসে খেতে পারবে—আবার পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘরখানাকে এমন গুছিয়ে ফেলা যায় যে, সেখানে পঞ্চাশটি মানুষ স্বচ্ছন্দে বসে চলচ্চিত্র প্রেক্ষণ করতে পারে। সে ঘরে আইসক্রীম তৈরীর যন্ত্র রয়েছে, জুকবক্স রয়েছে তাতে একটা নিকেলের মুদ্রা ফেললেই পাঁচটা রেকর্ড শোনা যায়। তা ছাড়া নটিলাসের মধ্যে একটা স্বয়ংক্রিয় কাপড় ধোলাই আর শুকোবার মেসিন রয়েছে, নিজস্ব নিউক্লিঅনিক্স বীক্ষণাগার রয়েছে, ফটো এনলার্জ করার ব্যবস্থা সম্বলিত ডার্করুম, মেশিনশপ, একটা লাইব্রেরী রয়েছে তাতে ছশোর ওপর বই রয়েছে। নটিলাসের অঙ্গবিন্যাস এবং রং-ঢং আমেরিকার অন্যতম সজ্জাকরের পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়েছে —কাজেই এর সর্বত্র বৈশিষ্ট্যের ছাপ।

ফিরিস্তি আর কতো দিই, আরামের কোনো আয়োজনেরই কমতি নেই নটিলাসে। প্রতিটি জাহাজীর নিজস্ব প্রসাধনের জিনিসপত্তর রাখার জন্য ধোতাগারে পৃথক পৃথক স্টেনলেশ ষ্টিলের তৈরী টানা খুপরি,

প্রত্যেকের আলাদা নরম পেঁজা রবারের বিছানা (সাধারণতঃ সাবমেরিনে জাহাজীরা দু'জনে এক বিছানায় শুতে বাধ্য হয়, এই প্রথাকেই "গরম শয্যা" বলি আমরা), প্রত্যেকের বিছানার সঙ্গে জুতো রাখার র‍্যাক রয়েছে।

দূরপাল্লার ডুবো সফরে জাহাজের ভেতরে বিষাক্ত গ্যাস জন্মায়, সেই দূষিত গ্যাস নষ্ট করার বন্দোবস্তও নটিলাসের রয়েছে—অক্সিজেন ব্যাঙ্কে জালার মতো বড় বড় বোতলে মজুত অক্সিজেন ব্যাঙ্ক থেকে নিয়ে জাহাজের চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তাপ নিয়ন্ত্রণের বন্দোবস্তও এর সুন্দর, সব সময় ৬৮ থেকে ৭২ ডিগ্রির মধ্যে বাতাসের তাপমাত্রা বজায় রাখা হয়। বায়ুর আর্দ্রতা রাখা হয় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ। জন্ ম্যাগভার্ণ জাহাজের জন্ম থেকেই নটিলাসের সঙ্গী, সে বলে—"আর মশাই আমরা গ্রীষ্মমণ্ডলে গেছি, আমরা একেবারে উত্তরে হিমমণ্ডলেও ঘুরেছি, কিন্তু নটিলাসের ভেতরের অবস্থা সব সময়েই এক রকমই দেখে আসছি। বলব কি কন্‌কনে বরফের মতো ঠাণ্ডা জলের মধ্যে দিয়ে যখন জাহাজ চলে তখনও গরম জামা গায়ে চড়াতে হয়নি আমাদের।"

নটিলাসের সব চেয়ে বড় সম্পদ বোধ হয় এর নাবিকদল। কয়েক-দিনের মধ্যেই টের পেলাম যে এরা সাধারণ জাহাজী নয়। এরা হল জাহাজীদের মধ্যে সব্‌সে আচ্ছা নাবিক, যাকে বলে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন। একটি একটি করে বেছে নিয়ে তারপর ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। মোটামুটি এদের বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। এদের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ বিবাহিত। নৌবহরের ইতিহাসে এরাই হল সর্বশ্রেষ্ঠ ডুবোজাহাজী।

নটিলাসে যোগ দেবার আগে সকলকেই পাকা একটি বছর ধরে আণবিক পুরশ্চালন (Propulsion) সম্পর্কে শিক্ষা নিতে হয়—এক্ষেত্রে এঞ্জিনিয়ার আর সাধারণ নাবিকে কোনো তফাত নেই; পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকা বা না থাকাও গ্রাহ্যের মধ্যে আনা হয় না। এই এক বছরের মধ্যে ছ'মাস আণবিক শক্তি শিক্ষালয়ে পড়াশুনো করতে হয়, আর বাকী ছ'মাস আর্কোতে যে নটিলাসের ভৌম সংস্করণ রয়েছে সেখানে হাতে-হাতিয়ারে কাজ শিখতে হয়। নটিলাস হচ্ছে উচ্চতর শিক্ষার আদর্শ ক্ষেত্র। এ পর্যন্ত এই জাহাজে শিক্ষা নিয়ে নয় জন অফিসার এবং চুয়াল্লিশজন

নাবিক অন্যান্য আণবিক সাবমেরিন পরিচালনা করছে। নটিলাসে আজ পর্যন্ত যে ২৮৮ জন সাধারণ নাবিকের কাজ করেছে তাদের মধ্যে ৪৭ জন প্রমোশন পেয়ে অফিসার হয়েছে কিংবা দায়িত্বশীল কার্যসূচীরত সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে।

তার মানে অবশ্য এ নয় যে নটিলাসের লোকেরা সম্পূর্ণ অভ্রান্ত। আর পাঁচটা জাহাজের কিংবা সংগঠনের মতো এখানকার মানুষদেরও ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে। একবার, কী ওয়েস্ট থেকে নিউ ইংলণ্ডে ডুবো পথে চলতে চলতে নটিলাস অজ্ঞাতসারে এক জেলেজাহাজের মাছধরা জালের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। জেলে-জাহাজের ক্যাপ্টেন খবরের কাগজে এর একটা বিবরণ লিখেছিল—সে লিখেছে, 'আমরা যাচ্ছিলাম দক্ষিণ দিকে আস্তে আস্তে, হঠাৎ দেখি যে, আচমকা আমাদের চলাটা উল্টে গেল, আমরা উত্তরমুখে চলেছি আর তেমনি জোর কদমে, একেবারে ত্রিশ মাইল বেগে; কি হল? ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারি না।' আমার আমলে আর এক কাণ্ড। ইউরোপের দরিয়ায় চলতে চলতে আমাদের সোনারে ধরা পড়ল খুব 'ভারী' একটা কিছু। আমরা ভাবলাম সেটা বোধহয় বিমানবাহী। আমরা সোনারের মাধ্যমে এগিয়ে গিয়ে দুটো টর্পেডো ঝাড়লাম! ভাগ্যক্রমে, সেটা ছিল একটা বৃটিশ মালবাহী জাহাজ। জাহাজের নিরীহ বণিক ভদ্রলোক খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলেন—তা যাবারই কথা, তখন সুয়েজের ঘোঁটটা তুঙ্গে উঠেছে কি না! সেই সঙ্কটকালে, এভাবে টর্পেডোর আক্রমণে ভয় পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। আমার সেই খেলাপের জন্যে পুরো দুটো দিন কেটেছিল, সবরকমী কানুন-কেতায় ক্ষমা চাওয়ার হ্যাপা সামলাতে।

তা বলে নটিলাসের জাহাজীরা বুদ্ধু নয়, হাড়ভাঙা খাটুনীতে জান লুটিয়ে দেওয়া তাদের অভ্যেসও নয় কিংবা তারা আণবিক পুঁথির পোকাও নয়। বরং তারা খোশমেজাজী, বেপরোয়া, যেমন হয়ে থাকে ডুবো-জাহাজীরা, তারা হুবহু সেই ধরণেরই মানুষ।

জাহাজে পা দেবার দিন কয়েকের মধ্যেই একটা মজাদার খবর শুনলাম—আমাদের হাসপাতাল বিভাগের খুব চৌকূদার এক ছোকরার কীর্তি-কলাপের যা নমুনা পেলাম, তাতে তাক লেগে গেল!

নামটা বাদ দিয়ে ব্যাপারটা বলি, নাম গোপন করার কারণটা টের পাবেন।

নানা জায়গায় বিস্তর ঘুরেছে নটিলাস। তার জীবনের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ১৩০,০০০ মাইলের ওপর চক্কর খেয়েছে; যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, ক্যারিবিয়ান এলাকায় অমন দু-দশ-বিশটা বন্দরে খেপ দিয়েছে।

এই সব বন্দরে জাহাজ নোঙর ফেলার পরই আমাদের সেই ওস্তাদ ছোকরা শহরে সফর করতে বেরুতো—নাবিকের বেশ-বাস বাদ দিয়ে নাগরিক পোশাকে সেজেগুজে চোস্ত হয়ে বেরুতো সে। চেহারাটা ভালো, তার ওপর সাজের ঘটায় তাকে দস্তুরমতো বনেদী ঘরানার মানুষ মনে হত। বেরিয়েই সে সিধে গিয়ে ঢুকতো বড় বড় হোটেলে, নাইট ক্লাবে—আর, দেখতে না দেখতে নিজেকে রয়্যাল আলজেরিয়ান বেলুন কোরের হোমরা-চোমরা মেজর কীটিং এই পরিচয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে ফেলত। বলা বাহুল্য যে, তার জাহাজী সাঙ্গোপাঙ্গরা তাক বুঝে এমন সব লাগ্‌সই খোঁজ-খবরের ফিরিস্তি আওড়াতো যে মেজর কীটিং-এর ওপর আসল কর্তাব্যক্তিদের নজর আঠার মতো আটকে পড়ত। আর তারপরই হুড়োহুড়ি লেগে যেত মেজর কীটিংকে নিয়ে—সামাজিকভাবে কীটিং-এর নেমন্তন্নর ফর্দ লম্বা হয়ে পড়ত, এনতার মদ খাওয়ার নেমন্তন্ন। এলাহি কাণ্ড। আসল মতলব হাসিল!

সেবার বার্মুডাতে যখন নটিলাস নোঙর ফেললো, সেই সময়ে রাতারাতি মেজর কীটিং বাজী মাৎ করে বসল। যতো দিন যায় কীটিংএর গতিবিধি ততোই উচ্চতর মহলের দিকে চড়তে থাকে। আমীর-ওমরাহেরা কীটিং-এর সৌজন্যে ভোজসভার আয়োজন করছে—হরদম নেমন্তন্ন সামলাতেই সে ব্যস্ত। এদিকে নটিলাসের নোঙর তোলার লগ্ন এগিয়ে এল। মেজর কীটিং তেমন ভদ্দরলোকই নয়, সে এতদিন ধরে যে সব নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছে তার প্রতিদানে পাল্টা ভোজ না দিয়ে সে ছাড়বে কেন! ওখানকার সবচেয়ে ফ্যাশনেব্‌ল হোটেলে ভোজের আয়োজন করে, সেই মর্মে প্রায় জনাপঁচিশেককে নেমন্তন্নর চিঠি পাঠাল। ঠিকানাপত্তর দিয়ে, শেষকালে একটি ছত্র লিখল "দয়া করে ঠিক ছ'টার সময় আসবেন? আমার হয়তো একটু দেরি হবে পৌঁছতে—কয়েকটা

বিশেষ জরুরী কাজ আছে কি না। তাতে আটকাবে না, দোহাই আপনারা চালিয়ে যাবেন। দেখবেন ওরা যেন খানা-পিনা দিতে দেরি না করে। আমি ঠিকই হাজির হবো আপনাদের কাছে, একটু দেরি হবে, এই যা।"

সেই দিন বিকেল চারটেতে নটিলাস বন্দরের মায়া কাটিয়ে যাত্রা করেছিল। আর মেজর কীটিং দরিয়াতে তার হাসপাতাল কোরের খাশ পরিচয়ে ডিউটিতে মোতায়েন। তার নিমন্ত্রিত অতিথিরা নিশ্চয়ই সন্ধ্যে ছটায় হোটেলে গিয়ে নিশ্চয় মহা উল্লাসে সান্ধ্য-ভোজ উপভোগ করেছে। মেজর কীটিং-এর অনুপস্থিতিতে তাদের আমোদে বিঘ্ন ঘটে নি। অবিশ্যি শেষকালে এইভাবে ফেঁসে যাওয়াতেও তারা নিশ্চয় তাজ্জব বনে গিয়েছিল।

জলে চালু হবার পর থেকেই নটিলাস কতকটা আণবিক শক্তির বাস্তব প্রদর্শনবস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে—বিস্তর নামজাদা বড় লোকেরা এই জাহাজে চড়েছেন আণবিক শক্তি প্রয়োগের প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকর্ম দেখার কৌতূহল নিয়ে—কমসে কম ৬৮ জন কংগ্রেসের সভ্য এবং ১৮৬ জন এ্যাডমিরাল, তা ছাড়া প্রতিরক্ষা বিভাগের এবং নৌ-বহরের বিভিন্ন দপ্তরের সেক্রেটারীর সই আমাদের নৌ-বিবরণী পত্রিকায় রয়েছে। তাঁরা এসে দেখে গেছেন।

এ্যাড্মিরাল রবার্ট কার্ণি যখন নৌ-বহরের সর্বাধিনায়ক তখন একবার স্বল্পকালীন পরিদর্শনে নটিলাসে চড়েছিলেন। দেখাশুনো হবার পর তিনি ওয়ার্ডরুমে বসে জাহাজের দু'জন অফিসারের সঙ্গে গল্প করছেন। এদের মধ্যে কেন্ কারও রয়েছে, সে বলল—'আপনি যদি আমাদের বিবরণীপত্রে একটা স্বাক্ষর করে দ্যান, ত বড় ভালো হয়।' এ্যাড-মিরালের তাতে কোন আপত্তি নেই, সানন্দে লিখে দিতে পারতেন কিন্তু তাঁর কাছে কলম নেই যে! কার তার নিজের কলমটাই এগিয়ে দিল। এ্যাড্মিরাল কার্ণির বাঁ হাতে লেখা অভ্যেস। কিন্তু কলমটা বেয়াড়া, খাতার ওপর অনেক আঁচড় কাটলেন নিজের নামটা লেখার জন্যে—শেষকালে এক ধাবড়া কালি পড়ে' গেল। তিনি বললেন—"জীবনে যতো কলম দেখেছি এটা তার মধ্যে জঘন্যতম।"

কারের কাছে নটিলাসের সব কিছুই সেরা মনে হয়, এজন্য তার মনে একটা উত্তুঙ্গ গর্ব রয়েছে, মায় কলমটিও তা থেকে বাদ পড়ে না। সে শিস দিয়ে ফোড়ন কাটল—"দেখুন এ্যাড্‌মিরাল মশাই, আমাদের জাহাজে যত সর্বাধিনায়ক আজ পর্যন্ত উঠেছেন বলব কি, আপনি হচ্ছেন তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম ন্যাটা মানুষ।"

আমাদের জাহাজে যখনই কোনো বিশিষ্ট অতিথি পরিদর্শনে আসেন, আমরা সাধারণতঃ তাঁকে জাহাজের তাবৎ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্রপাতি নেড়ে-চেড়ে দেখবার সুযোগ দিই—এতে করে আমাদের জাহাজের আশ্চর্য কর্মকৌশল সম্পর্কে তাঁদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে এবং সুস্পষ্ট ধারণাও হয়। একবার হঠাৎ একদল এ্যাড্‌মিরালের আমদানী হল নটিলাসের উপর। চারটি তারকার সম্মান চিহ্নওয়ালা এক এ্যাড্‌মিরাল জাহাজের গলুই-এর চাকা চালাতে শুরু করলেন। তিন-তারাওয়ালা এ্যাডমিরাল সামনের চাকায় গিয়ে লেগে পড়লেন, আর দুই তারাওয়ালা শেষে হালের ওপর হামলা শুরু করলেন।

নটিলাসের হাল আর গলুই-এর চালনযন্ত্রগুলির খবরদারী করে যে লোকটি সে কন্ট্রোলঘরে ঢুকল। সোনার তৈরী তারকাখচিত এ্যাড্‌মির্যাল-দের ওপর একপলক নজর বুলিয়ে আপন মনে ভাঙ্গা গলায় বলল, "হা ভগবান, এরা দেখছি সব জায়গাতেই আনাড়ি অনভিজ্ঞকেই হাল ধরার দায়িত্ব চাপায়!" কথাগুলো যদিচ আপন মনে বলা, তা ব'লে আস্তে সে মোটেই বলে নি, সবাই শুনতে পেয়েছিল।

আমাদের ওয়ার্ডরুমের মধ্যে বিচিত্র চরিত্র দেখলাম চীফ এঞ্জিনিয়ার লেঃ কমাণ্ডার পল্ আর্লিকে। আণবিক রিয়্যাক্টর সম্পর্কে খুব কম লোকেই ষোলআনা খুঁটিনাটি জানে, আর্লির সেইরকম জ্ঞানও সেই বহরের। কিন্তু আর্লিকে কথার খেলায় পয়লা নম্বরের আবিষ্কর্তা বলা চলে। আমাদের জাহাজে তাকে কেন্দ্র করে "আর্লিবাদ" কথাটা চালু হয়ে গিয়েছিল। অনেক টুক্‌রো-খুচ্‌রো রসিকতা তার ঠোঁটের ডগায় নেচে বেড়াত।

খোলামেলা আলাপ-আলোচনাতে আমার আস্থা আছে, তার মধ্যে সত্যিকার উদ্বেগ, দুর্বলতা, ত্রুটী-বিচ্যুতি সবকিছুই প্রকাশ পায়, যে সমাজ-গোষ্ঠী আমাদের গোচর তাকে এর মধ্যে দিয়ে জানা যায়। আমাদের

নটিলাসের নিজস্ব মুদ্রণশালা আছে, সেখানে প্রায় রোজই খবরের কাগজ প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি নানাদিক থেকেই বিশিষ্ট। এর প্রথম বৈশিষ্ট্য, একে "একান্ত গোপনীয়" রাখা হয়, কেন না এতে যে-সব খবর ছাপা হয় তা অন্তত্র প্রকাশ করতে গেলে অশ্লীলতার দায়ে পড়বার আশঙ্কা যোলআনা। দ্বিতীয়তঃ, এর প্রকাশক জন এইচ্‌ মিকাউড একজন চৌটকাটা এবং প্রাণবান মানুষ। পত্রিকার নাম সে নিত্য-নূতন ভাবে পাল্টে দেয়! তার যুক্তি এই যে, নটিলাস জাহাজ অত্যন্ত দ্রুতগামী, কখনো এক জায়গায় বেশি দিন তাকে রাখা যায় না-অতএব নটিলাসের পত্রিকারও নাম পাল্টানোই স্বাভাবিক। পত্রিকায় কার্টুন ছবি একটা থাকবেই, সেটা আঁকে উইলিয়ম ম্যাকিন্‌লে জুনিয়র—চৌকষ ছোকরা সে, কার্টুন আঁকা ছাড়া সে ম্যাজিক দেখাতে পারে, সম্মোহন বিদ্যায়ও তার হাতযশ আছে এবং আমাদের ভোজ-কাজে সে প্রধান পাণ্ডার কাজ করে।

প্রায়ই আমাদের পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি থাকে—"সকলের কাছ থেকে লেখা চাই। কথার পুরোদস্তুর স্বাধীনতা দেওয়া হয়—যা খুশি লেখো। গোপন কিছু রাখি না—আমরা সব বলি—যদি আজ তোমার নামে কিছু ছাপা ছাখো, কাল তোমার বন্ধুর নামে পাল্টা কিছু ফাঁস করো।"

অশ্লীলতার দায় বাঁচিয়ে এখানে কিছু কিছু নমুনা দেওয়া গেল আমাদের খবরের কাগজ থেকে :—

> আমাদের গোলন্দাজ বিভাগ সম্পর্কে একজিকিউটিভ্‌ অফিসারেরা শেষতম অনুধাবনে পরিলক্ষিত হয়েছে দৈনিক ছ'শ ঘণ্টা কাজ— !
>
> চাই ; কেন লেঃ বয়েড জাহাজে চড়েছেন সে সম্পর্কে সংবাদ আবশ্যক। যদি সে-খবর কারও জানা থাকে তিনি যেন দয়া করে সেই সংবাদটা লেঃ বয়েডের গোচরীভূত করেন।
>
> আজকের উক্তি : "গত সপ্তাহেও আমার (এন্‌সাইন) বৈজয়ন্তক বানানটা জানা ছিল না। অথচ আগামী সপ্তাহে আমি বৈজয়ন্তক বনে' যাব।"

তুমি কি একে ছাড়িয়ে যেতে পার? ম্যাকুল এই সফরে পুরো হিম্মতে বহাল! এ যাবৎ তার কৃতিত্ব: সানফ্রান্‌সিস্‌কো থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত সে একবেলাও আহারে ফাঁকি দেয় নি। দৈনিক সে ষোল ঘণ্টা কাজ করেছে হদ্দমুদ্দো (প্রধান পেটি অফিসারদের মধ্যে তৃতীয় স্থান আঁকড়ে রাখবার জন্যে জান কবুল করে), আর তার প্রধান উদ্দেশ্য সব্‌সে মোটা নৌ-জোয়ান হওয়া।

একদিন আমাদের পত্রিকায় ছাপা হল:

পত্রিকা ছাপতে যাবার সময় আমাদের ঝুড়িতে কোনো কাজের খবর ছিল না। এ থেকে এই প্রমাণ হচ্ছে "তাবৎ নোংরা" সাফ হয়ে গেছে। কিন্তু জাত খবরের কাগজের মতো আমাদের পত্রিকার গুপ্তগহ্বরে কিছু সঞ্চিত থাকে। যদি ত্বরিতে সেরকম কোনো খবর কেউ জমা না দেয় তাহলে শেষ পর্যন্ত জাত খুইয়ে আমাদের শেষে নিরুপায় হায় পানামা আইন এন্‌ফোর্সমেণ্ট গ্রুপ কিম্বা সান ডায়েগো পুলিস বা সানফ্রান্‌সিস্কো পুলিস বিভাগের সরবরাহ করা খবরের আশ্রয় নিতে হবে। হয়তো অনেকেরই জানা নেই যে, ওইসব দপ্তরে আমাদের সম্পর্কে অনেক তথ্যই ফাঁস হয়ে আছে।

নটিলাসের খবরের কাগজ সত্যিই স্বাধীন। সেখানে ক্যাপ্টেনকেও ছেড়ে কথা বলা হয় না।

সিয়াট্‌লের দিকে ডুবো পথে দরিয়ার সফরে ধীরে ধীরে আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে উঠল যে, এমন সোনার চাঁদ জাহাজী সাগরেদ ক'জনই বা পায়—নটিলাসের কর্তৃত্ব পেয়েছি আমার বরাত বহুৎ জোর! এখানকার জাহাজীরা যে শুধু কাজেকর্মে দুরন্ত আর খোস্‌মেজাজী তা-ই নয়, পরন্তু নটিলাসের কাছ থেকে যতখানি কাজ যে-ভাবে পারা যায় আদায় করে নেওয়ার চেষ্টায় এরা সব সময় ব্যগ্র থাকে। আণবিক শক্তি চালিত সাবমেরিন কি ভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে বই লেখাতেও উৎসাহ তাদের কম নয়। আমাদের জাহাজের পথ প্রদর্শকসূচক কর্মসূচীর জন্য

তাদের আগ্রহ অকৃত্রিম—এবং সেই কারণেই, অনেকগুলো ব্যাপারে আমরাই প্রথম প্রবর্তক।

একটা নজীর, নটিলাসের দুঃসাহসিকতার দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় আমাদের সিয়াট্‌লে পৌঁছনোর ঘটনাটা। ছোট ছোট বোট নিয়ে পাজেট্‌ সাউণ্ড ধীর মন্থরে চলেছে, এই ধরনের সৌখীন জাহাজে পাশ কাটিয়ে এইরকম অপরিসর চ্যানেলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়া খুব কঠিন। জল এখানে গভীর। কাজেই, ক্যাপ্টেন উইল্‌কিন্‌সন বললেন—"ওদের মাথার ওপর রেখে, একেবারে তলা দিয়ে আমরা জোর কদমে হুস্‌-হুস্‌ করে বেরিয়ে যেতে পারি।"

সম্পূর্ণ ডুবে, ভাসা বোটগুলোর আর যন্ত্রচালিত পোতগুলির তলা দিয়ে নটিলাস শুধু তার পেরিস্কোপের ডগাটা জাগিয়ে, অবলীলাভরে প্রণালীর মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এল। আমরা যখন তীরের কাছাকাছি এসে ঘাঁটিতে উঠব উঠব, তখন ক্যাপ্টেন উইলকিন্‌সন্‌ পেরিস্কোপ পরিচালনার কাজের ফাঁকে খবরটা উপরে পাঠিয়ে দিলেন। আমরা লম্বালম্বিভাবে উপরে ভেসে উঠলাম—তখন আর ওপরে ওঠার পথে কোনো বিপদের আশঙ্কা ছিল না।

আমার সুদীর্ঘ ডুবোজাহাজী জীবনের মধ্যে এমন আশ্চর্য সুদক্ষ পরিচালনা আর একটিও দেখি নি। যখন আমি নটিলাসের দায়িত্ব হাতে নিলাম তখন জাহাজীদের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহের লেশ অবশিষ্ট ছিল না—এরা যে মেরুর জমাট বরফের মধ্য দিয়ে অভিযানের উপযুক্ত সে বিশ্বাস আমার হয়েছে। যদি আমি এদের মনে আস্থার আসন দখল করতে পারি তাহলে দুনিয়ার যে-কোনো জায়গায় যে-কোনো সময়ে এঁরা নটিলাসকে নিয়ে যেতে পারবে এ আমার ধারণা হয়েছে।

॥ ছয় ॥

নৌবহরের উঁচু মহলের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে, তাঁদের মতে, সামনের কয়েক মাস নটিলাসের সর্বপ্রধান কাজ হল NATO-তে পরিক্রমায় ব্যাপৃত থাকা। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে ইয়োরোপীয় দরিয়ায় পাল্টা জবাব দেবার আয়োজন পরিকল্পিত হয়েছে। এবং সেটা উত্তর আটলান্টিক মৈত্রী সংঘের শান্তিকালীন অভিযানের ইতিহাসে নৌবহরের বৃহত্তম কীর্তি বলে গণ্য হবে। এই ব্যাপারে নটিলাস কতদূর কি করতে পারে সেইদিকে সবাই সাগ্রহে নজর রেখেছেন। এমন কি আমাদের নটিলাসের নাবিকেরাও সেই কার্যসূচীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে স্বীকার করতে হয় যে, আমি যে-দিন নটিলাসের কর্তৃত্ব হাতে নিয়েছি সেই মুহূর্ত থেকেই আমার চিন্তা ওই মেরু অভিযান।

দিনে দিনে সেই ভাবনাটা আমাকে গ্রাস করছে। এদিকে গরমের দিনগুলো বয়ে যাচ্ছে, খুব তাড়াতাড়ি যেন তারা চলে যাচ্ছে—অথচ, আমাদের যাত্রার সম্পর্কে কোনো নিশ্চিত খবরও আসছে না। জুলাইতে যখন আমরা সান্ ডায়েগোতে জলের ওপরের জাহাজের ইউনিটের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে এলাম তখন কানাঘুষো খবর পেলাম যে, আমাদের অভিযান বাতিল হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে, সোজা নিউ ইংলণ্ডে আমার ওপরওয়ালা ক্যাপ্টেন টমাস হেনরীর কাছে টেলিফোন করলাম—আসল পরিস্থিতিটা জানা দরকার। সত্যি কোনো সম্ভাবনাই কি নেই?

আমাকে আশ্বস্ত করে তিনি বললেন—"না, না, ব্যাপারটা এখন আর শুধু সম্ভাবনার পর্যায়ে নেই। দেখে মনে হচ্ছে, এ সফর না হয়ে পারে না—সেইভাবেই উদ্যোগ আয়োজন—হ্যাঁ!"

সময় ঘনিয়ে আসছে। আমাদের ওপর হুকুম হয়েছে, সেপ্টেম্বরের কুড়ি তারিখের মধ্যে ইংলণ্ডে হাজির হতে হবে—তার কাছাকাছি সময়ে পাল্টা জবাবের পালা। আমাদের সময়পঞ্জী খতিয়ে দেখলে, হাতে একদম সময় নেই। বিলম্বের অবকাশ নেই। মাত্র দশটি দিন আমরা পাবো জমাট বরফের মধ্যবর্তী অঞ্চলে কাটানোর জন্য। আরও মারাত্মক কথা এই যে, বরফাস্তৃত এলাকায় আমাদের পৌঁছবার কালটা বড় অসময়ে পড়ে যাবে, বছরের শেষ দিক না হয়ে ওটা আরো আগে হওয়া উচিত ছিল। একেবারে অগাস্টের শেষ, তখন আবহাওয়া অনুকূল হয় না। আবার নতুন বরফের স্তর জমে উঠতে থাকে শীতের আশায়।

ডক্টর ওয়াল্‌ডো লয়েনের সঙ্গে সান্‌ ডায়েগোর নৌবিভাগীয় ইলেকট্রনিক বীক্ষণাগারে দেখা করলাম। বরফ-ভেদী যাত্রার নিশ্চয়তা সম্পর্কে সব কথা খুলে বলবামাত্র তিনি আসল ব্যাপারটা ধরে ফেললেন। এবং দ্রুত আয়োজনের তৎপরতার প্রয়োজনটা তিনিই সবচেয়ে ভালোভাবে অনুভব করলেন। তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক হল। সেই সময়ে আমরা দুজনে এই অভিযানের সম্ভাব্য সুযোগ সুবিধা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করলাম। ডঃ লয়েন এর আগে বরফের দরিয়ায় গিয়েছেন, বোরফিশে চড়ে বরফের তলায় যাওয়ার অভিজ্ঞতা তাঁর রয়েছে। শুধু বোরফিশ কেন কার্প, রেড্‌ফিশের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর একটা দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, নটিলাস নিরাপদে বরফের স্তূপের তলা দিয়ে, গভীর দরিয়ায় অনেক দূর পরিক্রমা করতে পারবে। উত্তর মেরুতে পৌঁছানোর বিষয় নিয়ে আমরা বিশেষ কিছু আলোচনা করলাম না। আমাদের মূল আলোচনার কেন্দ্র ছিল, অনেকগুলো অঞ্চল ঘুরতে পারা যাবে এবং বরফ ঢাকা অঞ্চল পরিক্রমার জন্য আমাদের হাতে যে মাপা সময় বরাদ্দ করা হয়েছে তার মধ্যে যতোদূর পারা যায় তথ্য আহরণ করতে পারা যাবে। আমাদের আলোচনার সিদ্ধান্ত একটি পত্রাকারে লিপিবদ্ধ করে একটি প্রতিলিপি নিউ লণ্ডনের ডাকে এবং আর একটি ওয়াশিংটনে পাঠিয়ে দিলাম।

তারপর আমি ডঃ লয়েনকে বললাম যে, তাঁর বিশেষ ধরনের ফ্যাদোমিটার এবং বরফ মাপার যন্ত্রপাতিগুলো তাড়াতাড়ি নটিলাসে

গুছিয়ে তোলার কাজটা এই অবসরে সেরে রাখলে আমাদের সময় অনেকটা বেঁচে যাবে। তিনি রাজী হয়ে গেলেন। এবং বললেন যে, দুজন লোককে আগে নিউ লণ্ডনে তিনি পাঠিয়ে দিতে পারেন। আমরা নিউ লণ্ডনে পৌঁছবামাত্র তারা আমাদের সঙ্গে দেখা করবে এবং অবিলম্বে গীয়ার ফিট করার কাজে লেগে পড়বে। আর এদিকে আমি ওয়াশিংটনে খবর পাঠিয়ে দিলাম, যেন হাইড্রোগ্রাফিক বিভাগের থেকে একজন লোক আমাদের সঙ্গে পানামায় দেখা করে—তার সঙ্গে যেন মেরু অঞ্চলের অধুনাতম চার্ট, বরফের বিবরণী এবং ধ্বনির নক্সা ইত্যাদি যাবতীয় দরকারী খোঁজ খবরের তথ্যাদি থাকে।

আমরা ২১শে জুলাই নিউ লণ্ডনে পৌঁছলাম। তার আগেই জলের নীচের মানচিত্রাদি সম্পর্কে নানা তথ্য আমরা অনুধাবনের পাঠ চুকিয়ে ফেলেছি। নিউ লণ্ডনের ডকে ডঃ লয়েনের লোকেরা আমাদের অপেক্ষায় বসে ছিল—পৌঁছবামাত্র কাজ শুরু করে দিল।

নিউ লণ্ডনে পা দিয়েই কানে এল যে, পানামা থেকে যাত্রা করে পূর্ব উপকূলে আমাদের পৌঁছবার আগেই মেরু যাত্রার ব্যাপারটা প্রায় কেঁচে যাবার দাখিল হয়েছিল। কিন্তু আমি যখন ক্যাপ্টেন হেনরিকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি জবাব দিলেন—"এখন, মাত্র একটি লোক এই সফর বানচাল করে দিতে পারে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"তিনি কে?"

তিনি বললেন—"তুমি।"

"আমি? তা কিছুতেই সম্ভব নয়।"

ওদিকে ওয়াশিংটন থেকে কমাণ্ডার ম্যাক্যথি এসেছেন, সান্ ডায়েগো থেকে পৌঁছলেন ডঃ লয়েন। আর তারপরই আমরা আটলান্টিক সাবমেরিনের খোদ কর্তা রিয়ার এ্যাড্মিরাল উইল্কিন্সের সঙ্গে উপর মহলের আলোচনা সভায় বসে পড়লাম। এই আলোচনার একটা অধিবেশনে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল সেটা সম্পর্কে আমি মাস কয়েক আগেই প্রস্তাব করেছিলাম—যে অঞ্চলে আমরা সফরে যাবো সেখানকার বরফের অবস্থা সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য একটা আকাশ পরিক্রমার প্রয়োজন স্বীকৃত হ'ল।

অগাস্টের পাঁচ তারিখে একটি ছোট দল, তাতে আমি নিজে এবং আমার নৌ-চালন বিশারদ, লেঃ বিল্ লালর, কমাণ্ডার ম্যাক্যথি, ডঃ লয়েন, আর কমাণ্ডার লা কেলি—এই ক'জনে মিলে সুপার-কনস্টেলেসনে চড়ে প্রথম তদারকী পরিক্রমায় বেরুলাম। কমাণ্ডার লা কেলির কর্তৃত্বে ট্রিগার নামক ডুবো জাহাজটি আমাদের বরফভেদী অভিযাত্রায় সাহায্য করবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে যাবে স্থির হয়েছে। উড়োজাহাজী তদারকী দল গ্রীণল্যাণ্ডের থিউল বিমান ঘাঁটিতে নামল,—তেল নিতে হবে, তার সঙ্গে কিছু ঘুম-বিশ্রাম। থিউলে নেমে আমরা যে-যার নৌ-বিভাগীয় 'ডলফিন' স্মারক চিহ্ন খুলে রাখলাম, নইলে বৈমানিক মহলের লোকেরা অযথা কৈফিয়ত তলব করবে—"আরে, এখানে আবার ডুবোজাহাজীদের কি কাজ পড়ল! তোমরা কি জন্যে—?" আমাদের মেরুযাত্রাও বিভাগীয় কৃত্য।

পরদিন, ছয় তারিখ সকালে আমরা আরও উত্তরে উড়ে চললাম। তবে বরফের মাথা থেকে মাত্র পাঁচ থেকে ছশো ফিট উঁচু দিয়ে আমরা চলেছি। দেখেই টের পাওয়া যায় এখানে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। এই তুষারাচ্ছন্ন প্রান্তর ঊষর, বন্ধ্যা, বড় নির্বান্ধব এই বিজন ভূখণ্ড! কিন্তু তার মধ্যেও মানুষ বেরিয়েছে, কুকুরে-টানা স্লেজে চড়ে। ওই বরফের রাজ্য আমার কাছে অভেদ্য ভুল্-ভুলাইয়ার মতো জটিল মনে হচ্ছে। এক একটা অঞ্চলকে মনে হচ্ছে একটা বিরাট অবিচ্ছিন্ন অখণ্ড, অনড় বরফে ছাওয়া পৃথিবী, একটা চাঁই-এর সঙ্গে আর একটা চাঁই-এর ফাঁকটুকু নজর এড়িয়ে যায়, আবার কোথাও বা মিছরির স্তরের মতো একটা স্তরের সঙ্গে আর একটা স্তরের জোড় অসংখ্য খণ্ড-খণ্ড উচ্চাবচ বরফের উপর রোদ পড়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। এক একটা চাঁই জলের উপরে ভেসে বেড়াচ্ছে, কিছুটা বা হিমপ্লাবী জল। জল আর বরফ, চাঁই আর তাল, ছোট আর বড় আর মাঝারি বরফের ইতঃস্তত গায়ে লোনা জল-মেখে রোদ পোহানো, ঘোরাফেরা দেখলে মগজ কেমন করে ওঠে। চোখের সামনে দেখে টের পাচ্ছি যে, খোলা জলের আয়তন আমার মানসিক আন্দাজের অনুপাতে, বাস্তবে বড়ই স্বল্প।

সারাটা সফর আমি প্লেনের একটা জানালায় সেঁটে রইলাম, হাতে একটা মুভি ক্যামেরা, এই ক্যামেরায় বরফের ছবি তোলার বিশেষ বন্দোবস্ত

রয়েছে। এইভাবে আমাদের প্রস্তাবিত পরিকল্পনার পথ ধরে হাজার মাইল চলবার পর, দক্ষিণে গিয়ে আইস্‌ল্যাণ্ডে 'ভূমিষ্ঠ' হ'লাম। পরদিন ফিরে এলাম দেশে।

ইলেকৃট্রিক বোট কোম্পানীতে নটিলাস সগৌরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখলাম, ঝালাই-ঢালাই-এর নানা কাজে কর্মব্যস্ত লোকেরা পিঁপড়ের মতো তৎপর। মশাল, তোড়জোড় কতো রকমের কাজের ফিরিস্তি! ডঃ লয়েনের পাঁচটা ইন্‌ভার্টেড্‌ 'ফ্যাদোমিটার' বসানোর কাজ অনেক এগিয়ে গেছে। তাছাড়া নটিলাসের যথারীতি সারাই-মেরামতের কাজও ভালোই এগিয়েছে।

এরপরই আমাকে মনোযোগ দিতে হল দিগ্‌প্রদর্শী কম্পাসের দিকে, কেন না জলের তলায় ডুব দেবার পর, আপদ-বিপদে ওইটিই হল একমাত্র ভরসা।

সে সময়ে নটিলাসে দু-জাতের কম্পাস লাগানো ছিল, একটি ছিল চৌম্বক কম্পাস, আর একটা জাইরো—এছাড়া আর একটা বাড়তি জাইরোও রয়েছে।

চৌম্বক কম্পাসের সঙ্গে প্রায় প্রত্যেক মানুষেরই জীবনে কোন-না-কোনও সময়ে পরিচয় ঘটেছে। মোটরগাড়িতে, এমন কি সাইকেলেও আমি চৌম্বক কম্পাস লাগানো থাকতে দেখেছি। অনেক সময়ে বয়স্কাউটদেরও ঝোলায় করে এই কম্পাস নিয়ে চলাফেরা করতে দেখেছি। এর তত্ত্ব খুব সহজ, সরল—পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে এর কাঁটা উত্তর দিকটা দেখিয়ে দেয়।···কিন্তু এই চৌম্বক কম্পাস একেবারে সঠিক উত্তর দিক দেখাতে পারে না বা ভৌগোলিক উত্তর মেরু দেখাতে পারে না। যথার্থতঃ এতে যে উত্তর দিকটা পাওয়া যায়, হিসেব করে দেখলে সেটা উত্তর মেরু থেকে কয়েকশ' মাইল দক্ষিণকেই দেখায়। অতএব পৃথিবীর সঙ্গে অবস্থান সম্পর্কের অনুপাতে এই পার্থক্যের হিসাবটা সর্বদাই ধরে নিতে হয়—এখানে অনুমানের উপরই ভরসা করতে হয়। এই সংশোধনকে "পার্থক্য" বলা হয়ে থাকে, এবং এর একটা হিসাব তালিকায় লিপিবদ্ধ করা থাকে। এই সকল সংশোধনকে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেও যদি কোনও নাবিক ষোল আনা চৌম্বক কম্পাসের উপর নির্ভর করে ঠিক উত্তর

দিকে চলবার চেষ্টা করে তাহলে শেষ পর্যন্ত উত্তরের থেকে কয়েক ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে হাজির হবে সে।

আর আধুনিক জাইরো কম্পাস হল একটি জটিল যন্ত্র—জাইরোস্কোপ তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল; ইলেক্ট্রনিক্সের সাহায্যে এ চলে। এর আভ্যন্তর চাকাটা মিনিটে ২২০০০ বার পাক খায়। ঠিকমতো চললে, সর্বদাই এর কাঁটা পুরো উত্তরে থাকে বা ভৌগোলিক উত্তর মেরুকেই এ প্রদর্শন করে। সাধারণ পরিবেশে এতে কোনও সংশোধনের দরকার হয় না, 'পার্থক্যে'র বালাই নেই এতে। যুক্তরাষ্ট্রের সব বড় বড় জাহাজ এবং অনেক বাণিজ্য-পোতও এই জাইরো কম্পাস ব্যবহার করে।

অবশ্য জাহাজ যতোই উত্তর দিকে চলতে থাকে কম্পাসের দিক-দর্শন-ক্ষমতা ততই ভরসার অযোগ্য হয়ে ওঠে—সেখানে চৌম্বক কম্পাস বা জাইরো কম্পাসে বিশেষ ফারাক নেই। চৌম্বক মেরুর এক হাজার মাইলের ভেতরে গিয়ে পড়লেই চৌম্বক কম্পাস বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে আর তারপরেই কাঁটাটা অনবরত পাক খেতে থাকে। তেমনি, যথার্থ ভৌগোলিক মেরুর কাছাকাছি এলে জাইরো কম্পাসের স্থৈর্যচ্যুতি ঘটে। তার কারণ এখানে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়, কেননা তা জটিল।

বরফের নীচে, গভীর সমুদ্রের তলা দিয়ে চলবার সময়, যে সমুদ্রের সম্পর্কে বস্তুতঃ কিছুই জানা নেই—সেখানে যদি কম্পাস আবোল্-তাবোল দিক দেখায়, তখন সাবমেরিনের দ্বিতীয় কোনও প্রদর্শক না থাকার দরুণ বিপর্যয়কর বিপদ হওয়া বিচিত্র নয়।

ধরা যাক, সাবমেরিন 'ক' উত্তর দিকে যেতে যেতে গ্রীণল্যাণ্ড আর স্পিট্স্বার্জেনের মধ্যবর্তী সমুদ্রে বরফের তলায় আটকে পড়ল। এতে সনাতন কম্পাস লাগানো রয়েছে। যেহেতু জাহাজটা মেরুর দিকে চলেছে সেহেতু এর জাইরো কম্পাস একটু একটু করে এমনভাবে ডানদিকে সরছে যে টেরও পাওয়া যাচ্ছে না। এর ইলেকট্রনিক সম্প্রসারণীর ত্রুটীর দরুণ ৯০ ডিগ্রি উত্তর দ্রাঘিমায় এর দিগ্‌দর্শনশক্তি শূন্যে গিয়ে পরিণত হচ্ছে। আবার, চৌম্বক মেরুর সান্নিধ্যের ফলে চৌম্বক কম্পাসের কৃতিত্বও ঘুচে বসেছে। অজ্ঞাত স্রোতের টান শেষে সাবমেরিন 'ক'কে আরও দক্ষিণে ঠেলে যাচ্ছে। মেরু যতই কাছে আসছে জাইরো কম্পাসের পাগলামি ততোই বেড়ে

যাচ্ছে। আর সাবমেরিনটা নিজের অজ্ঞাতে মেরুকে ঘিরে ঘুরে মরছে। এরকম অবস্থায় ভুলের ওপর ভুল বেড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। এমনি করে শেষে হয়তো সাবমেরিনটা ভূমিবেষ্টিত তীরভূমির দিকেই দ্রুত এগিয়ে যাবে। কিংবা আমরা যাকে বলি "দ্রাঘিমা চক্কর" সেই বিপদের মধ্যেও সে পড়ে যেতে পারে।

এই সব সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি এবং এ সম্পর্কে খুঁটিনাটি খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে জানলাম যে জাইরোস্কোপ কোম্পানী নতুন ধরনের একটা কম্পাস তৈরী করেছে তার নাম "মার্ক ১৯"—এই যন্তরটি আগের তুলনায় অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য এবং উচ্চ দ্রাঘিমার পক্ষে এগুলি খুব উপযোগী। পানামা থেকে নিউ লণ্ডনে যাবার পথে রেডিও যোগে খবর পাঠালাম যে, মার্ক ১৯ কম্পাস আমাদের জন্য একটা যেন ব্যবস্থা করা হয়। নিউ লণ্ডনে পৌঁছেই ওই কম্পাস আমাদের জাহাজে লাগানো হল, তত্ত্বাবধানের ভার জাহাজীদের উপর দিয়ে দিলাম।

নতুন 'মার্ক ১৯' কম্পাস লাগিয়ে আমাদের দিগ্‌দর্শন সমস্যার ব্যাপারে যথাসাধ্য কৃত্য সমাপন হ'ল, এতে বরফের তলায় জাহাজ চালানোর ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেল। এরপর আমাদের লক্ষ্য হ'ল, আর সব সম্ভাব্য বিপদাপদের পথগুলো বন্ধ করা। যেমন, হঠাৎ যদি আগুন লেগে যায়, কিংবা হঠাৎ এমন কোনো যন্ত্র বিকল হতে পারে যার ফলে জাহাজ বরফের নীচে অচল হয়ে গেল,—সেই ধরণের বিপদের হাত থেকে বাঁচবার উপায় হল, প্রত্যেকটি যন্ত্রপাতি পরখ করে নেওয়া। যে-যার নিজের যন্ত্রপাতি পরখ করল বার বার। আর, পল আর্লি এবং কয়েকজন দায়িত্ব-শীল নাবিক, জাহাজের প্রত্যেকটি যন্ত্রপাতি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নেড়ে ঘেঁটে দেখে নিল। ফিউজ-বক্সের কনেকৃশন থেকে শুরু করে আণবিক শক্তিজনিত্র, ইলেকৃট্রিক টেস্টার পর্যন্ত কিছুই তারা দেখতে কসুর করল না।

বরফের অবস্থা সম্পর্কে আমার জ্ঞান মোটেই অভ্রান্ত নয়, হয়ত বা এ ব্যাপারে আমার জানার পরিমাণ খুবই সামান্য, তবে এই তথ্যটি সম্বন্ধে আমার ধারণা স্পষ্ট যে, যদি আমরা একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ি কিংবা নটিলাসের ওপরেই যদি কিছু বিপর্যয় ঘটে, তাহলে যেমন করে হোক ওপরে ভেসে উঠতে পারব। যদি আমরা হিমানীক্ষেত্রের কোনও প্রণালী

কাছাকাছি না পাই, কিংবা হিমানীশূন্য জলের হদিস নাও পাই, তাহলে জাহাজকে একটু কাৎ করে কোণাকুণি এনে ফেলে বরফের নিম্নাংশে গোটা ছয়েক টর্পেডো দেগে বরফের মধ্যে ফাঁক করে ওপরে ওঠার পথ বানাতে পারব। যদি তাতে গর্ত তৈরী না হয়, তাহলে আমাদের হাতে আরও উনিশটা টর্পেডো মজুত রইল সেগুলো একের পর এক দেগে যাব। যদি গোটা জাহাজের সারা দেহটা সেই গর্তের মধ্য দিয়ে ঠেলে বেরুবার জায়গা না হয় তবে অন্ততঃ মাস্তুলের পালটুকু ওপরে তুলে দিতে পারব। তাতে আমাদের পেরিস্কোপ, রাডার এবং রেডিওর কাজ পুরোদস্তুর চলবে। আর, তাহলে ওপরের পৃথিবীর সঙ্গে বেতার সংযোগ স্থাপন করতে পারব—সাহায্য চাইবার উপায় তো হয়েই গেল। আমাদের যা দরকার, সেটা চেয়ে পাঠাব। উড়োজাহাজ থেকে স্বচ্ছন্দ্যে সেগুলো ফেলে দিতে পারবে—সারাই বা মেরামতীর জন্য যদি কোনো জিনিষের দরকার হয়, তা আমরা পেয়ে গেলে তখন গুছিয়ে নেওয়া শক্ত হবে না। আর তার চেয়েও যদি অবস্থা খারাপ হয়, তবে মাস্তুলের ওপরে ওঠার যে মই আছে তা দিয়ে অন্ততঃ ওপরে উঠে গিয়ে আমরা জাহাজকে ছেড়ে দিয়ে চলে আসতে পারব।

এগুলো অবশ্য একান্ত নিরুপায় অবস্থার কথা কল্পনা করে ভেবে রাখা, এ বিপদের আশঙ্কা সুদূরপরাহত। তবু চিন্তায় সবটা দেখে রাখা ভালো। শীতের যতো রকম পোশাক-আশাক, ভারী জুতো, মোটা মোজা, পুরু সামরিক ট্রাউজার, মোটা মোটা জাহাজী জ্যাকেট, হেলমেট, সোয়েটার—সব কিছু প্রচুর পরিমাণে জাহাজে মজুত করা হ'ল। নটিলাস বেশ ভরাট হয়ে উঠল। তিন মাসের মত খাদ্যসামগ্রী নেওয়া হল—মেরু অভিযান এবং পাল্টা জবাবের দিনগুলো হিসেবে ধরে। সব কিছু আয়োজন করতে হচ্ছে আমাদের।

পুরনো আমলের সাবমেরিন ট্রিগার আমাদের চেয়ে কয়েক দিন আগেই ডুবো-যাত্রায় পাড়ি দিল—তার গতি নটিলাসের মত দ্রুত নয়। অতএব তাকে জমাট বরফের (আইস্‌প্যাক্) মুখে গিয়ে আমাদের সঙ্গে মিলিত হতে হলে আগেই রওনা হওয়াই বিধেয়। আমার এখন একটা বিষয়ে পরিষ্কার জানা বাকী রয়েছে। আমার কাছে, এ্যাডমিরাল

উইল্‌কিন্সের যে নির্দেশ এসেছে তাতে বলা হয়েছে—"বিবেচনাপূর্বক বরফের তলা দিয়ে যেতে পারো, তবে উত্তর দ্রাঘিমায় ৮৩ ডিগ্রি অঞ্চল পর্যন্ত গিয়ে ফিরে চলে আসবে।" এই উত্তর দ্রাঘিমার ৮৩ ডিগ্রি হল উত্তর মেরু থেকে ৪২০ মাইল দূরে, এবং জমাট বরফের মুখ থেকে ২৪০ মাইল উত্তরে।

আমার ওপরওয়ালা ক্যাপ্টেন হেনরীকে জিজ্ঞাসা করলাম—"অঞ্চল কথাটাকে আমি কিভাবে ব্যাখ্যা করব? এ সম্পর্কে তোমার কোন বক্তব্য আছে?" পক্ষান্তরে আমার প্রশ্ন, যদি উত্তর মেরু পর্যন্ত যেতে চাই তাহলে কি আপত্তি আছে?

সে জবাব দিল—"নটিলাস যা করবে তা ঠিকই করবে এই ভরসা আমাদের রয়েছে। আর এও জানি যে, তুমিও উচিত ব্যাখ্যাই করবে।"

ব্যস, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম সফরেই উত্তর মেরু পর্যন্ত ধাওয়া করা না করা এখন আমার উপরেই ষোলআনা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মনের মধ্যে গোপনে আমার এই আশা যে আমরা শেষ পর্যন্তই চলে যেতে পারব। অবিশ্যি অনেকগুলো পারিপার্শ্বিকের উপরই আমাদের সাফল্য নির্ভর করছে। বরফের তলায় জাহাজীদের হালতবিয়ৎ কেমন থাকে, তার মধ্যে আমার নিজের শরীর গতিকও রয়েছে। এছাড়া কম্পাসের কলকজার কাজ কেমন চলে, তাও রয়েছে। বৈজ্ঞানিক ব্রতের দিক থেকে এইটুকু বলা যায় যে, শেষ পর্যন্ত উত্তর মেরুতে পৌঁছতে পারাটা অভিপ্রেত, তবে সেটা চরম লক্ষ্য নয়।

একেবারে শেষ মুহূর্তে, যখন আমাদের আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, তখনকার একটা ঘটনায় নটিলাসের সবাই অত্যন্ত বিব্রত ও বিপন্ন হয়ে পড়ল। এ্যাডমিরাল উইল্‌কিন্স হঠাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হলেন, তাঁকে অবিলম্বে পোর্টস্‌ মাউথের নৌ-হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার দিন দু-তিন পরে, আমাদের যাত্রার চার দিন আগে হাসপাতাল থেকে তিনি আমায় একখানি চিঠি লিখলেন: "তোমাদের সামনের সফরে তুমি এবং তোমার নাবিকেরা সর্বতোভাবে সফল হও, আমি এই কামনা করি। জানি, তোমাদের এই অভিযানকে অনেকে সংশয় দৃষ্টিতে দেখছে, এবং সাফল্যের সম্বন্ধে তাদের মনে যথেষ্ট

সন্দেহ আছে। আমি তাদের দলে নই। আমার বিশ্বাস, তোমাদের এই অভিযান দেশের প্রতিরক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক উভয় দিকেই বিরাট গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনাযুক্ত। তোমরা যে তথ্যাদি সংগ্রহ করবে সেগুলি যে অত্যন্ত মূল্যবান হবে তাতে আমার একটুও সন্দেহ নেই। দুরধিগম্য, দুঃসাধ্য সাধনের প্রতি মানুষের যে সহজাত আকর্ষণ, এই অভিযান তারই অতুলনীয় অভিপ্রকাশ—এ যেন কল্পনার সীমাকেও অতিক্রমের প্রয়াস। তোমাদের ললাটের জয়টীকা আগামী যুগের মানুষকে পথ-প্রদর্শন করুক, তোমাদের আদর্শ আর সকলের মনে প্রেরণার দীপ জ্বালিয়ে দিক। কঠিন হিম তুষারের তলদেশ থেকে তোমরা যে তথ্য আহরণ করে আনবে তা যেন পরবর্তী অভিযাত্রীদের হাতে মহাসম্পদরূপে গণ্য হয়—তোমাদের দেখানো পথ যেন এই বার্তাই প্রচার করে যে, জাতীয় প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে আণবিক শক্তিচালিত ডুবো জাহাজ সর্বত্র গমনের ক্ষমতা ধরে। আমার বিশ্বাস যে, তোমরা সুনিপুণ দক্ষতাসহকারে সকল বিঘ্নবিপত্তির বিরুদ্ধে যথাযথ সতর্ক হয়ে পরিকল্পনাকে সার্থকতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তোমার আর তোমার সহযাত্রী নাবিকদের জয়গৌরব নটিলাসের পতাকায় ভাস্বর হয়ে উঠুক।"

এই চিঠি পাওয়ার পর, নটিলাস জাহাজের সকল যাত্রীই তার আত্মীয়স্বজন আর পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, ১৯ অগাষ্ট ১৯৫৭, সকাল আটটার সময় বন্দরের নোঙর তুলে যাত্রা করলাম। গন্তব্যস্থল: গ্রীণ্‌ল্যাণ্ড এবং স্পিটস্‌বার্জেনের মধ্যবর্তী জমাট বরফের দরিয়া, সেখান থেকে অতুলনীয় এক ঐতিহাসিক অভিযান।

॥ সাত ॥

ব্লক আইল্যাণ্ড সাউণ্ড-এর অগভীর দরিয়া পেরিয়েই ছ'শো ফিট গভীর বাঁকটুকু অতিক্রম করলাম। তারপর, নটিলাসকে জোর কদমে দৌড় করানো হল— আস্তেসুস্থে চলে জাহাজটার দিল্ হয়তো ঢিমে হয়ে গেছে, একটু চাঙ্গা করা দরকার।

আমরা অনেকখানি এগিয়ে এসেছি, একটা ডকের কাছাকাছি পৌঁছে কয়েকটা খুচরো যান্ত্রিক গোলযোগে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। যে শক্তিশালী আলোটাকে আমরা 'ডুবুরীর বাতি' বলি, সেটাকে উঁচুদিকে মুখ করে লাগান হয়েছিল—যাতে বরফচাঁই-এর তলার দিকটা আমাদের পেরিস্কোপের সাহায্যে দেখতে সুবিধে হয়; সেটায় জল ঢুকে খারাপ হয়ে গেছে। এ ছাড়া যে যন্ত্রের দ্বারা সমুদ্রের জলের তাপ নির্ণয় করা হয় সেই ব্যাথিথার্মোগ্রাফটিও অকেজো হয়ে বসেছে। একনম্বর পেরিস্কোপটা এমন জখম হয়েছে যে সেটা মেরামত করা দুঃসাধ্য— চেষ্টা করতে গিয়ে আমার ঘাড় বেয়ে লোনা জল চুঁয়ে চুঁয়ে পড়তে লাগল।

একজন জাহাজী টিপ্পনী কাটল—"দশ কোটি টাকার বাড়ির ছাদটাই ফুটো!"

এরকম একটা মন্তব্য থেকে যে কি করে পুরনো দিনের কথা জেগে উঠল, ভারি অদ্ভুত লাগে তা ভাবতে। যখন পেরিস্কোপের ভারি ওজনটা কষ্ট করে ঠেলে তুলছি, সমুদ্রের ধূসর জলরাশির দিকে তাকিয়ে আমার মনে ভেসে উঠল ১৯৪৬-এর কথা।

তখন যুদ্ধ থেমে গেছে। বনি আর বাচ্চা মাইককে নিয়ে সেই সবে ঘরকন্নার সুযোগ পেয়েছি। নিউ ইংল্যাণ্ড আমাদের জাহাজ ট্রাচ্চার মেরামতী দেখাশুনো করাই আমার কাজ, এখানে বাসা ভাড়া পাওয়া খুব শক্ত। যাইহোক, ব্ল্যাক পয়েণ্ট বীচে একটা ডেরা মিলল, মাসে

তার ভাড়া লাগে একশ' ডলার। মে মাস নাগাদ একজন দালাল এল আমাদের বাড়িটা দেখতে। ব্যাপারটা আমাদের আদৌ মনঃপুত নয়, কেন না আমাদের তো এখন বাড়ি ছাড়ার কথা নয়। চুপ করে থাকতে না পেরে আমি দালালকে জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপারখানা কী? সে জবাব দিল, "গ্যাখো, আমার তো মনে হয় যে, তোমরা জুন মাসে আর এ বাড়িতে থাকবে না! কেন না, জুনে এর ভাড়া বেড়ে যায়। চারশ ডলার ভাড়া দিয়ে কি তোমাদের থাকা পোষাবে?" আমরা যখন এ বাড়ি নিই তখন আন্দাজ করতে পারি নি, তা ছাড়া কেউ বলেও নি যে, গরমকালে এখানকার বাসা ভাড়া আকাশে চড়ে। একটা লেফটেনাণ্টের যা আয় তাতে এ বাড়ি নাগালে মেলে না। অতএব আমাদের ছাডতেই হল বাসা।

আমার মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল, সংকল্প করে বসলাম, ভাড়া বাড়িতে আর থাকব না। বাড়িওয়ালার তাঁবে আর যাচ্ছি না, ঢের হয়েছে। যেমন করে পারি নিজের বাড়ি বানিয়ে তবে ছাড়ব।

সবাই আমাকে পাগল ঠাউরাল। বাড়ি তৈরীর জিনিসপত্র যোগাড় করা খুব কঠিন, মেলে না বলাই ভালো। তখন গোটা নিউ ইংলণ্ডের চৌহদ্দীতে নতুন একটিও বাড়িঘর হচ্ছে না। তাতেও দমলাম না, এখানে সেখানে দৌড়ঝাঁপ করতে লাগলাম, দুজন ছুতোর মিস্তিরিকে বহাল করলাম, আর নিজেও বিকেল থেকে বাড়ির কাজে হাত লাগাতে শুরু করলাম। তাছাড়া ছুটীর দিনে পুরোটাই মিস্তিরিদের সঙ্গে সমানে কাজ করতাম। ছেলেবেলায় সেই যে কাঠের দোকানে কাজ করার অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেটা এখানে খুব খেটে গেল, সত্যি কথা বলতে কি আমাদের বাড়ির অর্ধেকটাই আমার মগজ আর মেহনতে গড়ে উঠল! অনেকে ভিড় করে মজা দেখতে জড়ো হত, ভাবত এই ছিটেল ছোকরা বাড়ি তৈরীর চেষ্টায় কী পাগলামোটা করছে, ওরা বড় গলায় নিদেন হেঁকেছিল, এধারে যাহোক তাহোক, ছাদ বানাবার মালমশলা তো আর জোটাতে পারবো না আমি! আর যদি বা পাই, তাহলে সে ছাদও তেমনি হবে, নিউ ইংল্যাণ্ডের অন্য সব খাশা বাড়ির মতো আমাদের ছাদ উমদা হবে না, ঢালুটা অনেক কম কিনা

—আমার বাড়ির ছাদ দিয়ে বৃষ্টির জলে ঘর ভেসে যাবে। অতএব, এ আমার পণ্ডশ্রম।

তারপর? বাড়ি তৈরী হল, তাতে আমরা দীর্ঘকাল বসবাসও করেছি, ছাদ দিয়ে একফোঁটাও জল পড়ে নি। অসম্ভব পরিকল্পনা সম্ভবপর বলে প্রমাণিত হয়েছিল বই কি! পেরিস্কোপটা নামাতে নামাতে আমার সেই কথাটাই মনে এল। সেই এ্যাণ্ডারসন আজ আবার একটা "অসম্ভব" কাজে হাত দিচ্ছে। কে জানে সফল হবো কিনা।

জাহাজের অপেক্ষাকৃত জ্যেষ্ঠ অফিসারদের এখন একটা দিকে মনোযোগ এসেছে, সেটাই হল সবচেয়ে দরকারী, অথচ সেদিকে আমরা বন্দরে কাজের চাপে নজরই দিতে পারি নি—সেটা হ'ল, জাহাজের নাবিকদের বরফের তলার দরিয়ায় সফরের সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা! অবশ্য আমাদের এই যাত্রার ধরণ সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা একটা সকলেরই আছে এবং আমাদের গন্তব্য লক্ষ্যটা কোথায় তা এরা সবাই জেনেছে। কিন্তু, যখন আমাদের অভিযানের সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হল, কি ভাবে আমাদের যেতে হবে সেটা জানানো হল তখনই অনেকে ঘাবড়ে গেল। আমাদের জাহাজের ডাক্তার ডবিন্‌স্ রিপোর্ট দাখিল করলেন, জাহাজের শতকরা নব্বই জনের মন খুব আতঙ্কগ্রস্ত।

এই আতঙ্কের উদ্বেগ কাটাবার জন্য আমার কার্যনির্বাহক অফিসার লেঃ কমাণ্ডার ওয়ারেন কোবিয়ান এক প্রস্থ বক্তৃতাবলীর ফর্দ তৈরী করলেন—মেরু অঞ্চল এবং জমাট বরফের বিস্তারিত প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে। জাহাজীদের 'মেস্'-এ এই বক্তৃতার সঙ্গে ছবি দেখানোরও ব্যবস্থা করলেন তিনি। তার মধ্যে আমার তোলা চলচ্চিত্রও রয়েছে—নৌবহরের উড়োজাহাজে বরফ ঢাকা সমুদ্র সফর করবার সময় এই ছবিগুলো তুলেছিলাম। প্রথম দিনের চলচ্চিত্র দেখে এক জাহাজী বলল—"বরফ, বরফ, কেবল বরফ! ভাই সব, এই সাফ বলে দিলাম। ইংলণ্ডে যেদিন পা দেবো সে রাতখানা মদে আমরা চুর্‌র হয়ে থাকব, হ্যাঁ!"

সেই সন্ধ্যেটা আমরা ওপরেই ভেসে থাকলাম, পেরিস্কোপটা মেরামত না করে আর তলায় নামব না। আমাদের মেরামতী কাজ চলছে, এমন

সময় আমাদের খুব কাছাকাছি একখানা জাহাজ এসে পড়ল। জলপথের দস্তুর-মাফিক তারা নটিলাসের গায়ে সার্চলাইট ফেলে প্রশ্ন করল—"কোন্ জাহাজ?" জবাব দেওয়া হল। আবার কৈফিয়ৎ চাইল, 'কি ব্যাপার, কোথায় যাওয়া হবে?' একবার মনে হ'ল বলি 'উত্তর মেরু।' কিন্তু তখুনি ভাবলাম যে, তাহলে ওরা ধরে নেবে আমরা মস্করা করছি। তাই বলে দেওয়া হ'ল, আমাদের বিশেষ ধরনের কাজের ভার দেওয়া হয়েছে, সেই সফরে বেরিয়েছি।

অবশেষে পেরিস্কোপের ছেঁদাটা সারানো গেল। আমরা আবার জলের তলায় নেমে পড়লাম, এটাই আমাদের স্বাভাবিক পথ—সরাসরি উত্তর মুখে প্রচণ্ড গতিতে দৌড় জুড়ে দিলাম। নটিলাসের জীবনযাত্রা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। এখন আমাদের শুধু একটা কসরৎ রপ্তো করতে হবে। নীচে থেকে সরাসরি সোজা উপরে ওঠার কায়দা অভ্যেস করে নেওয়া দরকার, কেন না বরফের মধ্যে থেকে ওপরে উঠতে গেলে যদি সামনের দিকে জল না পাওয়া যায়, শুধু সামান্য খানিকটা পরিসরই জল আর চার পাশে যদি বরফ ঘেরা থাকে, তাহলে? তাহলে আমাদের চিরাচরিত সামনের দিকে এগিয়ে ওপরে ওঠার অভ্যেসটা ত কোনো কাজেই আসবে না—সেক্ষেত্রে দরকার হলে খাড়াই ওপরে উঠতে পারা চাই। আমার এখন কাজ হল শুধু জমাট বরফের সম্পর্কে যে সামান্য তথ্যাদি জোগাড় হয়েছে সেগুলোই বারবার নেড়ে-ঘেঁটে দেখা, ভাবা আর তার উপর নতুন কিছু চিন্তার চেষ্টা করা; কিম্বা ওয়ার্ডরুমে বসে অফিসারদের সঙ্গে তাস খেলা। পিছন দিকে গলুইএর খোলে জাহাজীদের আস্তানায় জন হাগ্রেভ বলে এক জাহাজী নিজের খেয়ালে একটি ভাসা-জাহাজের মডেল বানাচ্ছে। খুব জটিল তার অঙ্গসংস্থান। যখন সে মডেলকে অরক্ষিত রেখে অন্যত্র কাজে চলে যায় তখন একটা বিজ্ঞপ্তি লট্‌কে দিয়ে যায়, "আমি জানি এটা বিল্‌কুল ভুল ভাবে বানানো হচ্ছে, ভেঙেও পড়বে নির্ঘাত। তবে আমার হাতেই এর মৃত্যু হোক এটাই আমি চাই।"

আমাদের নিজস্ব প্রাত্যহিক সংবাদপত্র 'স্ট্যাণ্ড'-এ সেঁটে দেওয়া হয়। শুক্রবার ২৩শে অগাষ্টের কাগজে 'একান্ত গোপনীয়' শীর্ষক এক ব্যঙ্গ চিত্র

প্রকাশিত হল। রয়্যাল আলজেরিয়ান বেলুন কোর্-এর স্বনামধন্য মেজর কীটিংকে জবরদস্ত অভিযাত্রীর বেশে,উৎকট শীতের উপযুক্ত পোশাকে হাজির করা হয়েছে এই ব্যঙ্গচিত্রে—তিনি সম্মুখের টর্পেডো-রুমে দাঁড়িয়ে! ছবির তলায় বিশ্লেষণী বিবরণে বলা হচ্ছে, প্রচণ্ড সংকল্প নিয়ে মেজর কীটিং অভিযানে বেরিয়েছেন। তিনি নটিলাসের এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো পর্যন্ত পৌঁছবার শর্টকাট পথ আবিষ্কার করতে বদ্ধপরিকর। সেদিনই দু'জন জাহাজীর মধ্যে কথা হচ্ছে; আমার কানে গেল কথাটা, ওরা তা টেরও পায় নি। আলোচনার বিষয়বস্তু বরফের তলায় দরিয়া: ওদের মধ্যে একজন, নাম তার জেমস্ আউয়েন্স্, জাহাজের খোদ কর্তার ওপর তার আস্থা আছে। সে এই ভরসায় নিশ্চিন্ত যে ক্যাপ্টেন যা করবে তা ভুল হতে পারে না।...তার স্যাঙাৎ ডোনাল্ড উইল্সন জবাব দিল—"আমারই কি ভরসায় কিছু ঘাটতি আছে। ক্যাপ্টেনের কক্ষণো ভুল হতে পারে না। তবে ভাই আমার এখন মনে হচ্ছে, নিউ ইংলণ্ডে থেকে গেলেই ভালো করতাম।"

নটিলাসের মধ্যে এখন একটা প্রধান সমস্যা দেখা দিয়েছে, অনেকেই মোটা হয়ে যাচ্ছে৷ যেহেতু আমাদের এই জাহাজে যে 'খানা' দেওয়া হয় তা নৌ-বিভাগের বরাদ্দ আহার্যের মধ্যে সর্বোত্তম এবং বদ্ধ জায়গায় মেহনত করে মেদ ঝরানোর সুযোগও বিশেষ নেই, তার ফলে —প্রায় সবাই মুটিয়ে যাচ্ছে। এবারের সফরে আমরা ওয়ার্ডরুমেও ওজন নেবার যন্ত্র বসিয়েছি। তার ফলে সকলেই এই মেদবৃদ্ধি সম্পর্কে সচেতন!

সকলের মনে এই মেদ বাহুল্যের উদ্বেগ তরুণতর অফিসার মহলে একটা রসিকতার খোরাক হয়ে দাঁড়াল। ডাক্তার ডবিন্স এই মেদ কমানোর অভিযানে উঠে পড়ে যেমন লেগেছেন তেমনি অফিসাররাও তাঁর পিছনে লাগল। রোজ ভোরে তারা ডাক্তারের ঘরে ঢুকে পড়ত, তিনি তখন ঘুমে অচেতন—তারা তাঁর খাকী বেল্ট থেকে আট ইঞ্চি কাপড় কেটে ফেলত। তার ফলে ডাক্তারের বেল্ট বাঁধা দিন দিনই একটা সমস্যা হয়ে পড়তে লাগল। এবং আমরা বুঝলাম যে বেচারী এখন নিজের কোমর বেড়ে যাওয়া নিয়ে বেশ দুর্ভাবনায় পড়েছেন। চার পাঁচ

দিন এইভাবে কাটবার পর ডাক্তার খাওয়া কমিয়ে দিলেন, ফলটল সব ছেড়েই দিলেন। তা লক্ষ্য করেও আমরা কোনো সাড়াশব্দ করি নি, এই শাস্তিটা তিনি নিজের ঘাড়ে অযথা নিলেন। অবিশ্যি কয়েক দিন পরে ব্যাপারটা ফাঁস করে দেওয়া হ'ল।

মঙ্গলবার ২৭ অগাষ্ট আমরা উত্তরে অনেক দূর এগিয়ে এসেছি, আইসল্যাণ্ডের কাছাকাছি। আমার মনে হ'ল এবার জাহাজীদের একটু নতুন ভাবে চাঙ্গা করে নেওয়া দরকার। তাই যেমন ক'রে জনসভায় বক্তৃতা হয়ে থাকে সেই ভাবে আমি বললাম:

"বন্ধুগণ! তোমাদের ক্যাপ্টেন কথা বলছে। এবার আমাদের সামনে এক বিচিত্র সফর এগিয়ে আসছে। বিশেষ ক'রে সামনের শনিবার থেকে সেটা মালুম হবে। আমি আশা করি যে, এখানে এমন কেউ এই জাহাজে নেই যার কাছে এই সফরটা ভয়াবহ মনে হচ্ছে, কিম্বা কোনো ভাবে বিপদজনক ব'লে কারুর মনে আশঙ্কার মেঘ জমে উঠেছে। যদি তিলার্ধের জন্যও এমন আশঙ্কা আমার মনে থাকত যে, এই অভিযানে এগিয়ে এমন চমৎকার এই দামী জাহাজটার কোনো বিপদ ঘটতে পারে অথবা এর বীর নাবিকদের জীবন বিপন্ন হতে পারে,—তাহলে জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সোজা বন্দরে গিয়ে ভিড়তাম আমরা।"

এর পরে আমার এগজিকিউটিভ অফিসার আমাকে খবর দিয়েছিল যে, নিউ লণ্ডন ছাড়বার পর থেকে যাদের মনে উদ্বেগ জমে উঠেছিল, আমার এই কথায় তার বিন্দুমাত্রও আর অবশিষ্ট নেই। সে বলল, "ক্যাপ্টেন! এরা সবাই পুরোমাত্রায় প্রস্তুত হয়ে উঠেছে। আপনি যেখানেই নিয়ে যান না কেন এরা তৈরী।"

বুধবার ২৮শে অগাষ্ট আমরা গভীর জলের তলা দিয়ে চলেছি, এপথে এর আগে বড় কেউ যাতায়াত করে নি। কর্তব্যরত অফিসারদের সতর্ক করে দিলাম, এখন থেকে ভালো ক'রে দেখে শুনে এগোতে হবে কেন না হঠাৎ যদি সমুদ্রের তলায় কোনো পাহাড়ের চূড়ায় বাধা পাই, যে চূড়ার সম্বন্ধে কখনো কোন খবর কেউ রাখে নি, অথবা এমন কোনো বরফের চাঁই সামনে পড়তে পারে যা আমাদের হিসেবের বাইরে রয়ে গেছে। অতএব হুঁশিয়ার হয়ে এগোও।

রাত তখন একটা। আমি অঘোর ঘুমে মগ্ন। হঠাৎ যেন মনে হল, প্রচণ্ড একটা ঝুলুনিতে আমার ঘুম ভেঙেছে। জাহাজের পিছন দিকটা অস্বাভাবিক ঝাঁকানীতে যেন অনেকটা ওপর দিকে উঠে গেছে। কাপ, ডিশ, ছাইদান এবং আরও সব আল্‌গা জিনিসপত্র ডেকের ওপর আছড়ে পড়ে ভাঙতে শুনলাম। বাঙ্ক থেকে লাফিয়ে নেমে সটান কণ্ট্রোলরুমে দৌড়ে হাজির হলাম।

জাহাজের হাল পরিচালনা করছিল যে অফিসার সে বলল "ন শো গজ দূরে, সামনের দিকে একটা কঠিন জিনিস রয়েছে।" কাজেই সে ওই জিনিসটার সঙ্গে ধাকার হাত থেকে বাঁচবার জন্য নটিলাসের দ্রুত গতিকে রদ করেছে। 'সোনার'-সংযোগে এখনও কঠিন বস্তুর সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে—আমরা এ থেকে বুঝে নিলাম যে, ওটা বৃহদাকার কোনো মাছ হয়তো হাঙর কিম্বা তিমি হবে। হালের অফিসারকে বললাম যে, ওটাকে এড়িয়ে পাশ কাটিয়ে চলতে হবে, সেইভাবে এগোও। যখন বুঝলাম নাবিকেরা ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে, তারা ঠিক চালাতে পারবে—তখন আবার ফিরে এসে ঘুম লাগালাম।

বৃহস্পতিবার আমরা খুব গভীরে ডুব দিলাম। তারপর একবার নটিলাসকে ওপরের দিকে তুললাম—আমাদের মেরুচক্র অতিক্রমের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য। কিছুক্ষণ পরে পেরিস্কোপ-গভীরে এসে ওপরের আবহাওয়াটা যাচাই করলাম। এখানকার আবহাওয়ার ষোলআনা মেরুআঞ্চলিক ঘন কুয়াশা, আকাশ মেঘে মেঘে কালো, তিন শ'. গজের বাইরে কিছুই দেখা যায় না। পরদিন আমরা 'জান মায়েন' দ্বীপের কাছে গতি শ্লথ করে দিয়ে জলের তলে যে টেলিফোন ব্যবস্থা আছে তার সাহায্যে ট্রিগারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলাম। এই টেলিফোনের দৌড় সাত মাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যে জায়গায় থাকবার কথা ট্রিগার সেখানে হাজির হয়ে বসে রয়েছে। রসিকতা করে আমি লা কেলিকে হুকুম দিলাম—"উত্তর মেরুর দিকে তোমায় এগিয়ে যেতে অনুরোধ করছি।"

সেও ধুরন্ধর অফিসার, সঙ্গে সঙ্গে সে জবাব দিল—"ঘণ্টায় কত মাইল বেগে যাবো?"

যদিও আমাদের নাবিকেরা সবাই চাঙ্গা মেজাজে রয়েছে, আমাদের নটিলাস কিন্তু সেই অনুপাতে বহাল-তবিয়তে নেই। তার হাল খুব শরীফ নয়। পয়লা নম্বরের পেরিস্কোপটা এখনও বাগে আসছে না। আরও দু-একটা গৌণ যন্ত্রপাতি ঠিক মতো কাজ করছে না। আমার সবচেয়ে বেশি দুর্ভাবনা সিও২ বৈজ্ঞানিক সম্মার্জনীটার জন্য—এর কাজ হল জাহাজের ভেতরের আবহাওয়াকে দূষিত গ্যাস-মুক্ত করা। এটা অকেজো হয়ে থাকলে আমাদের প্রত্যেকের স্বাস্থ্য খারাপ হবে! আমরা যখন নিউ ইংলণ্ড ছেড়ে আসি তখন থেকেই এটা বিগ্‌ড়ে আছে, বার বার মেরামত করা হচ্ছে তবু এটা ঠিক কাজ করছে না। তা হোক, আমরা এগিয়ে যাবো, সংকল্প করে ফেলেছি।

বরফ জমাট অঞ্চলের দক্ষিণে আমরা ওপরে উঠলাম। চার হাজার মাইল একটানা জলের নীচে আমরা এগারো দিন ধরে চলে এসেছি। তখনো পর্যন্ত নটিলাসের জীবনে এটাই হ'ল দীর্ঘতম ডুব-সফর। আমাদের জাহাজ থেকে ট্রিগারে কিছু শীতবস্ত্র দিয়ে দিলাম, তা ছাড়া বন্দর ছেড়ে ট্রিগার রওয়ানা হবার পর আমাদের কাছে, যে সব জিনিসপত্র পৌঁছেছিল সেগুলোও দিয়ে দেওয়া হ'ল। তারপর আমরা জলের ওপরে ভেসে-ভেসেই উত্তরে এগিয়ে চললাম। আমাদের মতো ট্রিগারের কাছে জাইরো কম্পাসের নতুন 'মার্ক ১৯' নেই, তার সেকেলে জাইরো কম্পাস এখনই এলোপাতাড়ি চলতে শুরু করেছে। কাজেই আমরা 'মার্ক ১৯'-এর দৌলতে ট্রিগারকে বার কয়েক সামলে দিলাম।

বরফের একটা ছোট চাঁই জাহাজের ডান পাশ দিয়ে ভাসতে ভাসতে চলে গেল। আর একটা বন্দরের কাছে গেলাম। নটিলাসের ব্রীজ থেকে, আণবিক শক্তিচালিত চালক-চক্রকে মন্থরগতি করতে হুকুম দিলাম। জাহাজটা শান্তভাবে হিমশীতল জলের কূলে কূলে চলল। অবশেষে আমরা অজানা বরফের রাজ্যের মুখোমুখি পৌঁছে গেলাম। আমাদের সামনে সেটা দিগন্ত স্পর্শ ক'রে অবিচ্ছিন্ন বিস্তারে বিসারিত হয়ে রয়েছে—পথরেখার চিহ্নমাত্র খুঁজে মেলে না এখানে, মরুভূমির মত অনন্ত, বর্ণ-বৈচিত্র্যহীনতায় রুক্ষ, শুধু একটা উজ্জ্বল আভায় দিগন্ত বিচ্ছুরিত,—একেই উত্তরের লোকেরা তুষার-ধবলিমা বলে!

ঝির-ঝিরে বাতাসে সাগর জল মৃদু কম্পমান, হাল্কা কুয়াশার পেঁজা-পেঁজা খেলার খুশী। ব্রিজের ওপরে বেশ আরামেই আছি, জানুয়ারী মাসে লং আইল্যাণ্ড সাউণ্ডে যেমন ঠাণ্ডা এখানে এখন তার চেয়ে খুব বেশি শীতের কামড় লাগছে না। সামনের বরফময় মহামৌন অবরোধের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ আমার মনে ধীরে ধীরে কতো কথা মুখর হয়ে উঠতে লাগল! সেই মানুষ যারা প্রকৃতির এই অবরোধের বিরুদ্ধে লড়তে এসেছিল, তাদের শক্তি কতো সামান্য, নগণ্য ছিল! কী সাংঘাতিক কষ্ট তাদের পেতে হয়েছিল সেই সব দুঃসাহসিক লগ্নে। একে একে হাজির হতে লাগল—কুক্, রস, পিয়েরী, আমুণ্ডসেন, স্টেফান্‌সন, উইল্‌কিন্‌স। এই সব অভিযাত্রীর পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে আমরা এই নটিলাসের আরোহীরা এরপর বরফের তলায় ডুবে ডুবে পার হয়ে যাবো, ভাবতে গেলেও একটা বিস্ময়কর অনুভূতিতে মনে সম্ভ্রম জাগে—এই রিক্ত, বিজন-লোকের প্রতি একটা শ্রদ্ধার উদয় হয়। আমরা ইতিহাসের ধারা বেয়ে চলেছি। আমরা ইতিহাস সৃষ্টি ক'রে চলেছি।

আমাদের পাশাপাশি ডিজেলের সাদাটে ধোঁয়া ছাড়ছে,—থর থর শিহরণে ট্রিগারও প্রতীক্ষা করছে। ট্রিগার থাকবে জমাট বরফ এলাকার বাইরে, এটাই আমাদের কার্যসূচীর সিদ্ধান্ত। এখানে আমরা যখন বরফের তলায় ডুব দিয়ে এগিয়ে যাবো, তখন এখান থেকেই সে আমাদের জলের নীচের তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করবে। আর সত্যি কথা বলতে কি, ট্রিগার আমাদের মানসিক, নৈতিক সাহস জোগাবে—মদত্ দেবে!

লা কেলীকে আমি জানিয়ে দিলাম যে, বরফের তলায় আমাদের প্রাথমিক অভিযানটা তেমন বড় গোছের হচ্ছে না—মোটামুটি দেড়শ মাইল ধরা যেতে পারে। বরফের নীচে প্রবেশ করবার কুড়ি ঘণ্টা পরে আমরা ট্রিগারের সঙ্গে যোগাযোগ করব। তারপর, যখন আমরা বরফের তলার রাজ্যে খানিকটা অভ্যস্ত হয়ে যাবো, এবং আমাদের বরফ-মাপার বিশেষ যন্ত্রটার ব্যবহারে রপ্তো হয়ে নেবো তারপর আমাদের কম্পাসের কার্যকারিতা যাচাই ক'রে নিয়ে বড় অভিযানে এগোবো।

হাল পরিচালক লেঃ স্টিভেন হোয়াইটকে বলে দিলাম, 'এবার ব্রিজ ফাঁকা ক'রে নিয়ে ডুব দিতে পারো।

১৯৫৭-র ১লা সেপ্টেম্বর, আমরা জমাট বরফের সামনে পৌঁছবার এক ঘণ্টা তেইশ মিনিট পরে নটিলাস জাহাজের দেহটা জলে ডোবার 'আ উ-উ-উ-গ্-উ-উ-ই—আ উ-উ-উ গ্-উ-উ--ই' শব্দে সাড়া দিয়ে জলের তলায় মাথা ডোবালো।

আমার খুব ইচ্ছে করছিল, লা কেলীকে জলের নীচের টেলিফোনে একটা মাথা বিগড়ে দেওয়ার মতো বার্তায় ঘাবড়ে দিই—কিন্তু সামলে নিলাম লোভটা। এই মেরু অঞ্চলে আর আমাদের এই নটিলাসে এত অল্পে ইতিহাস সৃষ্টি হয়, যে, রসিকতা করতে ভরসা হল না। এখানকার বরফের গভীরতা জানা নেই, কাজেই আমরা একেবারে কয়েক-শ' গজ নীচে নেমে ধীরে ধীরে চলতে লাগলাম। দেখা গেল আমরা স্বচ্ছন্দে বরফের তলা থেকে অনেকটা দূরত্ব বজায় রেখে চলছি। জাহাজী মেসের লোকের নিয়ম মাফিক আরামে খানা খাচ্ছে। ওদিক থেকে সুর ভেসে আসছে গানের, প্যাট্ বুনের 'বালুবেলায় প্রেমপত্র' গানের সুর,—আমাদের 'জুক-বক্সে' যে শ-খানেক রেকর্ড আছে তারই একটি বাজানো হচ্ছে।

এই হ'ল মেরু অভিযানের যথাযোগ্য পরিবেশ! ভাবতে বেশ লাগছে আমার। এমনি ক'রেই আমরা এই পথটা পেরিয়ে যাবো।

॥ আট ॥

আমরা ডুবেছি। অজানা রহস্যের মধ্যে ডুব দিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলেছি। গভীর থেকে গভীরতর দরিয়ার বুকে আমরা প্রবেশ করছি। ড়ঃ লয়েনের বিচিত্রক্রিয় 'সোনার' যন্ত্রের মাধ্যমে মাথার ওপরের বরফরাজির একটা নির্ভরযোগ্য ধারণা আমরা পাচ্ছি। অন্ততঃ সেই বিশ্বাসে আমরা তখনকার মতো নিশ্চিন্ত! মেরু অঞ্চলে বরফচাঁইগুলো অতিকায়, চলেফিরে ঘুরে বেড়ানোই তাদের স্বভাব, তবে তারা প্রত্যেকে প্রকৃতিতে অপরের চেয়ে স্বতন্ত্র। কোথাও বা ছোট ছোট খণ্ডে তারা বিচ্ছিন্ন বিভক্ত, এগুলোকে আমাদের জাহাজীরা 'বি-বি' নামে চিহ্নিত করল। এগুলো অবশ্য যে-কোনো ভাসা-জাহাজই ডিঙিয়ে যেতে পারে। আর যেগুলো বৃহদায়তন, সেগুলো এবড়ো-খেবড়ো অবস্থায় জলের ওপর ভেসে বেড়ায়—এরা দশ-পনের ফিট পর্যন্ত লম্বা হয়। বিরল ক্ষেত্রে তার চেয়েও বড় আকারের চাঁই দেখা যায়। অনেকের ধারণা যে, বরফের তলার দিকটা মসৃণ হয়, কিন্তু এখন স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে অত্যন্ত পরুষতল তারা। অনেক জায়গায় দুটো বরফ-চাঁই-এর মধ্যবর্তী তরল জলরাশির আয়তন কম নয়, এই ব্যবধানের মধ্যে অনায়াসে ডুবো জাহাজ নাক ভাসাতেও পারে—তবে সার হুবার্ট উইলকিন্সের অনুমানসিদ্ধতা এখানকার বাস্তবে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। তিনি কল্পনা ক'রেছিলেন যে, বরফের অংশটা ডুবে ডুবে ডিঙিয়ে গিয়ে খোলা জলে ভেসে ভেসে পার হওয়া চলে। সেকেলে ধরণের ডুবো জাহাজে এত অল্প পরিসর জলে ডোবা বা ওঠা সম্ভবপর নয়।

ডঃ লয়েন-এর বিশেষ যন্ত্রটার দৌলতে আমরা বরফ জগতের তথ্যতাবাস বিস্তর সংগ্রহ করে চলেছি খুঁটিনাটি নানা খবর যেন পর্বত প্রমাণ হয়ে উঠেছে। এতে আমাদের উল্লাসের অবধি নেই। কিন্তু, তখন টের না

পেলেও, পরে জানা গেল যে, লয়েনের যন্ত্রের মাধ্যমে তুষার জগতের ষোলআনা রহস্য আমাদের করতলগত হয়নি—সেটা যন্ত্রের ত্রুটী অথবা আমাদেরই যন্ত্র নির্দেশিত সঙ্কেত চিহ্ন অনুধাবনশক্তির ঘাটতিও হতে পারে।

প্রত্যেক যন্ত্রের দুটো ক'রে নির্দেশক-হাত রয়েছে। তার একটি এমন ভাবে খাটানো যাতে ক'রে আমাদের জাহাজ কতখানি গভীর জল দিয়ে চলছে তার নির্ভুল বা (নির্ভুল ব'লে অনুমিত) হিসেব আমাদের গোচরীভূত হতে পারে। মাঝে মাঝে যখন আমরা খোলা তুষারমুক্ত জল অতিক্রম করতাম তখন যন্ত্রনির্দেশিত গভীরতার হিসেব ভুল কি না সেটা যাচাই ক'রে নিতাম। এই হাতের মতো কলমটির কাজ হল, নিয়ত চলমান একটি কাগজের উপর একটি দাগ কেটে যাওয়া। দ্বিতীয় হাত বা কলমটি, ডঃ লয়েনের আবিষ্কৃত উপরিতল পরিমাপের ফ্যাদোমিটারের সঙ্গে যুক্ত—এর কাজ, বরফের তলার দিকের রেখাচিত্র এঁকে দেওয়া আর সেই সঙ্গে তার ঠিক নিচে অবস্থিত জলভাগের আনুপূর্বিক পরিচয় লিপি এঁকে যাওয়া! অতএব আমরা যেমন—যেমন এগিয়ে চলছি, তেমনি ওই কলম-হাত দুটিও বরফের আকার-আয়তনের এবং তাদের ঘনত্বের মাপ রেখান্বিত ক'রে চলেছে।

তখন একটা তথ্য আমাদের গোচর হয় নি এবং আবার নতুন ক'রে দ্বিতীয় কোনও মেরু অভিযাত্রা সমাপ্ত না-হওয়া পর্যন্ত সে রহস্য অজ্ঞাতই থেকে যাবে, সেটা হ'ল এই:—ডঃ লয়েনের উপরিতল পরিমাপের ফ্যাদোমিটার যন্ত্রের পরিক্রমা-বেগ আনুপাতিক ভাবে নটিলাসের ক্ষিপ্রগতি-বেগের তুলনায় মন্থর। অর্থাৎ আমরা বরফের পূর্ণাঙ্গ চরিত্র চিত্র পাই নি—যন্ত্রের যথোচিত ঊর্ধ্বাবলোকন সমাপ্ত ক'রে নীচে ফিরে সাঙ্কেতিক হিসাব আঁকার আগেই নটিলাস এগিয়ে সরে যাচ্ছে। আমরা যা হিসেব পাচ্ছি সেটা আংশিক তথ্য। অনেক সময় এমন হয়েছে যে, আমাদের ফ্যাদোমিটারের কলমের রেখার হিসেব অনুযায়ী দেখা গেল এক জায়গায় বরফস্তরের গভীরতা পঞ্চাশ ফিট কিম্বা তার চেয়েও বেশি। আমরা সেটাকে স্রেফ ভূতুড়ে হিসেব ব'লে বাতিল ক'রে দিলাম, অথবা 'সোনার'-এর অসঙ্গতিজ্ঞাপক খবর ভেবে উড়িয়ে দিলাম। আসলে সে খবরটা মোটেই ভুল নয়। আমাদের আন্দাজের চেয়ে বরফের চাপের মাত্রা ঢের

বেশিই সেখানে ছিল, সেই ঝুলন্ত খাড়াই বরফের চাপ আমাদের অভিযানের পক্ষে খুব বিপদজনক।

শান্ত, নিথর এই মৌনলোকে জলযাত্রার অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতি আস্তে আস্তে আমাদের অভ্যস্ত হয়ে এল। এক সময়ে আমার মনে হ'ল স্বচক্ষে বরফের চেহারাটা প্রত্যক্ষ করা দরকার। বললাম, ধীরে ধীরে জাহাজকে ওপরের দিকে তোলো। তারপর পেরিস্কোপটা উঠিয়ে দিলাম। এখানে জলের রং একটু ধূসরবর্ণ, মিশ্‌মিশে কালো ত নয়! নইলে বরফের ভেতর দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়া সম্ভব হ'ত না। রোদ যেন গলে' গলে' জলের গায়ে চুঁয়ে পড়ছে। আমাদের জোরালো ফ্লাডলাইটটা অকারণেই উল্টো দিকে মুখ করে রাখা হয়েছে। পেরিস্কোপের মুখটা ওপর দিকে তুলে দিয়ে অণুবীক্ষণে চোখ রেখে বরফের তলদেশের কয়েক ফিটের কাছে নিয়ে গিয়ে দেখলাম—যেন ধূসর মেঘের দল চেয়ে আছে জলের ওপর। দেখতে মজা লাগছে, কিন্তু অবিমিশ্র আনন্দের অনুভূতি তা নয়। বরং সেদিকে তাকালে হাত-পা শিথিল হয়ে আসে, গা ছমছম করে। যেহেতু এই দেখা থেকে বৈজ্ঞানিক কোনো ফল লাভের আশা নেই সে-হেতু স্কোপটা নামিয়ে রেখে, কৌশলে অন্য একটা কিছু করার হুকুম দিয়ে দিলাম এর চেয়ে 'সোনার'-এর মারফতে বরফের তল্লাসী রাখা স্বস্তিকর।

এর কিছুক্ষণ পরেই আমাদের অভিযানের প্রথম পর্যায় শেষ হওয়ার সময় এসে পড়ল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 'সোনারে' একটা বিস্তীর্ণ হিমানীশূন্য খোলা জলের সঙ্কেত পাওয়া গেল। আমাদের কার্যসূচীর মধ্যে ওপর দিকে উঠে চলার কথাও রয়েছে, এবার সেটা পরখ করা যাক। আমাদের জাহাজীরা খাড়াই ওপর দিকে জাহাজকে সরাসরি তুলে ফেলতে পারবে, এ ভরসা রয়েছে।

সোনারের মধ্যে দিয়ে যে ছবিটা আমরা দেখলাম, তাতে এপাশ ওপাশে জায়গা খুব বেশি নেই। আমাদের ওপরে ওঠা কতকটা যেন ছুঁচের ফুটোতে সুতো পরানোর মত। সোনারের দৌলতে আমরা নটিলাসকে ছিদ্রের ঠিক নিচে নিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে, এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি ক'রে উপরে তুলতে লাগলাম। সোনারের ছবির সঙ্গে পেরিস্কোপের ছবি মিলে যেতে লাগল। সবই হিসেব মত চলছে। পেরিস্কোপে

আমার চোখ আঠার মতো সেঁটে রয়েছে—কি জানি, কোন্ মুহূর্তে হয়তো এর ওপরের কাচের আবরণটা ফেটে চৌচির হয়ে জল ঢুকে পড়বে!

এরপর, এক সেকেণ্ডের খণ্ডাংশ কালের মধ্যেই হঠাৎ চমকে উঠলাম, মাথার ওপরে জল নয়, বরফ! সর্বনাশ। পরক্ষণে অনুমান করলাম যে ওটা হয়তো খুব পাতলা একটা বরফের পাত, হয়তো এত পাত্‌লা বলেই সোনারের হিসেবে ধরা পড়ে নি। কিন্তু এখন ত কিছুই করার নেই, নটিলাসকে ওপরে উঠতে দিতেই হবে। আর, আমি স্থির ভাবে বরফের ধাক্কায় পেরিস্কোরটা চুরমার হওয়ার প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করে রইলাম।

কিন্তু হায়, হঠাৎ আমাদের ওপরে ওঠা বন্ধ হয়ে গেল। সারা জাহাজটা যেন ধাক্কা খেয়ে শিউরে উঠল। সেই মুহূর্তে পেরিস্কোপের ভেতরে একরাশ অন্ধকার সব কালো করে দিল। ঘাবড়ে গেলাম। ব্যর্থতার প্রচণ্ড হতাশা সমগ্র সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। আমি চিৎকার করে উঠলাম "ফ্লাড নেগেটিভ্" এতে করে আমাদের কণ্ট্রোলকে ত্বরিতে নিচে নামার নির্দেশ দেওয়ার পূর্বাভাষ সুচিত হল।

হয়তো আমার মনে অতীত ইতিহাসের বিপর্যয়ের ছায়াপাত ঘটেছিল, তার প্রতিফলন আমার চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল। আমার অফিসারেরা উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে কিছু হুকুমের, কোন দুঃসংবাদের অপেক্ষায় ছিল। কি বলব ভেবে না পেয়ে শুধু বললাম-"দু-নম্বর পেরিস্কোপে যা দেখা গেছে তাতে নিচে নামতেই হবে!"

কেন এরকম হ'ল? আর ঠিক যে কি হ'ল, সেটাও সেই মুহূর্তে আমার বুদ্ধিতে ধরা পড়ে নি!

এরপরে ডঃ লয়েনের সঙ্গে আলোচনা ক'রে এই সিদ্ধান্ত হ'ল যে, ঘোলা জলের ওপর ভাসমান কোনো ছোটো বরফ চাঁইএর সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ধাক্কাটা জাহাজের কোমলতম অংশে লেগেছিল। ক্রমশঃ আমার মনে একটা ক্ষীণ আলো দেখা দিল, ভাবলাম, হয়তো ক্ষতিটা সেরকম মারাত্মক হয় নি, আর পেরিস্কোপের কাচটা তো মেরামত ক'রে নেওয়া যায়!

পুরনো একটা প্রবাদ মনে পড়ল, আছাড় খেয়ে পড়বার পরেই ধুলো

ঝেড়ে আবার উঠতে হয়। ডঃ লয়েনকে বললাম, আবার একটা প্রশস্ত খোলা জল পেলে সঙ্কেত করতে হবে।

পুনরায় আমরা ছুঁচে সুতো পরানোর সংকল্প নিয়ে উঠতে লাগলাম। নটিলাসকে ঠিক ফাঁকা জায়গার নীচে পৌঁছতে হবে।

আস্তে আস্তে আমরা ওপরে উঠলাম। কিন্তু যে মুহূর্তে ফাঁকার মুখে এসে এক নম্বর পেরিস্কোপটা তুললাম, দু নম্বরের মতো সেটাও কালো অন্ধকার হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ওপরে ওঠার আশা ছেড়ে দিয়ে জমাট বরফের মুখে ফিরে যাবার হুকুম দিলাম। যেখানে ট্রিগার রয়েছে সেখানেই ফিরে যাচ্ছি। আমরা বেলা দুটোয় জলের নীচে টেলিফোনে ট্রিগারের সঙ্গে যোগ স্থাপন করলাম এবং তার একঘণ্টা পরেই বরফের রাজ্য ছেড়ে আমরা ওপরে উঠলাম। আমাদের লগ্-এ হিসেব পাওয়া যাচ্ছে যে, বরফের নীচে আমরা দেড়শ' মাইল পরিক্রমা করেছি। আমরা একটা রেকর্ড ক'রেছি, কিন্তু আমাদের এমন গৌরবময় জাহাজও তার জীবনে এই প্রথম আহত হয়েছে!

এক পত্তন ওপর-ওপর পরখ ক'রে দেখা গেল যে আমার আশঙ্কা একেবারে বাজে নয়, জাহাজের ক্ষতি খুব সামান্য নয়। দু'নম্বরের পেরিস্কোপটা বরবাদ হয়েছে, ওটা মেরামত করা যাবে না। আর, এক নম্বরেরও অবস্থা সুবিধের নয়, বেঁকে তুব্ড়ে গেছে। অবশ্য নটিলাস উন্নত জাতের আণবিক সাবমেরিন, 'সোনার' অত্যন্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্র; তাতে তুষার রাজ্যের তলা দিয়ে যাত্রার পক্ষে পেরিস্কোপ থাকলে সুবিধে হয়, কিন্তু একেবারে অপরিহার্য নয়। অবশ্য শত্রুর জাহাজকে আক্রমণের বেলায় পেরিস্কোপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্র। 'পাল্টা জবাবে'র সময় ত আমাদের হাতে পেরিস্কোপ থাকা দরকার। এদিকে আগা-পাশতলা মেরামতের জন্য যতটা সময় দরকার তা আমাদের হাতে নেই। অর্থাৎ তার মানে এই যে, এখন বরকের নিচ দিয়ে অভিযানের সংকল্প ভাসিয়ে দিয়ে আমাদের অবিলম্বে ইংলণ্ডে রওনা হতে হবে।

দীর্ঘ দিন ধরে পাগলের মতো উদ্যোগ আয়োজন করে, শেষে এইভাবে বরফ-বিজয় পর্বে ইস্তফা দেওয়ার কথা যেন ভাবাই যায় না। তার চেয়েও বড় কথা, এবং আমার সঙ্গে এই জাহাজের সকল নাবিকেরই মনের মধ্যে

এই আফশোস যে, নটি লাসের ইতিহাসে এটাই হবে প্রথম ব্যর্থতা—কোনো কাজে ব্রতী হয়ে এই প্রথম সে বিফল হবে।

আমি যখন মাথায় হাত দিয়ে এই সব কথা ভাবছি তখন কয়েকজন পাকা কারিগর ওপরে উঠে গিয়ে জাহাজের ক্ষতিটা খতিয়ে দেখতে গেল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই পল্ আর্লি এসে বল্‌ল—"ক্যাপ্টেন! একটু আশা আছে—মানে, এক নম্বর পেরিস্কোপটা চেষ্টা ক'রলে সিধে বানানো যায়। আবার কাজের মতো দাঁড়িয়ে যাবে ওটা।"

তার এই আশ্বাসটুকু আমি সন্দিগ্ধ মনেই গ্রহণ করলাম। কেন না, এই ধরনের মেরামতী কাজ কোনো পেরিস্কোপ সারাই-এর কারখানাতেও সম্ভব ব'লে শুনি নি, এই সমুদ্রের ওপর সাবমেরিনের ব্রীজে দাঁড়িয়ে এ কাজ কি সম্ভব! এদিকে প্রচণ্ড হাওয়ার বেগ, সমুদ্রে তুফান উঠেছে। যাই হোক, চেষ্টায় বাধা দেওয়া ঠিক নয়, এই ভেবেই আমি অনুমতি দিলাম।

এই উত্তাল সমুদ্রের বুকে পেরিস্কোপের উপর কাজ করাটাই এক অভিনব কাহিনী। হাওয়ার প্রচণ্ড গর্জন, এর মধ্যে জন ক্রাউ'ঙ্কিক্, রবার্ট স্কট আর জন ম্যাগভার্ণ ব্রিজের উপর কয়েকটা হাইড্রলিক-জ্যাক লাগালো বেঁকে যাওয়া পেরিস্কোপ আর মাস্তুলের এ্যালুমিনামের মাঝখানে জ্যাকগুলো লাগানো হ'ল তারপর তারা ধীরে ধীরে পাম্প ক'রে পেরিস্কোপের উপর চাপ দিতে শুরু করল। স্টেনলেস ইস্পাতের মজবুত চোঙটার এতটুকু বিনয় নেই, সে যেমন ছিল তেমনিই রইল। এদিকে এই তিন নাছোড়বান্দাও দমল না, ওরা আরও শক্তিশালী প্রতিরোধের অস্ত্র খুঁজতে লাগল। এক ঘণ্টা ধরে চেষ্টা ক'রে ওরা উপযুক্ত হাতিয়ার জোগাড় করে ফেলল।

তারপর ওরা আবার জ্যাকের চাপ দিতে থাকল। এবার কাজ হ'ল। চোঙটা সিধে হতে লাগল। কিন্তু তার পরই বাতাসের গর্জন ধ্বনি ছাপিয়ে একটা অচেনা আওয়াজ পাওয়া গেল। কিসের শব্দ? ওরা পরীক্ষা ক'রে দেখল যে, পেরিস্কোপের চোঙের মাঝখানটা ফেটে গেছে চাপের চোটে'—আর সেই পথ দিয়ে শুকনো নাইট্রোজেন গ্যাস বেরিয়ে আসছে। চোঙের মধ্যে থেকে এই গ্যাস যাতে ক'রে পেরিস্কোপের স্বচ্ছতা অক্ষুন্নতা বজায় রাখে। কাচের সেই স্বচ্ছতাবজায়কারী

নাইট্রোজেন গ্যাস হিস্ হিস্ শব্দে বাতাসে গিয়ে মিশছে। পেরিস্কোপ-কাচের দু-ফিট নিচে চার ইঞ্চি লম্বা এই ছিদ্রটি হয়েছে।

এ খবর কানে যেতে মনে মনে ঠিক করলাম, ওদের আর পণ্ডশ্রম করিয়ে কি হবে! নেমে আসতে বলি—। কিন্তু আর্লি সেটা আন্দাজ ক'রেই বোধহয় আর্জি করল, আর একটু সময় দেওয়া হোক, সে অনুনয় ক'রে বলল—"ক্যাপ্টেন! একবার ঝালাই টালাই ক'রে দেখতে দিন, যদি তাতে কাজ হয়।

আমি ভালো করেই জানি যে, উন্নত ধরনের কারখানাতেও স্টেন্‌লেস্ ইস্পাতের ওপর ঝাল-ধরানো খুব দুঃসাধ্য চুলচেরা হিসেবের কর্ম। টিম-টিমে অল্প তাপে ইস্পাতের গায়ে তরল ঝালকে একটু একটু ক'রে বসানো ত সহজ কথা নয়। এরা পেরিস্কোপের চোঙের ভেতরে পৌঁছতে পারবে না। আর্লি যে এই রকম একটা উদ্ভট সংকল্প করতে পারে তা কে জানতো? এখানে এখন যা শীত তাতে জল জমে' বরফ হয়ে যায়, ত্রিশ-চল্লিশ মাইল বেগের বাতাস ব্রিজের উপর আছড়ে যেন চাবুক মারছে। আর্লির এই মনের জোর দেখে আমি বিস্ময়ে হতবাক! বুঝলাম যে, নটিলাসের জাহাজীদের সংকল্পের শিকড় কতো গভীরে প্রোথিত তা আমার জানা ছিল না। এই মেজাজের শক্ত মাজা আর কোথাও দেখি নি।

স্টেন্‌লেস ইস্পাতের ঝালাই কারিগর বড় কমই দেখা যায়। তবে আমাদের জাহাজে দু'জন রয়েছে—রিচার্ড বিয়ার্ডেন আর জন্ কুরুস। ঠাণ্ডা আর বাতাসের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ওরা কাজের জায়গাটা ত্রিপল দিয়ে ঢেকে নিল। দু-চার মিনিট অন্তরই ওরা কাজ বন্ধ রেখে পরামর্শ ক'রে নিচ্ছে। পরে অবশ্য নটিলাসের লোকেদের স্বভাবসিদ্ধ হাল্কা চালে বিয়ার্ডেন বলেছিল—"আর বল্‌বেন না, আমাদের বিদ্যের দৌড় হামেশা ফুরিয়ে যাচ্ছিল তখন দু'জনের মগজ ঘেঁটে নয়া মতলব এঁটে তিলে তিলে এগিয়েছি।"

সেই প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে বিয়ার্ডেন আর কুরুস মোট বারো ঘণ্টা ব্রিজের ওপর ছিল, তার মধ্যে মাত্র দুটি ঘণ্টা ঝালাই-এর কাজ করতে পেরেছিল। সবচেয়ে তাজ্জব কাণ্ড, ওরা সত্যিই চোঙের ফুটোটা বন্ধ করে সারিয়ে ফেলল—জাহাজের সবাই সাবাস দিল। ওরা কাজ শেষ ক'রে ব্রিজের

ওপর থেকে টল্‌তে টল্‌তে নেমে এল, আমার সঙ্গে দেখা হ'ল 'আক্রমণ কেন্দ্রে।' জীবনে এরকম শীতার্ত মানুষ আমি আর দেখিনি—একদম ফ্যাকাসে নীল হয়ে গেছে ওই দুটি প্রাণী। ডাক্তার ডবিন্‌স ওদের ডাক্তারী এ্যাল্‌কোহল খাইয়ে দিলেন।

পেরিস্কোপটা এখন খাড়াই সোজা হয়ে গেছে, ফুটো নেই। তবু এখনও আমাদের বিপদ ঘোচে নি। ওদিকে শুকনো নাইট্রোজেন বেরিয়ে যাওয়ার ফলে চোঙটা ভিজে বাতাসে ভর্তি হয়ে গেছে। এবং এর পরিণাম ত সকলেরই জানা, এই অবস্থায় আমরা ডুব দিলেই, পেরিস্কোপটা ঘোলাটে থাকবে, কোনো কাজই হবে না তা দিয়ে। এখন চোঙটাকে কোনও উপায়ে একেবারে ফাঁকা করে ফেলতে হবে, তারপর ওতে নতুন নাইট্রোজেন বোঝাই করে দিতে হবে। কিন্তু পেরিস্কোপের চোঙকে শূন্য করব কি উপায়ে ?

নটিলাসের আর এক জাহাজী জিমি ইয়ংব্লাড এগিয়ে এল, তার মগজে সমাধান রয়েছে: 'স্টীম কন্‌ডেন্‌সারের ভ্যাকুয়াম পাম্প থেকে একটা হোস্‌-পাইপ লাগিয়ে সেটা পেরিস্কোপের মধ্যে ঢুকিয়ে সেখানকার বাতাস টেনে নিয়ে ভ্যাকুয়াম করার মতলব দিল জিমি।

এর জন্যে বেশি হাঙ্গামা পোয়াতে হ'ল না। অল্প আয়াসেই পেরিস্কোপ বায়ু শূন্য করা গেল। তারপর নাইট্রোজেন গ্যাস দিয়ে চোঙটা ভর্তি করা হল। এই প্রক্রিয়াটা দু-বার প্রয়োগ করা হ'ল, যাতে আমাদের আর কোনো খুঁত্‌খুঁতে ভাব না থাকে। নাইট্রোজেনের ভাণ্ডারের মুখটা এঁটে নিশ্চিন্ত হলাম। পনের ঘণ্টার মেহনতে আমাদের এক নম্বর পেরিস্কোপটা এখন নতুনের মতো দাঁড়িয়ে গেল।

সমুদ্রের বুকে জাহাজের ওপর এ এক আশ্চর্য মেরামতের কেরামতী, একথা আমি জোর গলায় বলতে পারি।

॥ নয় ॥

যে মুহূর্তে নিশ্চিন্ত হ'লাম, ট্রিগারে লা কেলীর কাছে সুসংবাদটা পাঠিয়ে দিলাম। তাকে জানালাম যে, যথাপূর্ব আমাদের অভিযান চলবে, পরদিন সকাল আটটায় আমরা ডুব দিয়ে বরফের তলায় ঢুকে ৮৩ ডিগ্রি উত্তরে চলতে শুরু করব। তারপর অবশ্য আরও আরও উত্তরে যাবো। তাকে বললাম যে, আমাদের এই যাত্রায় দুই থেকে পাঁচ দিন সময় লাগবে।

কেলী জবাব দিল—"আরও উত্তরে, মানে তোমরা কতদূর যাবে?"

আমার জাহাজের একটি প্রাণীকেও জানাই নি মনের আসল কথা। তবে এখন পেরিস্কোপটা ঠিক হয়ে গেছে। আর একদফা বরফের তলায় চক্কর দিয়ে ও রাজ্যের পরিচয়ও পেয়েছি। জাহাজের গতিবেগ আর দূরত্বের হিসেব কষে দেখেছি যে ৬২০ মাইল যেতে-আসতে আমাদের চার থেকে পাঁচ দিনের বেশী সময় লাগার কথা নয়। অবিশ্যি, যদি কোনো নতুন বিপত্তি না বাধে। তাহলে আমরা উত্তর মেরু ঘুরে আসতে পারি নিঃসন্দেহে। যদি আদৌ সম্ভব হয় তবে আমি যাবোই।

কিন্তু এখবরটা সরকারী ভাবে লা কেলীকে দিতে চাই না। কাজেই একটু মস্করা ক'রে বললাম—"কতদূর উত্তরে যে যেতে পারব তা এখন বলা যায় না। তবে হয়তো সেণ্ট নিক্-এর সঙ্গে কথা কয়ে আসবার মতো কাছাকাছি চলে যেতে পারি।"

আমরা ডুবলাম। গভীর দরিয়ার অনেক নিচ দিয়ে আমরা চলতে শুরু করলাম। এবারের দৌড়ের গতিবেগ প্রথম সফরের চেয়ে অনেক দ্রুত। এবার আর মাথার ওপরের বরফকে আমলই দিচ্ছি না আমরা। আমাদের যন্ত্রপাতিও ভালোভাবে কাজ করছে, জাহাজের খোলের আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর রাখায় সিওং ঝাড়ুটা, রিয়্যাক্টর, পাম্প সব কিছুই

বেশ বহাল তবিয়তে কাজ করছে। ডঃ লয়েনের সোনার যন্ত্রটিও পোষা পাখির মতো চট্‌পট্‌ খবর ধরে' দিচ্ছে, তার দৌলতে আমাদের হাতে যে প্রচুর তথ্য মজুত হচ্ছে তা মেরু-বিশেষজ্ঞদের মাসকয়েক উদ্‌ব্যস্ত করে রাখতে পারবে। নটিলাসের ভেতরের আবহাওয়ার খবরও খুশি হবার মতো, ৭২ ডিগ্রি উত্তাপ, বাতাসে শৈত্যের পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ। মায়, আমার ঘরখানাও এখন বেশ আরামদায়ক গরমের আশ্রয় হয়ে উঠেছে। এর আগে এটা জাহাজের মধ্যে সবচেয়ে কন্‌কনে ঠাণ্ডা থাকত। বৈদ্যুতিক কারিগরদের কল্যাণে আমার ঘরখানায় একটা 'হিটার' বসেছে।

জাহাজের স্বাভাবিক আনন্দময় পরিবেশ ফিরে এসেছে। কাজের সময়টুকু বাদে অবসর কালে একে অপরকে নিয়ে উপভোগ্য টিট্‌কিরি-বোট্‌কেরায় কোথা দিয়ে যে সময় উড়ে যায়! এবারের মস্করার সব-সেরা নমুনাটা থেকে বুঝলাম যে যেখানে বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগ নেই সেখানেও বিচিত্রভাবে মনকে নন্দিত করে সবাই মশ্‌গুল থাকতে পারে। এই মজাদার ব্যাপারের খোরাক হয়েছিল নৌ-বিভাগের হাইড্রোগ্রাফিক অফিসের জন রোপেক। আর মতলব এঁটেছিল চীফ পেটি অফিসারেরা।

রোপেক বরফ-বিশেষজ্ঞ, তার কাজ বরফ সম্পর্কে পূর্বাভাষ দেওয়া। চীফ পেটি অফিসারদের সঙ্গেই সে থাকত। ওরা সবাই তাকে, "বাকসিদ্ধ তুষার ঋষি" ব'লে ডাকতো। সেদিন আগে থেকেই ছোট অফিসাররা মতলব এঁটেছিল যে, রোপেককে জব্দ করবে। বেলা তখন দশটা হবে, অফিসার কোয়ার্টারের সামনে রোপেক ঘুরে বেড়াচ্ছিল, এমনিই। প্রথমে একজন ক্ষুদে অফিসার তার সামনে এসে হাই তুলল, চোখ রগ্‌ড়ালো। তারপর আর একজন এসে আপন মনেই বলল, দেখতে দেখতে রাত ত কম হ'ল না, শুতে যাওয়া যাক। আর একজন এসে সোজা নিজের বাঙ্কে উঠে নাক ডাকাতে শুরু করল। তারা যে-যার শুয়ে পড়ল, রাত হয়ে গেছে। রোপেকের চোখে ঘুমের লেশ মাত্র ছিল না। কিন্তু সে, আর সবারই দেখাদেখি শয্যায় গা ঢেলে দিল। তার সত্যিই ধারণা হয়ে গেছে, সকাল দশটা নয় এখন রাত দশটা। রোপেক ঘুমিয়ে পড়লে, ওরা যে-যার নিজের কাজে চলে গেল। আর রোপেক

সারাদিনটা পড়ে পড়ে ঘুম মেরে সন্ধ্যেবেলা উঠে, সকালের সাজ পোশাক পরে' যখন ওয়ার্ডরুমে হাজির হ'ল তখন আমরা রাতের খাওয়ায় বসতে যাচ্ছি। সেও বসল খেতে। আর যখন দেখল যে খানাটা রাতেরই তখন সে তাজ্জব হয়ে গিয়ে জিগ্যেস করল—"তোমাদের নটিলাসে কি প্রাতরাশেও রাতের খানা খায়!"

সে দিন সন্ধ্যেবেলায় খবর এল, হাসপাতাল কোরের মেজর কীটিং কাগজে 'নোট' লিখছে, সেই খসড়ার কাগজগুলো বোতলবন্দী ক'রে আগুন জ্বালাচ্ছে হরদম। খসড়াগুলো নাকি রুশ ভাষায় লেখা, আর তার অর্থার্থ—'আমি এক মার্কিনী আণবিক সাবমেরিনে বন্দী, আমাকে বাঁচাও।'

আমাদের জাহাজ অপ্রতিহত বেগে উত্তরের ৮৩ ডিগ্রি অক্ষরেখায় পৌঁছে গেলাম। কম্পাসগুলো পরখ ক'রে দেখা গেল যে, চৌম্বক কম্পাসটি পাগলামী জুড়ে দিয়েছে, আর সেকেলে জাইরো কম্পাসের দৌড় ৭০ ডিগ্রি উত্তর পর্যন্ত অতএব সে ত এলোমেলো ভাবে মাথা নাড়বেই। একমাত্র এই নতুন 'মার্ক ১৯' কম্পাসটিই ঠিক মতো কাজ করছে। খতিয়ে দেখলাম, বিপদের আশঙ্কা নেই। কনিং অফিসারকে এগিয়ে চলার হুকুম দিলাম। আমরা নির্বিঘ্নে ৮৪ আর ৮৫ ডিগ্রি পেরিয়ে গেলাম—কম্পাস ঠিক চলছে। এখন মন আশায় উতল, উত্তর মেরু আমাদের হাতের মুঠোয় এসে পড়ল ব'লে। আমরাই সেখানে বরফ রাজ্যের তলা দিয়ে প্রথম মানুষের পদচিহ্ন আঁকবো।

আরও দু'ঘণ্টা কেটেছে। আমরা তখন ৮৬ ডিগ্রির সমান্তরাল ছুঁই-ছুঁই করছি। এমন সময় হঠাৎ জরুরী খবর এল, দুটো জাইরোস্কোপই পাগলা হয়ে গেছে। এতই আচমকা ব্যাপারটা ঘটল যে, প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারি নি। তারপর দেখেশুনে মনে হ'ল উচ্চ অক্ষরেখা এর কারণ নয়, অন্য কোনও কারণে এই অস্বাভাবিক ঘূর্ণন শুরু হয়েছে। আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ধরা পড়ল, কম্পাসে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে। ফিউজে সব বিকল করেছে।

আমার মনের মধ্যে তখন সংকল্পের একটা তীব্র তড়িৎ প্রবাহ চলেছে। এত দূর এগিয়ে, এই প্রচণ্ড চেষ্টার পর কি শেষে একটা ফিউজের কাছে

পরাজয় স্বীকার করতে হবে। না, কিছুতেই তা হতে পারে না। কেউ কি আমাদের ফিরে যাবার জন্যে বলছে?

স্বাভাবিক আবহাওয়ায় যদি কোনো জাইরোকম্পাস অচল হয়ে যায়, তবে তাকে মেরামত ক'রে সচল অবস্থায় আনতে চারটি ঘণ্টা সময় লাগে। আর, এই প্রান্তীয় উত্তর অক্ষরেখায় কখনো কেউ জাইরোকে চালু করবার চেষ্টা করে নি ত, কাজেই এখানে কতো সময় লাগবে তা আমাদের কল্পনার বাইরে। অতএব আমরা বৈদ্যুতিক শক্তি পুনঃস্থাপিত ক'রে ঠাণ্ডা মাথায় অপেক্ষা করতে থাকলাম। দেখি কতক্ষণে কম্পাসের কাঁটা ঠিক পথে আসে। এদিকে আর একটা রাস্তা বার করার মতলবও ফাঁদা হ'ল, মান্ধাতার আমলের চৌম্বক কম্পাসকে কানামামার আসনে বসানো হ'ল। চৌম্বক কম্পাসটা ধীরে ধীরে ষাট ডিগ্রির চক্রে ঘুরছে।

একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে ভয়ে হতাশ হবার মতো অবস্থা এখনো আসে নি, কিন্তু অবস্থাটা রীতিমত ঘোরালো বই কি। লেঃ কেন্ কার এই পরিস্থিতি সম্পর্কে চমৎকার বর্ণনা দিয়েছে—"আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল। একজন লোক একটা গুহার ভেতরে ঢুকল, আবিষ্কারের মতলবে। তার মগজ খুব সাফ। সে করল কি, গুহার মুখে একটা জায়গায় সুতো বেঁধে রাখল, আর নিজের হাতে সেই সুতোর মূল কাটিমটা রাখল—সুতো ছাড়তে ছাড়তে চলে গেল ভেতরে। এখানে ওখানে, এধারে ওধারে চলাফেরা করা যাবে নির্ভাবনায়, তারপর যখন দরকার হবে সুতো গুটোতে গুটোতে আবার গুহার মুখে ফিরে আসতে পারবে সে। আপন মনে এগিয়েই চলেছে সে, কোন্ সময়ে সুতোটা ছিঁড়ে গেছে টের পায় নি। হঠাৎ তার এক সময়ে খেয়াল হ'ল সুতো ছিঁড়ে গেছে! আমাদেরও সেই দশা!'

জাইরোকম্পাসটা এখন সবে কাজ করতে শুরু করেছে, এই অবস্থায় যদি চট্ করে মোড় ঘোরা হয় বা বাঁক নেওয়া হয় তাতে হয়তো এটা আবার বিগড়ে যাবে, এই আশঙ্কায় আমরা সরাসরি উত্তরেই চলতে লাগলাম। এর আগে আমাদের জাহাজ সাবধানে চলছিল, এখন অতি সন্তর্পণে চলছে। এখন সামান্য সাধারণ ভুল হলে তার পরিণাম যে কি সাংঘাতিক হবে তা কে বলতে পারে। দ্রাঘিমা রেখা যেখানে এসে মিশছে

সেই অক্ষাংশে হিসেবে ভুল হওয়া মানে দিকভ্রম হয়ে দ্রাঘিমাচক্রে পড়া খুবই স্বাভাবিক। তার ফলে আমরা ভুল দরিয়ায় গিয়ে পড়তে পারি, তার চেয়েও মারাত্মক হবে যদি বরফবেষ্টিত তীরভূমিতে গিয়ে পড়ি। এদিকে জাহাজীদের হাসিঠাট্টার কামাই নেই, তারা কেউ বা আলাস্কার স্বাধীনতা নিয়ে তামাশা করছে, কখনও বা মুরমান্স্কের কথাও এসে পড়ছে।

আমরা উত্তর ৮৭ ডিগ্রি অতিক্রম করার কিছু পরেই, তখন উত্তর মেরু আর ১৮০ মাইল বাকী রয়েছে—আমি জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে নিতে বললাম। ফিরতে হবে। আমাদের এ যাত্রায় উত্তর মেরু স্পর্শ করা হ'ল না, এর জন্যে মনে গভীর ক্ষোভ রইল। কিন্তু ভেবে দেখলাম, আর এগোলে হয়ত জাহাজ এবং জাহাজীদের বিপদের মুখে এগিয়ে দেওয়া হবে। কাজ কি সেই পথে এদের ঠেলে দিয়ে?

জাহাজের মুখটা ঘুরে যাবার পর জাহাজীদের মধ্যে আপোষে ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। মেরুর নিকটতম দূরত্বে কে পৌঁছেছিল এই নিয়ে লড়াই। লেঃ ফ্র্যাঙ্ক ওয়াডসবার্থ জাহাজের মুখ ঘোরবার সময় চট ক'রে টর্পেডোরুমে এগিয়ে গিয়েছিল,—সে বলল, আমি। যখন সে সম্মানটা আদায় করে নিয়েছে তখন হালের লোকেরা বাগড়া দিল, বলল—আমরাই সবচেয়ে এগিয়ে ছিলাম। ওয়াডসবার্থের দাবিটা নাকচ হ'ল, হালের লোকেরা বাজীমাৎ করে করে তখন একজন লোক শিস দিয়ে বলল, সে জাহাজের সামনে বসে ছিল অতএব জাহাজ ঘোরার মুখে সেই উত্তরমেরুর সবচেয়ে কাছে পৌঁছেছে। শেষে তা-ই সাব্যস্ত হ'ল। অবিশ্যি সমস্যাটা এত ঘোরালো হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, আমাকেই রায় দিয়ে মীমাংসা করতে হ'ল।

তামাম দুনিয়ার তাবৎ জাহাজীদের মধ্যে বোধ করি লেঃ বিল্ লালর আর তার সাগরেদ্রাই চরম দুর্বিপাকের ধকল পুইয়েছে, তাদের খাটুনীর অন্ত ছিল না, তাদের জান্ কবুল সংকল্পের তুলনা মেলে না—তবেই না আমরা নটিলাসে চড়ে জমাট বরফের দক্ষিণাবর্তে উত্তীর্ণ হতে পেরেছি।

শুধু মেহনৎই নয়, পথের পরিকল্পনাও তারাই নির্ণয় করেছে। আমাদের অভিনব যন্ত্র 'মার্ক ১৯'-এর সাত ঘণ্টা সময় লেগে গেল শরীফ মেজাজে আসতে। সেই সময়টা আমরা চৌম্বক কম্পাসের ওপরেই পুরোপুরি ভরসা

ক'রে জাহাজ চালিয়েছি—মনে মনে এই আশ্বাস ছিল যে, আর যা-ই হোক কম্পাসটা 'বেলোয়ারী চালে পায়চারী করছে না' তার সামর্থ্যানুযায়ী চলছে এবং এইভাবেই সে আমাদের মেরুচক্রের নিশানা দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

ওস্তাদ কম্পাসটা যখন স্বাভাবিক অবস্থায় এল তখনও আমরা তার ওপর ষোল আনা নির্ভর করি নি—ভেবেছি, কি জানি কাঁটাটা হয়তো নিভুর্ল নিয়মে চলছে না। কিছুটা আশপাশের ছেঁদো খবরের ওপর আর বাকীটুকু ওই চৌম্বক কম্পাসের প্রদর্শিত অঙ্কের আনুপাতিক হিসেব এবং অনুমানের উপর ভরসা ক'রেই আমাদের জাহাজের দিক্‌দর্শনগতি চালিত ক'রে চলেছি। যারা জাহাজ চালাচ্ছে, যারা কম্পাসে কাজ করছে তাদের চোখে ঘুম নেই, বিশ্রামের ফুরসৎ নেই। কপাল ভালো যে, জাহাজের আর সব যন্ত্রপাতি ঠিকঠাক কাজ করছে, কোনো ঝামেলা নেই তাদের নিয়ে। একটা নতুন তথ্য পেলাম, ঠাণ্ডাজলে রিয়্যাক্টরের কাজ ভালো হয়, গতিবেগ অনেক বেড়ে যায় জাহাজের। কাজেই এদিকের গতিবেগের দুর্ভাবনা থেকে মুক্তি পেয়ে, নাব্যতার সমস্যা নিয়ে চিন্তার সুযোগ পেলাম।

এবার আমাদের সত্যিই চরম দুর্বিপাক! হঠাৎ এক সময় টের পেলাম যে, দ্রাঘিমা-চক্রের আলেয়ায় আমরা দিকভ্রান্ত হয়েছি। প্রতিটি মুহূর্ত আতঙ্কে, অস্বস্তিতে কাটছে! এর পর ধীরে ধীরে গ্রীণল্যাণ্ড সমুদ্রের খোলা জলের আভাস পেলাম! তারপরই হঠাৎ আমরা অগভীর জলে গিয়ে পড়লাম। আর সেই সঙ্গে বরফের ঘনত্বও বেড়ে গেছে, এতটা ঘন বরফ অকল্পনীয়। জলের শৈত্যও খুব বেশি। চট্‌পট আমাদের পারিপার্শ্বিকের হিসেব খতিয়ে দেখা গেল যে, আমরা বরফ-ঘেরা উত্তর গ্রীণল্যাণ্ডের উপকূলের কাছাকাছি এসে পড়েছি। আর একটু এগোলেই মহাবিপর্যয় অবধারিত। সঙ্গে সঙ্গে ৯০ ডিগ্রী বাঁয়ে জাহাজ ঘোরাতে হুকুম দিলাম।

আমরা আবার যখন গভীর জলে পৌঁছলাম তখন যেন একটা যুগ কেটে গেছে মনে হ'ল।

এর একদিন পরে বরফরাজ্যের শেষ স্তর অতিক্রম করলাম আমরা। হিসেব ক'রে দেখলাম যে আমরা বরফের নিচে চুয়াত্তর ঘণ্টা কাটিয়েছি,

এই সময়ে এক হাজার মাইলেরও বেশি দরিয়ায় সফর করেছি। এই অভিযানে ডঃ লয়েনের যন্ত্রপাতিতে যে-সব খবরাখবর সংগ্রহ করেছে তার সংখ্যা দশ-বিশ হাজারের ওপর, আর সমুদ্রতলের ধ্বনি সংগ্রহের পরিমাণ লাখের কাছাকাছি।

আমরা উত্তর মেরু পৌঁছতে পারি নি, আমাদের আশা পূর্ণ হয় নি। কিন্তু এই নৌ-অভিযানের দৌলতে যে-সব মূল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহ হয়েছে, অক্ষরেখার সম্বন্ধে আমাদের এই অর্জিত অভিজ্ঞতার দামও কম নয়। এরপর যারা এই বরফ-সফরে ব্রতী হবে, তাদের কাজে আসবে আমাদের এই অভিজ্ঞতালব্ধ ফল। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে আর কোন আণবিক শক্তিচালিত ডুবো জাহাজ সত্যিই উত্তর মেরুতে মানুষের স্পর্শ রেখে আসতে পারবে। অবশ্য আমরা একটা নতুন রেকর্ড করেছি—ফার্মি আর সেডভ্ বরফের তলা দিয়ে যতদূর এগোতে পেরেছিলেন, আমরা সেই সীমা ছাড়িয়ে উত্তরে আরও বহুদূরে গিয়েছিলাম। আজ পর্যন্ত স্বেচ্ছা শক্তিতে আর কোনও জাহাজ এতদূরে পৌঁছতে পারে নি।

আমরা ট্রিগারের সঙ্গে যোগ স্থাপন করলাম। তারপর পুরো একটা দিন হাত-পা ছড়িয়ে জিরিয়ে থিতিয়ে নিলাম। সেই অবসরে ট্রিগার বরফের তলায় ষাট মাইল ঘুরে এল—পুরনো আমলের ডুবো জাহাজের পক্ষে এটা কম কৃতিত্ব নয়। একদিন বিশ্রামের পর আমরা তৃতীয়বার এবং শেষবারের মতো বরফের তলায় নামলাম। এবার যেমন খুশি তেমনি ঘোরা, কখনো চক্রাকারে ঘুরছি, কখনো বা চৌকো ভাবে চক্কর দিচ্ছি, এগোচ্ছি পিছোচ্ছি,—আর ডঃ লয়েন অনবরত তথ্য সংগ্রহ ক'রে চলেছেন।

এমনি ক'রে দিনের অর্ধেকটা কেটে যাবার পর আমরা একটা খোলা জলের সন্ধান পেয়ে, ওপরে ওঠার মতলব করলাম। এদিকে ঝড়ের ধকল ঝিমিয়ে গেছে। বরফের নীচে ধীরে ধীরে নটিলাসকে এনে ফেলা হ'ল, তারপর একটু একটু করে ওপরে উঠলাম। অল্প সময়ের মধ্যেই পেরিস্কোপটা জল ঠেলে মাথা উঁচু করে ফেলল। তারপর আমার চোখের সামনে যে দৃশ্যটা জেগে উঠল সেটা সাধারণ ভূ-পৃষ্ঠে

থেকে দেখার সামিল। চারিদিকে এবড়ো-খেবড়ো ভাঙা ভাঙা বরফের বিস্তার। যেদিকেই তাকাই দিগন্তস্পর্শী বরফ আর বরফ ধু-ধু করছে বরফ।

বরফবেষ্টিত এই জলখণ্ডের পরিধি খুব অল্পায়তন—কোনো রকমে আমাদের জাহাজটুকু তাতে ধরে। যদিও আমাদের চারপাশে ইতস্তত বরফ ভেসে বেড়াচ্ছে, আমরা তা গ্রাহ্যও করছি না। কেন না, তারা যদি আমাদের ঘেরাও করে তাহলে আমরা টুপ্ ক'রে জলের তলায় নেমে যাবো। এমনিতে বরফের চাপে আমাদের সাবমেরিনের খোল ভাঙতে পারে না। ওদিক ডঃ লয়েন আর তাঁর সহকারী সমুদ্র-তলের নমুনা সঞ্চয় করতে ব্যস্ত। আমি চট্ ক'রে জন ক্রাউজিগ্‌কে একটা রবারের নৌকোয় ক'রে নিচে নামিয়ে দিলাম ফটো তোলবার জন্য—ক্রাউজিগ্ হ'ল আমাদের নটিলাসের সরকারী ফটোগ্রাফার। জাহাজীদের মধ্যে অনেকেই নৌকো বাইতে এগিয়ে এসেছে। এই সময়ে আমার মনে দৃঢ় প্রতীতি হ'ল যে, আমাদের এই নাবিকদলের যা দক্ষতা আর মানসিক গঠন, আর আমাদের যা হাতিয়ার রয়েছে তা দিয়ে আমরা যে কোনও প্রতিরোধকে আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে উড়িয়ে দিতে পারি।

একথা সত্যি যে, নটিলাস নৌযুদ্ধের একটা অভিনব নূতন অধ্যায় রচনার উদ্বোধন করেছে। আমাদের এই জলযাত্রা সামরিক পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণ করল যে, আনবিক শক্তি চালিত জাহাজ এই বিজন লোকেও নিরাপদে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে যেতে পারে—এখানে আমরা অদ্বিতীয়, যতদিন পর্যন্ত সোভিয়েট ইউনিয়ন অনুরূপ আনবিক জাহাজ তৈরী ক'রে বিরুদ্ধ শক্তি সৃষ্টি করতে পারছে, ততদিন আমরা সম্পূর্ণ অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে থাকবো।

আমাদের নৌবহরে যুগান্তর রচনায় সহায়ক চারখানি আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত আনবিক ডুবোজাহাজ তৈরী হয়েছে: এ্যাডমিরাল রিকোভারের ভাষায় এগুলি "জলমগ্ন উপগ্রহ"। যদি রাশিয়া আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আসে তাহলে এরা দুর্ধর্ষ আক্রমণে তাদের বিপর্যস্ত করে দিতে পারবে। রিকোভার বলেন যে, এরা মেরু সমুদ্রে লড়তে পারে, বরফের তলাতে গিয়েও এদের লড়াই করার হিম্মত রয়েছে। মেরু-মানচিত্রের দিকে চোখ

রাখলে আজ এই কথাই মনে হয় যে, এই বন্ধুর, বিরুদ্ধ সমুদ্রের বুকে আমাদের এই বহুদূর পাল্লার আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে আমরা বিরাট সাঁজোয়া মহড়ায় বিজয়ী হতে পারব অক্লেশে।

সোভিয়েট এলাকার অধিকাংশ অঞ্চলকেই ১৫০০ মাইল পাল্লার আগ্নেয়াস্ত্রের নাগালেই পাওয়া যায়। বরফের এলাকার মধ্যে থেকে সরাসরি আক্রমণ চালানো যায়—এই আমাদের মতো জাহাজের পক্ষে সেটা আয়ত্তগত। রিকোভার বলেন যে, "যেহেতু এই জাহাজগুলো বরফের নীচে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে এবং সোনার দিয়েও এদের অবস্থান নির্ণয় করা যায় না সেহেতু এই আনবিক ডুবোজাহাজের হদিস করা শত্রুর পক্ষে খুব দুঃসাধ্য ব্যাপার। সন্ধানী রাডারও এই আনবিক আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগকারী ডুবো জাহাজের পাত্তা পাবে না। ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতে বিরাট প্রান্তরে একটি কালো বেড়ালকে খুঁজে বার করা "এর চেয়ে সহজ কাজ।" এই সফরে আমার কাছে এই তথ্যটা পরিষ্কার ধরা পড়েছে যে, এখানে সাধারণ ভাসা জাহাজের ঢোকা সম্ভব নয়, পথ নেই। বরফের রাজ্য এই মেরুঅঞ্চল, আনবিক শক্তির ডুবো জাহাজ বরফের আড়ালে থেকে অস্ত্র হানলেও তাকে আক্রমণ করার উপায় শত্রুর নেই। যদি বা সে এই জাহাজের অবস্থানের সন্ধান পেয়ে ওপর থেকে বোমা ফ্যালে তাহলে সেগুলো ওপরের বরফের আস্তরণে ব্যাহত হবে—বরফের বর্মে আমরা সুরক্ষিত। কাজেই আমাদের এই অভিযান সামরিক গুরুত্বের দিক দিয়েও মূল্যবান, নূতন পথ আমরা দেখতে পেয়েছি, দেখতে পেরেছি।

দুনিয়ার এই নির্জন, বরফ-ঘেরা, ষোলআনা নিজস্ব হ্রদে আমরা ঘণ্টা দুই জললীলা সমাপন ক'রে আবার সলিল অতলে ডুব দিলাম। দুদিনে দুশো মাইল চক্কর মেরে বরফের কিনারায় ভিড়লাম। খবরটা ট্রিগারকে দেওয়া হ'ল।

এরপর ডুবো পথে ইংলণ্ডে পাড়ি জমালাম।

মেরু তুষারের তলদেশ দিয়ে পরিক্রমার প্রথম পরিকল্পনার অধিনায়ক জুলে ভার্ণে, তাঁর উপকথার সেই ডুবোজাহাজের নামও ছিল নটিলাস। কতকাল পরে সত্যিকার নটিলাস, ভার্ণের স্বপ্ন কল্পনাকে বাস্তবে সার্থক

ক'রে তুলল—এও ত একজন মানুষেরই সৃষ্টি, সেই মহাশক্তিময় দূরদৃষ্টি আর কল্পনার জনক হ'লেন এ্যাডমিরাল রিকোভার। ক্রমশঃ আমরা অপেক্ষাকৃত উষ্ণজলের মধ্য দিয়ে চলতে শুরু করলাম। এই সময়ে মনে হচ্ছিল, এই নটিলাসের নাবিক আমরা, আমরাই ত মানুষের জ্ঞান-গোচর করেছি মেরুসমুদ্রের সম্পর্কে নূতন তথ্য—জ্ঞানের ভাণ্ডারে আমাদের বৈজ্ঞানিক অভিযানের অবদান সামান্য নয়! কিন্তু এসব নিয়ে ত মৌজ ক'রে কাটাবার ফুরসৎ নেই। আমাদের এখন তৈরী হতে হবে—আমাদের সামনে 'পাল্টা জবাবে'র গুরু দায়িত্ব পড়ে রয়েছে। আমরা চলেছি যুদ্ধের দিকে এগিয়ে।

ইংলণ্ডের দিকে এগোতে এগোতে কতকটা কাকতালীয়ভাবেই নটিলাস, আর একটা স্বপ্নকে বাস্তবে সার্থক করে তুলল—জুলে ভার্ণের আরও একটি স্বপ্ন সত্য হয়ে উঠল। মেরুচক্রের ঠিক দক্ষিণে নটিলাসের ডুবপথের সফর ৬০০০০ মাইল পূর্ণ হল। লোকপ্রবাদের হিসেব মতো তিন মাইলে এক লীগ হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, মাত্র একবার রসদ-খোরাক নিয়ে আমাদের জাহাজ "সমুদ্রের তলা দিয়ে ২০,০০০ লীগ অতিক্রম" করেছে।

॥ দশ ॥

পাল্টা জবাবের সময়ে, এবং তারপর বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শনী মহড়াতে, ব্রিটিশ সাব্‌মেরিন প্রতিরোধ বাহিনীর বাছাই করা বহরের সমক্ষে নটিলাস অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিল। নটিলাসের নৈপুণ্যে ব্রিটিশ নৌবিভাগ মুগ্ধ হ'ল, তার শক্তির বহরে অভিভূত হ'ল। নটিলাসের দক্ষতার প্রভাব তাদের মনে এমন রেখাপাত করল যে, ভবিষ্যৎ ব্রিটিশ নৌবাহিনীকে আণবিক শক্তি-কেন্দ্রিক করার সংকল্পও গৃহীত হল। সেই ছাঁচেই নির্মীয়মান ড্রেড্‌নটকে গড়া হচ্ছে। ব্রিটেন আর যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এক আণবিক চুক্তি অনুসারে সম্পূর্ণ শক্তিজনিত্রের পরিকল্পনা আর গঠনের কাজ যুক্তরাষ্ট্রই সম্পাদন করবে।

অক্টোবরের শেষের দিকে আমরা পশ্চিমে ফিরলাম এবং মাস পেরোবার আগেই দেশে ফিরলাম—নিউ লণ্ডনে।

এর অল্পদিনের মধ্যেই আমাকে উড়ে চলে আসতে হ'ল ওয়াশিংটনে, নৌবহরের প্রধান সেনাপতির কাছে মেরু অভিযান এবং পাল্টা-জবাবের বিবরণ দাখিল করবার জন্যে। অবশ্য এর আগেই আমি সরকারী কেতায় বরফরাজ্যে অভিযানের বৈজ্ঞানিক প্রতিবেদন পেশ করেছি—তাতে একথাও উল্লেখ করেছি যে, ওই অঞ্চলে আরও কাজ হওয়া দরকার। যদিও স্পষ্ট ক'রে উত্তর মেরুর উল্লেখ আমি করি নি, তবে আমার বিশ্বাস যে, নৌ-দক্ষতার অধুনাতম যন্ত্রপাতির দৌলতে এবং উন্নততর কম্পাস ব্যবস্থার নিরাপত্তায় সজ্জিত হ'লে আণবিক সাবমেরিন অনায়াসে উত্তর মেরুতে পৌঁছতে পারে।

পেন্টাগন থেকে বেরিয়ে এলাম তখন বেলা পড়ে গেছে, অন্ধকার হয়ে এসেছে। মনটা ভার ভার। কেন না, আমি এতক্ষণ যাদের কাছে

নটিলাসের অভিযানের বিবরণ দিয়েছি, বেশ বুঝতে পারছি যে, তাদের মনে আমার এই কাহিনী তেমন রেখাপাত করে নি। আমি ব্যর্থ হয়েছি! আমাদের এই প্রচণ্ড মেহনত আর বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করার কোনো মর্যাদাই তাদের কাছে নেই! আমি যখন শান্ত মন্থর গতিতে ম্যলের মুখে নামছি তখন হঠাৎ ক্যাপ্টেন পিটার অরাওের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। অরাও হচ্ছেন প্রেসিডেণ্টের নৌ-সহকারী। ছ'মাস আগে তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিল। আমরা দু'জনে অভিবাদন বিনিময় করলাম। তারপর তিনি আমায় শহরে পৌঁছে দিতে চাইলেন। হোয়াইট হাউসের কাছাকাছি এসে তিনি আমায় নটিলাসের খোঁজ খবর জিজ্ঞাসা করাতে আমি অল্প কথায় আমাদের তুষারভেদী অভিযানের কথা বললাম। আমরা উত্তর মেরুর পৌনে দুশো মাইলের মধ্যে যেতে পেরেছি শুনে তিনি খুব কৌতূহলী হয়ে উঠলেন এবং বিদায় নেবার সময় অনুরোধ করলেন—'যদি কাল আমার আপিসে হোয়াইট্ হাউসে আসেন ত খুব ভালো হয়। পারবেন কি আসতে?' আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলাম।

পরদিন অরাওকে আমাদের অভিযানের আদ্যপান্ত কাহিনী শোনালাম। এই মানুষটা নটিলাসের আশ্চর্য কীর্তির গুরুত্ব সত্যিই হৃদয়ঙ্গম করল। যে সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক এবং যন্ত্রকৌশলের অগ্রগতি একান্তভাবে প্রয়োজন সেই মাহেন্দ্রক্ষণে আমাদের এই কর্মকুশলতা যেন তাঁকে আরও অভিভূত করেছে। যখন মাথার ওপরে স্পুট্নিক আস্ফালন করছে, যার ওপর রাশিয়ার বিজয়-বৈজয়ন্তীর প্রচারমহিমায় প্রোজ্জ্বল, সেই অবস্থায় আমাদের প্রগতির পরিচয় জরুরী নয় কি! হয়তো সেই ভাবনায় দ্যোতিত হয়েই অরাও আমাকে প্রশ্ন করলেন।

"আপনি কি মনে করেন যে নটিলাস ডুবো পথে সারা পৃথিবীটা প্রদক্ষিণ করতে পারে?"

"এটার জন্যে কেবল সময় আর আণবিক শক্তির খোরাক দরকার, এগুলো পেলেই, সম্ভব।"

তারপরই আমাদের নজর গিয়ে পড়ল অরাওের আপিসের দেয়ালে টাঙানো পৃথিবীর মানচিত্রের উপর। আর যতক্ষণ সেখানে ছিলাম আমার দেহটা চেয়ারের সামনের দিকে উদগ্রীব হয়ে ঝুঁকেই ছিল। আলোচনায়

আমি মেতে উঠেছিলাম। সামনের চার্টের ওপর চোখ রেখে ছুনিয়ার সকল দরিয়ার তলা দিয়ে পরিক্রমার আলোচনা চলল দীর্ঘক্ষণ। এরমধ্যে আবার ঘুরে এল মেরুসমুদ্রের বরফরাজ্যের প্রসঙ্গ, এল উত্তর মেরু স্পর্শ করার বাকী কাজটুকু সেরে ফেলার আশু প্রয়োজনের কথা। পৃথিবী পরিক্রমা করতে হ'লে ত উত্তর মেরুকে বাদ দিয়ে ভাবা যায় না।

সত্যি কথা বলতে কি, আলোচনার গোড়াতে যখন ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে পরিক্রমার কথা হচ্ছিল তখন আমি অন্য কথা ভাবছিলাম—আমার ধারণা ছিল যে, আজ থেকে ছু-তিন বছর পরে কি করা হতে পারে সেই কথাই হচ্ছে। ১৯৫৭-র অভিযানের প্রতিবেদনে আমি উল্লেখ করেছিলাম যে, "হিসেব ক'রে, ধীরে ধীরে" মেরু-পরিক্রমার সংকল্পে অগ্রসর হতে হবে। কেন না, ১৯৫৭-র এই অভিযানের বিপদ এবং এ সম্পর্কে কোনো কোনো মহলে যে নিরুৎসাহের মনোভাব দেখেছি, তাতে ভাবতেই পারি নি যে এইভাবে অকস্মাৎ সরকারী সহায়তা আসতে পারে। একেবারে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আটলান্টিক সমুদ্র অতিক্রমের প্রস্তাব! হোয়াইট হাউসের কল্পনার দৌড় আর উৎসাহের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না ত!

অরাশু আমাকে সাবধান করে দিলেন, মন্ত্রগুপ্তীই হ'ল আসল কথা। তারপর বললেন যে, সপ্তাহ খানেক পরে একদিন হোয়াইট হাউসের লোকদের কাছে ১৯৫৭-র অভিযান সম্পর্কে আলোচনা করা কি আমার পক্ষে সম্ভব?

আমি ঘাড় কাৎ করে জবাব দিলাম—"আপনি যা বলবেন, এর ওপর আর কোনো কথা থাকতে পারে না।"

ফিরে এলাম নিউ লণ্ডনে আমার জাহাজে। হোয়াইট হাউসের প্রসঙ্গে ঠোঁট ফাঁক করিনি কারও কাছে। পরের সপ্তাহে আবার ওয়াশিংটনে ঘুরে এলাম। হোয়াইট হাউসের কর্মচারীদের মধ্যে জনাত্রিশেক সদস্য আমার অভিজ্ঞতা শোনবার জন্য সেদিনের বৈঠকে এসেছিলেন—এঁদের মধ্যে শেরমান এ্যাডাম্‌স এবং জেম্‌স হেগার্টি'ও ছিলেন।

এর আগে অরাশু যে প্রশ্নটি করেছিলেন হেগার্টি'ও আমাকে আজ সেই একই কথা জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনার এই জাহাজ নিয়ে পৃথিবী পরিক্রমা করতে পারেন?"

এ জিজ্ঞাসা শুধু তাঁরই নয়, আমি জানি, অনেকেরই মনে উঠেছে। আমিও একই জবাব দিলাম—"তা পারি বই কি, কেবল চাই প্রচুর সময় আর জাহাজের পর্যাপ্ত আণবিক রসদ।

হেগার্টি মাথা দোলালেন, তারপর পায়চারী করতে লাগলেন—গভীর চিন্তায় ডুবে গেছেন তিনি। আমার কাছ থেকে হাত চারেক দূর থেকে হঠাৎ ঘুরে এলেন। তাঁর চোখে-মুখে খুশি উপ্‌চে পড়ছে। হেসে বললেন—"ধন্যবাদ—অশেষ ধন্যবাদ।"

অধিবেশনের বৈঠক থেকে যখন উঠলাম তখন আমার মনটা খুশিতে ঝলমল। যদিচ সরকারী ভাবে কিম্বা পরোক্ষ আভাসে বিশেষ কিছুই প্রকাশ করা হয় নি তবু আমার বিশ্বাস যে, নটিলাসের মেরু-দরিয়ায় অভিযানকে হোয়াইট হাউস আর পাঁচটা সাধারণ ব্যাপারের গড় হিসেবে দেখছে না, বিশেষ তাৎপর্যের উদ্রেক করেছে নটিলাস! হোয়াইট হাউসের নেক নজরে পড়ার গুরুত্ব কম নয়। সেখান থেকে বেরিয়ে অরাণ্ডকে তাঁর আপিসে পৌঁছে দিলাম : অরাণ্ড আমাকে চট করে ছাড়লেন না, আবার সম্ভাব্য মেরু অভিযানের কথা উঠল। পৃথিবী প্রদক্ষিণের পক্ষে যে-পথই ধরা হোক না কেন, প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আটলান্টিক সমুদ্রে পড়বার সব চেয়ে সুবিধাজনক রাস্তা হচ্ছে বরফের তলা দিয়ে উত্তরমেরু ডিঙিয়ে যাওয়া, এ সম্পর্কে আমরা দুজনেই একমত। বহু শতাব্দীর স্বপ্ন হয়ে থাকা উত্তর পশ্চিমের লক্ষ্য পথটা বাস্তবে উদ্‌ঘাটিত হবে!

হোয়াইট হাউস ছাড়বার আগে অরাণ্ড আবার আমাকে সাবধান করে দিলেন, খবরদার এখানে আসার কথা যেন কেউ না জানে, আগামী মেরু অতিক্রমের সম্পর্কেও যেন কোনো কথা কেউ টের না পায়।

নিউ লণ্ডনে ফিরে এসে আমি পেণ্টাগনে একখানা চিঠি লিখলাম। চিঠির বক্তব্য হল এই যে, আগামী ১৯৫৮তে নটিলাসকে দ্বিতীয় বার মেরু অভিযানে পাঠানো হোক।···মনে মনে ভরসা আছে হোয়াইট হাউসের সমর্থন পাবো। হোয়াইট হাউসের অনুমোদন পেলেই, সোনার যন্ত্রপাতি এবং নাব্য যন্ত্রাদির উৎকৃষ্টতর বন্দোবস্ত করা দরকার হবে। অর্থাৎ

১৯৫৮-র মেরু অভিযান পরিকল্পনা সমর্থিত হলে এইসব উদ্যোগ আয়োজনের সুযোগ সুবিধে আদায় সহজ হবে।

একান্ত গোপনীয় এই অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে আমি নিজের মনকে নানা কঠিন প্রশ্নের পরীক্ষায় ফেলে যাচাই করলাম। লোকে যে পরিকল্পনা সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করছে সেটা যেন অসম্ভবের পেছনে মিছে ঘোরার মতোই মনে হচ্ছে। গত অভিযানে আমরা যা জেনেছি আর এখনও যা জানতে বাকী রয়েছে,—দুটোর তুলনামূলক হিসেব খতিয়ে কেউ যদি ১৯৫৮তে পুনর্যাত্রার প্রস্তাব দিত তাহলে আমি কিছুতেই এই ঝুঁকি ঘাড়ে নিতে চাইতাম না। গত অভিযানের অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি যে, এটা অসম্ভব, একে অনুমোদন করা পাগলামির সামিল। অথচ অবাক কাণ্ড, আমি নিজেই ত হোয়াইট হাউসে বলে এসেছি এ অভিযান সফল হবে!

যদি সত্যিই এই সফরে বেরুতে হয় তাহলে কতো কাজ করতে হবে—হাজারো রকমের খুঁটিনাটি দরকারী কাজের কথা আমার মনে জেগে উঠছে। কিন্তু কিছুই ত করা যাচ্ছে না। আমার হাত-পা বাঁধা। কেন না পরিকল্পনার মন্ত্রগুপ্তী বজায় রাখতে গেলে আমাকে মুখ বুজে অপেক্ষা করতেই হবে।

দেড় মাস কেটে গেল, সরকারী মহলের সাড়া শব্দ নেই! একমাত্র অরাণ্ডের একটা টেলিফোন পেয়েছি, তাতে বীজাকারে একরত্তি খবর "কাজ এগোচ্ছে"। ব্যস, আর কিছুই নয়!

পেণ্টাগনে আমি যাওয়ার একটা ফল ফলেছে। সেখানকার বড় বড় অফিসারদের মনে হাগেটির মতোই প্রশ্ন উঠেছে—ভূ-প্রদক্ষিণের প্রশ্ন। জনাকয়েক উচ্চপদবীর নৌ-কর্মচারীর ওপরে এর সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ভার পড়েছে। তাঁরা আমারই মতো রায় দিয়েছেন, সম্ভবপর বই কি। এর কয়েকদিন পরেই নৌবহরের প্রধান সেনাধ্যক্ষ এ্যাডমিরাল বার্ক, নটিলাসকে আগামী গ্রীষ্মে ভূ-প্রদক্ষিণের কাজে পাঠাবার সুপারিশ করলেন।

প্রেসিডেণ্টের মনোভাব এক কথাতেই বলা যায়—তিনি এতে উৎসাহ দিলেন। আমাদের প্রস্তাবিত মেরু অভিযান তাঁর কাছে খুব সমাদৃত হয়েছিল। আমার ধারণা তাঁর অবিচ্ছিন্ন তীক্ষ্ণ লক্ষ্যের প্রসাদেই আমাদের

অভিযানের আয়োজন নিরঙ্কুশ ভাবে সার্থক হয়ে ফুটে উঠেছিল।

শান্তির আমলে আমাদের অভিযানের পরিকল্পনাই বোধ করি সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক গোপন আয়োজন। এই গোপনতার দুটো কারণ ছিল, প্রথমতঃ নটিলাস যখন বেরিং প্রণালী অতিক্রম করবে তখন যদিচ তার গতিপথে সোভিয়েট এলাকার বাইরেই থাকবে তবে তাদের সাবমেরিন চলাচলের আওতার মধ্যেই সেটা পড়বে। এ পথে যাওয়া একেবারে নিরাপদ নয়। অবিশ্যি আমি স্বীকার করছি যে, তেমন কোনো ঘটনার আশঙ্কা খুবই কম—কিন্তু যদি কোনো গোলমাল বাধে! দ্বিতীয়তঃ সবাই ভাবছে যে আগে যাত্রাটা সুসম্পন্ন করাই ভালো, প্রথম পদার্পণের বাহাদুরীটা পরে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। প্রচারের পর্বটা পরে রাখাই ভালো। এই সব কারণেই, কেবল মাত্র সরকারী মহলেরও মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া পরিকল্পনার ভেতরের কথা কেউ টের পায়নি।

জানুয়ারী মাসে পেণ্টাগণ থেকে একটা টেলিফোনের ডাক পেলাম। বিষয়টা নাকি এমনই "স্পর্শকাতর যে তা টেলিফোনে বলা চলে না।" আমাকে অবিলম্বে রিয়ার এ্যাডমিরাল ডাসপিটের দপ্তরে (ডুবো লড়াই বিভাগ) হাজির হবার নির্দেশ দেওয়া হ'ল।) রাতের গাড়িতেই ওয়াশিংটনে রওনা হলাম—সারা পথটা দুর্ভাবনায় কেটেছে। কেবলই হাতড়ে বেড়ালাম—'আবার কি গোস্তাকী করেছি আমি?''

পেণ্টাগণে পৌঁছে প্রথমেই সাঁজোয়া সাবমেরিন বহরের কর্তা ক্যাপ্টেন ফ্রাঙ্ক ওয়াকারের সঙ্গে দেখা করলাম; কমাণ্ডার এম. জি. (ডিউক) বেইনের সঙ্গেও দেখা করলাম। আমরা তিনজনে (এ্যাডমিরাল ডাসপিটের দপ্তরে দৌড়লাম। তাঁর ঘর থেকে আর সকলকে বার ক'রে এ্যাডমিরাল দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন। তারপর আমরা বসতে তিনি বললেন— "শোনো এ্যাণ্ডারসন, এখন যদি বলি যে, উত্তরমেরুর মধ্যে দিয়ে নটিলাসকে নিয়ে তোমায় অন্য সাগরে যেতে হবে—তাহলে কেমন হয়?'' তারপর তিনি এ্যাডমিরাল বার্কের প্রস্তাব এবং তাতে প্রেসিডেণ্টের উৎসাহের কথা সবই শোনালেন।

এর অনেক আগেই নাব্যতার সম্ভাব্য সুবিধে-অসুবিধে সব দিকই আমি খুঁটিয়ে ভেবে রেখেছি। নটিলাস যে উত্তর মেরু অতিক্রম করতে পারবে

তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই—গ্রীনল্যাণ্ড স্পিট্‌স্‌বার্জেনের মধ্যে যে তুষার প্রতিরোধ রয়েছে সেটা ১৯৫৭-র মতো নটিলাস স্বচ্ছন্দে ডুবে পেরিয়ে যাবে। সেখানে জল গভীর। কিন্তু দুরূহ সমস্যা এসব ছাড়িয়ে বেরিং প্রণালী আর চুকৃচি সাগরে পড়ে রয়েছে—সুমেরু সমুদ্র আর প্রণালীর মধ্যবর্তী জায়গায় জল খুব অগভীর।

পৃথিবীর উপর থেকে দেখলে এই অঞ্চলকে অতিকায় ফানেলের মতো দেখায়, বাঁকানো তার মুখটা—বেরিং প্রণালী—দক্ষিণে বিরাজমান। গ্রীনল্যাণ্ডের দিকের তুলনায় এখানে বরফ অত্যন্ত অবিন্যস্ত এবং বীভৎস। দক্ষিণের দিকে ছড়িয়ে পড়েছে ফানেলের দেওয়াল, তার একদিকে আলাস্কা আর একদিকে সাইবেরিয়া। নলের সরু মুখটা যেন বরফে চাপা। বস্তুতঃ এই বরফের গঠন সংস্থান সেই রকমই, একটা স্তরের উপর আর একটা, তার উপর আর একটা, আরও আরও ঊষর উপকূল রেখা ঘিরে এই ঘন বরফের পর্বত। এখানকার বরফের গভীরতা উত্তর মেরুর অনুপাতে অনেক বেশি। এর ওপর প্রণালী আর চুকৃচী সাগরের জল এত অগভীর যে তাতে বিপদ আরও বেড়েছে। গড়ে ১২০ ফিটের বেশি গভীরতা এই দরিয়ায় নেই—যেটা সাধারণ সাবমেরিণ চলাচলের পক্ষে যথেষ্ট নয়। যদি এই জলের ওপর ভারী বরফের চাঁই চেপে থাকে তাহলে তার তলা দিয়ে কিম্বা তাকে পাশ কাটিয়ে চলা কোনো সাবমেরিনের সাধ্য নয়। সেই বিপদসঙ্কুল লোলুপ-দৃষ্টি তুষার পাহাড়ের তলা দিয়ে এগিয়ে যাবার কথা কল্পনা করলেও গা শিউরে ওঠে। এরই মধ্যে কোথাও কোথাও সাগরের জল একটু বেশি গভীর, হাতড়ে হাতড়ে পরম-সন্তর্পিত গতিতে দ্বিধাশঙ্কিত চিত্তে সেই সামান্য গভীর জলরেখা অনুসরণ ক'রে উত্তরের সুমেরু অববাহিকার দিকে এগোতে হবে।

স্রেফ নাব্যতার দিক দিয়ে বিবেচনা ক'রে দেখতে গেলে, ভালো ক'রে ভেবে নেওয়া দরকার যে, ওই অঞ্চলের অস্থির বিঘ্নসঙ্কুল আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে আদৌ অগ্রসর হওয়া সমীচীন কি না? তা ছাড়া নৌপরিচালনা সংক্রান্ত ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা ত রয়েছেই। এ্যাড্‌মিরাল ডাস্‌পিটের সম্মুখে বসে আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পার্চ্ছি, অজানা সমুদ্রের মধ্য দিয়ে নটিলাস চলেছে, তার মাথার ওপরে বিরাট-বিরাট বরফের চাঁই হুমড়ি খেয়ে ঝুলে

রয়েছে, আর ফ্যাদোমিটারে দরিয়ার গভীরতার নির্দেশ রেখান্বিত হয়ে ফুটে উঠছে। কোনো দিকেই নড়া সরার, হাত-পা খেলিয়ে চলার মতো প্রশস্ত পরিসর নেই। নটিলাস এগিয়ে চলেছে খুব হিসেব ক'রে! যেন খুব নিচু কাঁটাতারের বেড়ার ভেতর দিয়ে একটা বাচ্চা ছেলে গলে যাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু নটিলাস ক্ষীণ কলেবর নয়, ছোটখাটো সহরের মতো তার পরিধি, চারহাজার টন ওজনের ভারি দেহটাকে জলের তলে ডুবিয়ে নিয়ে তাকে চলতে হচ্ছে—এখানেই তার সঙ্গে সেই বালকের বিরাট পার্থক্য।

এ সবই জানি। কিন্তু সেই সঙ্গে এও জানি যে, নটিলাস পারবে। সেটা নিশ্চিত জানি তা-ই বললাম, হ্যাঁ পারা যাবে।

একটার পর একটা আলোচনা বৈঠক চলতে লাগল। ডঃ লয়েনকে ওয়াশিংটনে তলব করা হ'ল। তিনিও এসে আমার মতেই সায় দিলেন। অর্থাৎ আমি যেমন বলেছি, প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আটলান্টিকে যাওয়ার দুর্লঙ্ঘ্যতম পথটা আগে জয় করতে হবে। আমরা বিজয়ী হবো কি না সেকথা সম্পূর্ণ নিশ্চিত ভাবে কখনোই বলা সম্ভব নয়। আমাদের যাত্রাটা একেবারেই পরীক্ষামূলক মনোভাব নিয়ে শুরু করতে হবে! যদি পারি, যতটা পারি এগিয়ে যাবো—একেবারে অসম্ভব না হ'লে, বরফের চক্রান্ত প্রাণসংশয়ী না হ'লে আমরা শেষ অবধি যাবো। যেখানে সেরকম বিপদের সম্মুখে পড়ব সেখানে আমাদের পরিকল্পনা বদবদল করার কথা ভাবতে হবে—কেন না, নটিলাস বা তার নাবিকদের অযথা সর্বনাশের সম্মুখে ঠেলে নিয়ে যাওয়া আমাকে দিয়ে সম্ভব নয়।

এখন বাকী রইল একটা চিন্তার মীমাংসা, প্রথম অভিযানটা শীতে করা হবে, না গ্রীষ্মে? শীতের সময় বেরিং প্রণালীর সংকীর্ণ জল-খাতের অনেক নীচ পর্যন্ত জমাট বরফ নেমে আসে। আর, গরমের সময় এর গভীরতা সুমেরু অববাহিকার মাথায় মাথায় উঠে যায়। হয়তো ভবিষ্যতের কোনো সফরে, দেখা যাবে যে আমার এই ধারণা ভুল, কিন্তু তখনো পর্যন্ত বরফের সম্পর্কে যে সামান্য জ্ঞান আমাদের পুঁজি ছিল তাতে গ্রীষ্ম ঋতুতে সফরই প্রশস্ত মনে হ'ল। তাতে অন্ততঃ অগভীর জলের মধ্য দিয়ে বরফের নিচে আমাদের যাত্রার কালটুকু যথাসম্ভব কম হবে।

মোটামুটি ঠিক রইল যে, আমরা জুনের আট তারিখে বেরুবো।

॥ এগারো ॥

নিউ লণ্ডনে ফিরেই আমার নতুন একজিকিউটিভ অফিসার লেঃ কমাণ্ডার ফ্রাঙ্ক এ্যাডামকে, চীফ এঞ্জিনিয়ার লেঃ পল আর্লি, এবং আমার নূতন নৌ-চালন বিশারদ লেঃ শেপ জেঙ্কসকে আমার স্টেটরুমে ডেকে পাঠালাম। আলোচনার আগে তাদের সাবধান ক'রে দিলাম যে, যা কথা হবে সবই একান্ত গোপনীয় ব'লে স্মরণ রাখতে হবে সবাইকে। ওয়াশিংটনে যে গুরুত্বময় ঘটনার আয়োজন চলেছে, ওদের তা জানালাম। আমরা চারজনে মিলে এখন আমার নাবিক জীবনের দুরূহতম সংকল্পকে, গোপনতা বজায় রেখে কিভাবে সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেই ভাবনাই ভাবতে শুরু করলাম। নাটিলাসকে মেরু অতিক্রমের সফরের জন্য প্রস্তুত করতে হবে, অথচ সেটা বকে-পক্ষীতে যেন টের না পায়।

জাহাজে, সোনার যন্ত্র এবং অন্যান্য নৌ-যন্ত্রাদি যোজনার ব্যাপারটা ত লুকিয়ে করা যাবে না। অতএব, এ্যাড্‌মিরাল বার্ক একটা "লোক দেখানো পরিকল্পনা" অনুমোদন করলেন। নৌ-বিভাগ থেকে ঘোষণা করা হ'ল যে, আণবিক শক্তিচালিত নটিলাস এবং স্কেট, আর সনাতন রীতির ডুবোজাহাজ হাফ্‌বীক ১৯৫৮-র গ্রীষ্মে মেরু অঞ্চলে সফর করবে। এর বেশি একটি কথাও ফাঁস করা হ'ল না। এতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, গত বছরের মতো এবারও মেরু দরিয়ায় নটিলাস ডুবো চক্কর দেবে—গ্রীণল্যাণ্ড-স্পিট্‌স্‌বার্জেন এলাকায়।

বসন্তে আমরা প্রশান্ত মহাসাগরে যাবো, কেন না সেখান থেকেই আমাদের মেরু অতিক্রমের উদ্যোগ আয়োজন পর্ব শুরু হবে। এ্যাডমিরাল বার্ক রটিয়ে দিলেন যে, সাবমেরিন প্রতিরোধ সংগ্রামের আণবিক শক্তিচালিত ডুবো জাহাজের সম্ভাব্য ক্রিয়াকলাপের হদোহদিস

দেখেশুনে নেবার উদ্দেশ্যেই নাটিলাসের এই পশ্চিম উপকূল যাত্রা। নটিলাস এই সফরে যে-সব বন্দর দিয়ে যাবে তা হল, বলবোয়া, পানামা, সান্ ডায়েগো, সানফ্রান্সিস্কো, সিয়াটল। তিনি জানালেন যে, জুন মাসের সাত তারিখে নটিলাস পূর্ব উপকূলের দিকে পুনর্যাত্রা করবে। সিয়াটল থেকে রওনা হয়ে ডুব পথে ছাব্বিশ দিন ধরে' ঘুরে পানামাতে ফিরে আসবে। এই দীর্ঘকালের ডুবোযাত্রায় যেহেতু পৃথিবীর উপর দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে আমাদের কোনো যোগ থাকবার কথা নয়, সেহেতু কোনও প্রকার সন্দেহের উদ্রেক না করেই আমরা যাত্রা সমাধা করতে পারবো। এবং কোনও বিজ্ঞানী কিম্বা নৌ-বিভাগীয় লোক যদি আমাদের সঙ্গ নিতে চায় তাহলে তাকেও স্বচ্ছন্দে এড়ানো যাবে—বলা হবে যে, আমাদের ভাণ্ডারে অক্সিজেন খুব পরিমিত পরিমাণ, অতএব বাড়তি লোক নেওয়া চলবে না।

এই পরিকল্পনাতে সাবমেরিণ প্রতিরোধী সংস্থাদের কাছে বার্ক খবর দেবেন যে, যখন আমরা তাদের এলাকার মধ্যে গিয়ে পড়ব, মাত্র তখনই তারা আমাদের সঙ্গে কাজ করতে পারবে। তবে, আমাদের লম্বা সফরের আসল কাজ যেহেতু আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে তথ্য-তল্লাসী সেহেতু নটিলাস প্রশান্ত মহাসাগরের ঘাঁটিগুলো থেকে অনেক দূর-দূর দিয়েই চলবে—একথাই নৌবহরের প্রধান অধ্যক্ষ ঘোষণা ক'রে দেবেন। আমাদের এই সফরের উদ্দেশ্য দূরপাল্লার ডুবো যাত্রা সম্পর্কে পরীক্ষানিরীক্ষা করা—ভবিষ্যতে এই অভিজ্ঞতালব্ধ ফল আণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিণের খুব কাজে আসবে, মেরু আঞ্চলিক ডুবো যাত্রার ক্ষেত্রে বিশেষ ক'রে এটা মূল্যবান হবে। কাজেই, বার্ক বলবেন যে, অন্ততঃ এই সফরে নাটিলাসের ঘাড়ে অন্য কাজের ভার না চাপানোই ভালো।

"লোক দেখানো পরিকল্পনা"র হিসেব মাফিক, জুলাইতে নটিলাস নিউ লণ্ডনে ফিরে আসবে। এবং তারপর চূড়ান্ত উদ্যোগ, গোছগাছ চুকিয়ে, স্কেট এবং হাফবীককে সঙ্গে নিয়ে গ্রীণল্যাণ্ড অঞ্চলের দিকে যাত্রা—জুলাইএর শেষ কিম্বা অগাস্টের শুরুতে।

ভালো ক'রে ভেবে দেখলে বেশ অনুভব করা যায় যে, 'লোক দেখানো কর্ম' পরিকল্পনার কাজটা প্রায় আমাদের মূল যাত্রার সমান কষ্টকর। গোটা নিউ ইংলণ্ডের মধ্যে মাত্র একটি অফিসারের সঙ্গেই আমি খোলাখুলি সব

কথা আলোচনা করতে পারি—তিনি তাবৎ আটলান্টিকের ডুবো জাহাজের কমাণ্ডার, রিয়ার এ্যাডেমিরাল এফ, বি, ওয়ার্ডার। আমি পারতপক্ষে আমার নাবিকদের ভাঁওতা দিতে সঙ্কোচ বোধ করি, সেহেতু যখনই আমাদের ভবিষ্যৎ যাত্রা প্রসঙ্গে কোনো আলোচনা ওঠার আভাষ পাই তখনই সরে' সরে' দূরে থাকি।

আমাদের জাহাজে প্রথম যে যন্ত্রটি আসবে তার কলকব্জা বড় জটিল, তার স্পর্শসংবেদ্যতা এবং সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি বন্দোবস্ত প্রায় ইলেকট্রনিক ব্রেন্-এর মতো—একে বলা হয় 'ইনার্সিয়াল নেভিগেটর'। নর্থ আমেরিকান এ্যাভিয়েশন ইঞ্জিনিয়াররা এই যন্ত্রটি এমনভাবে বানিয়েছে, যে দেশে-দেশান্তরে তাদের 'নাভাহো' ক্ষেপণাস্ত্র প্রয়োগের বেলায় এই যন্ত্রের নির্দেশ অণুসরণ করলে তাদের লক্ষ্য ব্যর্থ হবে না। গতিবেগ, যাত্রার দিক নির্ণয় এবং আরও অনেক খুঁটিনাটি খবর এই যন্ত্রে ধরা পড়ে—কাজেই এর সাহায্যে আমরা সেদিকে লক্ষ্য রাখলে কাজের অনেক সুবিধে হবে। আমাদের অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে।

এপ্রিলের মাঝামাঝি এই 'ইনার্সিয়াল নেভিগেটর' যন্ত্র বসল নটিলাসে। উত্তর আমেরিকার ইঞ্জিনিয়ারেরা গোপনতা বজায় রেখেই মাপা সময়ের মধ্যে সুন্দরভাবে তাদের কাজ সম্পন্ন করল। যন্তরটা লাগানো হয়ে যাবার পর প্রথম দেখে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম, (এর তড়িৎ-চক্রের সংযোগ সূত্রগুলো সোনা দিয়ে ছাপা)। এই সব দেখে শুনে আমার বদ্ধ ধারণা হ'ল, এত যার বাহার তা দিয়ে কাজ হবে না, বাহারই সার। কিন্তু আমার এই গণনা ভুল, প্রমাণ হ'ল। ইনারসিয়াল নেভিগেটর ('N6A') সর্বদা আমাদের অবস্থান সম্পর্কে নির্ভুল হিসেব দিতে লাগল। যদি এই যন্ত্র ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পর্যাপ্ত সংখ্যায় তৈরি হয় তাহলে নৌ-জগতে যুগান্তর আসবে কোন সন্দেহ নেই। মেরু অঞ্চলে চলাচলের পক্ষে আমাদের যে সুবিধে হবে সেটা না বললেও চলে। ক্ষেপণাস্ত্র প্রয়োগের সময় নিজেদের অবস্থান জানার যে প্রয়োজন তা এই 'N6A'-র দ্বারা সুন্দর ভাবে সাধিত হবে।

কাজ যখন চলছে তখন স্পেরি জাইরোস্কোপের ইঞ্জিনিয়াররা একটা নতুন কম্পাস লাগিয়ে দিল, আর নাটিলাসের অন্য দুটো কম্পাসকে উচ্চ

অক্ষরেখার উপযুক্ত ক'রে গড়ে দিল নতুন ভাবে। ওদের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার আমার সঙ্গে আর জেঙ্কসের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মেরু সফরে কম্পাসের কার্যসমস্যা নিয়ে অনেক আলোচনা করলেন। সেই সময়ে আবার ডঃ লয়েনের লোকেরা ছটা সোনার যন্ত্র নিয়ে হাজির হ'ল। এর মধ্যে একটি নটিলাসের জন্য বিশেষ ভাবে তৈরী। এটা আমাদের ১৯৫৭-র চেয়ে নানা দিক দিয়ে উন্নততর। এবং সমুদ্র-তুষারের অন্ধিসন্ধি বিশ্লেষণের বিশেষ দক্ষতা এই যন্ত্রটির রয়েছে। নটিলাসের ওপরে ইলেক্‌ট্রিক বোট কোম্পানীর লোকেরা চব্বিশঘণ্টাই ব্যস্তভাবে কাজ করছে।

আমরা বেশ বুঝতে পারছি যে, ইলেক্‌ট্রিক বোট কোম্পানীর লোকেরা আর নটিলাসের জাহাজীরা এই প্রচণ্ড কর্মসমারোহের গূঢ় কারণটা জানবার জন্য অদম্য কৌতূহলে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। ওরা ভেবেই পাচ্ছেনা যে, যদি জুলাই-আগষ্টের আগে আমরা মেরু অঞ্চলে সফর না করি, আর যাত্রার আগে যদি আমরা নিউলণ্ডনেই থামি তাহলে এত আগে থেকে কি জন্য এত উদ্যোগ আয়োজন? নতুন গীয়ারটা পরে লাগালেও তো চলত! আমাদের কৈফিয়ৎ, শেষকালে গীয়ার-টিয়ার লাগানোর হয়তো সময় পাওয়া যাবে না,—তারচেয়ে হাতে সময় থাকতেই সব কাজ মিটিয়ে রাখা যাক, ধীরে সুস্থে গ্রান্‌লাণ্ডের দিকে যাত্রা করা যাবে।

কিন্তু আমাদের এসব বানানো গল্পে তাদের মনের সন্দেহ ঘুচল না। অগত্যা আমাদের আর একটু মগজ ঘেঁটে ইলেক্‌ট্রিক বোটের লোকেদের সঙ্গে আলোচনা বৈঠকে বসতে হল। তাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত হ'ল জুলাই-এর "স্থিতি"র সময় আরও কিছু কাজ তারা করবে। ওদের সঙ্গে আলোচনার পরই গ্রোটনের জাহাজ কারখানার কর্তা ক্যাপ্টেন স্মিথ এক ইস্তাহারে নটিলাসের কাল্পনিক যাত্রাসূচী প্রকাশ করলেন। তাতে নটিলাসের প্রত্যাবর্তনের তারিখ পর্যন্ত বাতলে দেওয়া হ'ল। এমন কি ইলেক্‌ট্রিক বোটের সুপারভাইজারদের উড়োজাহাজে ক'রে পানামায় নিয়ে যাওয়ার কথাও ঘোষণা করা হয়ে গেল। পানামায় গিয়ে তারা নটিলাসে চড়ে' তাকে নিউলণ্ডনে নিয়ে আসবে, তাও স্থির হয়ে গেল।

ফেব্রুয়ারী শেষের দিকে রিয়ার এ্যাডমিরাল ওয়ার্ডার নটিলাসে স্কেট এবং হাফ্‌বীকের আগামী মেরু আঞ্চলিক অভিযানকে কেন্দ্র ক'রে

এক সম্মেলন আহ্বান করলেন। এতদিনে মেরু-বিশেষজ্ঞরা মেরুসমুদ্রে সাবমেরিণের অনুপ্রবেশ সম্ভাবনায় দস্তুরমতো কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন। কাজেই সম্মেলনে তাদের ভিড় হল। এদিকে আমার অফিসারদের কাছে আসল মতলবটা জানিয়ে দিয়েছি এবং কিভাবে তাঁদের কল্পনাশ্রিত অভিনয় দিয়ে আসল মতলবটা ঢেকে রাখতে হবে তাও শিখিয়ে দিয়েছি। অধিবেশনে গ্রীণল্যাণ্ডের দিক থেকে প্রবেশের সম্পর্কেই এটা সেটা নিয়ে তর্কবিতর্কে আমরা ভীষণ তৎপরভাবে মেতে রইলাম। আসল কথাটা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ পেলো না।

আমার কিন্তু একটা দিকে নজর ঠিকই রয়েছে,—এই ধরণের অভিযান কেবলমাত্র স্বেচ্ছাব্রতীদের নিয়েই হওয়া সমীচীন। কাজেই পূর্ব উপকূল থেকে রওনার আগেই আমি এই দিকের কর্তব্য সম্পাদন করেছি ব'লে মনে করি। নটিলাসের যাত্রার কার্যসূচী ঘোষণার পরই আমি কনিষ্ঠ অফিসারদের ব'লে দিলাম যে, তারা বেশ শান্ত ভাবে তাদের আপন আপন বিভাগে খোঁজ নিয়ে দেখুক, "এমন কেউ আছে কি, যে বরফের তলা দিয়ে সফরের কালটা ছুটি নিয়ে বন্দরে থাকতে চায়। ছুটি দিতে আমাদের আপত্তি নেই। আর যদি সঙ্গে যেতে চায় তাতেও আপত্তি নেই।" কিন্তু নাটিলাসের একটি প্রাণীও পিছনে পড়ে থাকতে চাইল না।

নটিলাসের জাহাজীদের বৈশিষ্ট্যই এই যে, তারা সব সময়েই মুখ বুজে থাকে, তাদের প্রত্যেকের ওপরেই আমার অগাধ ভরসা—কাজেই তাদের ছলনা করতে আমার বিবেকে বাধে। কিন্তু এক্ষেত্রে কোনো উপায় নেই, কেন না "চরম গোপনীয়তা" বজায় রাখতে হ'লে বেশি লোককে ত আসল কথাটা বলা চলে না—যত কম লোকে জানে সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। নিজেকে এই ব'লে সান্ত্বনা দিলাম যে, যদি তাদের কাছে আসল অভিযানের কথাটা আগে বলি আর তারপর সেটা নাকচ হয়ে যায় তাহলে ওরা খুবই মর্মাহত হবে। অতএব ওদের না জানাই ভালো।

আমাদের এত সতর্কতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত অপরের চোখকে ফাঁকি দেওয়া গেল না। নটিলাসের অনেক জাহাজীই রীতিমত সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিল। নইলে, যখন জাহাজের ওপর শীতের গরম পোষাক এবং টাটকা

জলের ব্যবস্থার জন্য এ্যান্টিফ্রিজ বাড়তি ডিজেল তোলা হ'ল, তখন একজন চীফ হঠাৎ এ প্রশ্ন করবে কেন, "আচ্ছা, আমরা ত ক্যালিফোর্ণিয়াতে বসন্তকালীন সফরে যাচ্ছি, তাই যদি হয় তবে খামোখা এগুলো নেওয়া হচ্ছে কেন? এগুলো ত পরে, যখন আমরা বরফে যাবো তখন নিলেই চলত।"

সেই বাঁধাধরা গৎ শোনানো ছাড়া আমাদের অন্য পথ নেই, বললাম—"যতোটা পারা যায় আগে থেকে কাজ গুছিয়ে রাখতে দোষ কি?" কিন্তু কথাটা ব'লে মনে হ'ল এতে তাদের মন উঠবে না। অগত্যা আর একটা গুজব চালু করতে হ'ল।

একদিন সকালে এ্যাডাম জাহাজীদের আস্তানায় হাজির হয়ে বললেন, যে, পশ্চিম উপকূল থেকে পানামায় ফেরবার পথে আমি গভীর সমুদ্রের তলা দিয়ে ভূ-বিষুবরেখা ডিঙোবার অনুমতি পেয়েছি। এবং যেহেতু আণবিক শক্তির সাবমেরিনের মধ্যে আমরাই প্রথম এই নিরক্ষরেখা পার হওয়ার গৌরবের অধিকারী হবো—একটা বিরাট সাফল্যের যোগ্য উৎসবের বন্দোবস্ত করতে হবে ত! তার জন্যে জুৎসই উদ্যোগ আয়োজন করা দরকার। ব্যস, আর যায় কোথায়, এই উৎসবের পাণ্ডারা অনেক দূর এগিয়ে গেল—এমন কি এর জন্যে বিশেষ মানপত্র ছাপার ব্যবস্থাও তারা করে ফেলল। বলা বাহুল্য সে উৎসব আদৌ হবার নয়। যাই হোক, আমরা এই ভেবে নিশ্চিন্ত হ'লাম যে, এদের মনে সন্দেহের ছিটে ফোঁটাও রইল না যে আমরা প্রশান্ত মহাসাগর দিয়ে বরফের মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছি।

একটা সমস্যা আমাদের খুব ভাবিয়ে তুলেছে, 'আলাস্কা থেকে পোর্টল্যাণ্ড, ইংলণ্ডের মধ্যবর্তী অঞ্চলের সম্পর্কে প্রকাশিত বইপত্র এবং মানচিত্রাদি সংগ্রহের কি উপায় হবে? কাজটা অবশ্য তেমন কঠিন নয়, তবে আমাদের কাছ থেকে নিয়মিত পদ্ধতিতে যে মুহূর্তে এইসব তথ্যপত্র খোঁজ করা হবে তখনই হাইড্রোগ্রাফিক (সমুদ্রতলের মানচিত্র) দপ্তরে সাড়া পড়ে যাবে, তাদের মনে সন্দেহ জাগবে। সি-এন-ও'র ডিউক বেইন এই দিকটা দেখাশুনো করার জন্যে ভারপ্রাপ্ত, সে করল কি, সি-এন-ও'র দপ্তরের নাম ক'রে সমগ্র মেরু অঞ্চলের জল তলের মানচিত্র চেয়ে পাঠাল। শেপ জোন্সকে ওয়াশিংটনে পাঠানো হ'ল

কাগজপত্রগুলো আনবার জন্যে। একটা সিন্দুকে তালাচাবি দিয়ে সেগুলো আমার স্টেট্ রুমে রইল, যখন তার দরকার পড়ত তখন দরজা বন্ধ ক'রে কাজ করত।

আমরা গত বছরে যে মানচিত্র এবং জলতলের বিবরণী ব্যবহার করেছি আর রাশিয়ার প্রকাশিত মানচিত্রে কতকগুলো জলবার্তা ছিল সেগুলো একেবারে ভুল, তার প্রমাণ আমরা সেবারেই পেয়েছি। আর মেরু অঞ্চলের অববাহিকা সম্পর্কে কোনো মানচিত্রই তৈরী হয় নি। জলতলের মানচিত্র দপ্তরের কাছে সি-এন-ও'র মারফতে আমাদের জন্য বিশেষ এক প্রস্থ মানচিত্র ও বিবরণী তৈরী ক'রে পাঠানোর অনুরোধ জানানো হ'ল। তারা সি-এন-ও'কে জানাল যে সেগুলো জুলাই-এর শেষ দিকে পাওয়া যাবে। সি-এন-ও জবাব দিল, যে ক'রে হোক মে মাসেই বানিয়ে দিতে হবে। এই মানচিত্রগুলো আমরা পেলাম সান্-ফ্রান্সিস্কোর 'চরম গোপন' ডাকযোগে, সিয়াট্‌লে রওনা হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে। অবশ্য এর বেশির ভাগই আমাদের ১৯৫৭-তে ব্যবহৃত মানচিত্র।

এই অভিযানে নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আমার ব্যক্তিগত জীবনে উদ্বেগ, যন্ত্রণার অন্ত ছিল না। হয়তো অনেক বন্ধু-বান্ধবকেও চটিয়েছি,— আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা আলোচনার ক্ষেত্রে হঠাৎ থমকে গিয়ে অন্য কথা পেড়েছি কিম্বা এড়িয়ে যাবার জন্য কথা ঘুরিয়ে দিয়েছি।

বাড়িতেও কতকটা সেই দশাই দাঁড়িয়েছিল। দু-চার দিন বাদে বাদেই এটা-সেটা অজুহাতে ওয়াশিংটনে দৌড়ই, রাত দুপুরে টেলিফোন বেজে ওঠে—কথাবার্তা এমন ভাবে বাঁচিয়ে বলতে হয় যে, হঠাৎ শুনলে কেউ ভাবতে পারে উদ্ভট ধরণের খিস্তি করছি। তা ছাড়া যেটুকু সময় বাড়িতে থাকি তার বেশিরভাগই কাটে আমার লাইব্রেরী ঘরে—বই, চার্ট, মানচিত্র এই সব নিয়ে।

গত বছরে কিছু কিছু জাহাজীদের বৌ-রা নটিলাসের বরফের নীচ দিয়ে অভিযানের সম্ভাবনার কথা শুনেছিল, কিম্বা আন্দাজ করতে পেরেছিল। আর, এবারে নৌ-বিভাগ থেকেই ঘোষণা করা হয়েছে, নটিলাস, স্কেট, এবং হাফবীক ১৮৫৮-র গ্রীষ্মে কোথায় যাবে, কাজেই

এবার স্ত্রীরা জানে যে আবার বরফের তলায়! আমরা সেঁধোবো। সময় যত কাছিয়ে আসছে আমি ততই টের পাচ্ছি যে বনির মনে কেমন আশঙ্কার ছায়া পড়ছে। ও যেন গন্ধ পেয়েছে, আমাদের এই যাত্রা গত বছরের চেয়ে বৃহত্তর, হয়তো উত্তর মেরুর চেয়েও দূর পথের অভিযাত্রী আমরা। এবং ও ঠিক ধরে ফেলেছে, আমাদের যাত্রা বিপদ-জনক। তবে বনিকে বাহাদুরী দিতে হয় এই জন্যে যে, এইসব সূক্ষ্ম বিষয়ে ও চুপ ক'রে মুখ বুজে থাকতে জানে। আমি যে যাত্রার বিষয়টা গোপন রাখতে চাই সেটা বুঝেই এ সম্পর্কে বেশী কৌতূহল প্রকাশ করে না। সেজন্যে আমি ওর কাছে কৃতজ্ঞ।

আমাদের অজ্ঞাতসারেই যেন হঠাৎ নিউ লণ্ডনের নোঙর তোলার দিনটা চলে এল। এপ্রিলের পঁচিশ তারিখে আমাদের বন্দরের বন্ধন খুলে সন্ধ্যে বেলায় গভীর জলে পড়ে আমরা ডুব দিলাম, পানামার পথে পাড়ি জমালাম। টেম্‌স নদীর পথ ধরে লং আইল্যাণ্ড সাউণ্ডে চলা শুরু হ'ল।

॥ বারো ॥

বেস্‌বল দলের পরিচালক যেমন খেলার আগেই তার দলের জয় পরাজয় জানতে পারে বা বলে দিতে পারে তেমনি জাহাজের ক্যাপ্টেনও তার সফরের সাফল্য সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে—ছোটখাট খুঁটিনাটি লক্ষণকে আশ্রয় ক'রেই তার এই অনুমান গড়ে ওঠে। আর পাঁচজন সাধারণ সফরকারীদের চেয়ে আমার মনের কুসংস্কার বেশী নয়। তবে হ্যাঁ, কতকগুলো লক্ষণকে আমি ফেলতে পারি না যেমন আবহাওয়া কি ওইরকমের কিছু কিছু চিহ্ন থেকে আন্দাজ করতে পারি শুভাশুভ। আমার মনে পড়ে, যখন ওয়াহু জাহাজের কর্তা ছিলাম তখন, বন্দর ছেড়ে আসবার সময় যদি সিন্ধু শকুনদের জাহাজের আশে-পাশে উড়ে বেড়াতে দেখলে মনটা খুশী হ'ত, ভাবতাম যাত্রা শুভ। আর যদি পাখীরা না উড়তো তাহলে মনটা খারাপ হয়ে যেতো সত্যি, অনেক সময় এই লক্ষণগুলো মিলেও যেত।

পানামার ডুবো পথে নিজের অজ্ঞাতে কতকটা প্রবৃত্তিগত নিয়মেই আমি সুলক্ষণের আশায় পথ চেয়ে কাটিয়েছি। কিন্তু সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটেছে কোনো শুভ লক্ষণের আভাষ মেলে নি। একটার পর একটা নিত্য নতুন সমস্যা এসে জুটেছে, তার অধিকাংশই অবশ্য যান্ত্রিক গোলযোগ। এ থেকে স্পষ্টই প্রামাণিত হচ্ছে যে নটিলাসের স্বভাবসিদ্ধ অব্যাহত গতি এ নয়।

পানামার পথে আমাদের রিয়্যাক্টর ভালোভাবেই কাজ করছিল, কিন্তু হঠাৎ আবিষ্কার হ'ল যে, একটা বাষ্প শীতকে (Steam condenser) ছোট্ট একটি ছিদ্র হয়ে সেখান দিয়ে লোনা জল ঢুকছে। ছেঁদাটা খুব সূক্ষ্ম, মাথার চুলের মতো সরু। সাবমেরিনে এরকম ছোটখাট ছেঁদা

থাকাটা বিচিত্র নয়। কিন্তু এই যন্ত্রটার ক্ষেত্রে ওই সামান্য ছিদ্রও মারাত্মক, লোনা জলে এর সূক্ষ্মতম ক্ষয় বিপদের কারণ ঘটতে পারে, মানে ঘূর্ণনযন্ত্র অকেজো হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আর বরফের তলায় চাকা বন্ধ হয়ে গেলে সর্বনাশের আর বাকী কি থাকে।

আমাদের এঞ্জিনিয়ারিং অফিসার পল্ আর্লি আর তার বিশ্বকর্মার শিষ্য দল-বল পাইপ, ভ্যাল্ভ্, সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল, বিচক্ষণ গোয়েন্দার মতো। পল্ আর্লি ছিদ্রের মূল ক্ষেত্রটা বার করল। তাতে মোটামুটি এই হিসেব মিলল,—দশ হাজার সূক্ষ্ম কলকব্জার যে-কোনো অংশ থেকে তার উৎপত্তি ধরা যেতে পারে। আসল জায়গাটা খুঁজে ঠিকই বার করা যায়, তবে তা করতে হ'লে জাহাজটার আশপাশ তলা খুলে ফেলাই প্রশস্ত উপায়, যোদ্দা ওরা যৎপরনাস্তি চেষ্টা ক'রেও ছিদ্রটা খুঁজে পেল না। অথচ এদিকে আস্তে আস্তে কন্‌ডেন্সারে ক্লোরাইড্-এর মাত্রা বেড়েই যাচ্ছে। উদ্বেগে আমি অস্থির হয়ে উঠলাম।

ওদিকে আর এক চিন্তা জাহাজের ভেতরের বাতাস যতখানি নির্দোষ থাকা উচিত, তাও থাকছে না। একটা ধোঁয়াটে কুণ্ডলী জাহাজময় ছড়িয়ে রয়েছে, অথচ তার কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বিশেষতঃ ইঞ্জিন ঘর আর পরিচালক কক্ষের সামনেই এই ধোঁয়ার ঘন আস্তরণের উপদ্রব। গোড়াতে আমরা ভেবেছিলাম একটা তাজা রং শুকানোর ধোঁয়াই হবে,—নিউলণ্ডনে হালফিল জাহাজের যন্ত্রপাতি আর ভেতরের দেয়ালগুলোর নতুন রং লাগানো হয়েছে ত। কিন্তু সাধারণতঃ রং শুকানোর গন্ধ মিলিয়ে গেল তবু এ ধোঁয়া ত রয়েই গেল। একটুকু কমছে না! উল্টে, আমরা যতোই পানামার কাছাকাছি আসছি ধোঁয়ার মাত্রা ততোই বাড়ছে। বল্‌বোয়া বন্দরে যখন পৌঁছলাম তখন ইঞ্জিন ঘর আর পরিচালনা ঘরে যারা কাজ করছিল ধোঁয়ার দাপটে তাদের চোখ লাল হয়ে উঠেছে, আর চোখ দিয়ে জল ঝরছে। ম্যাক্‌নালী এই অবস্থাকে কেন্দ্র ক'রে আমাদের নিজস্ব পত্রিকায় এক ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করে ফেলল—পানামাতে নটিলাসের জাহাজীরা নামছে, হাতে হাতে বেতের ছড়ি, চোখে গগলস, তাদের গাল বেয়ে অশ্রু ধারা নামছে, ছড়ি দিয়ে হাতড়ে

হাতড়ে তারা নামছে। দু'জন বয়সীর্ধি মহিলা এদের দেখে বলাবলি করছে—আহা! এমন করুণ দৃশ্য জীবনে কখনও দেখিনি।"

আমার কাছে ছবির আবেদন মোটেই হাস্যকর নয়। কোথাও বড় গোছের একটা গলদ রয়েছে। সেই ভাবনায় আমার হাসি শুকিয়ে গেছে।

পানামায় আমাদের অবস্থিতি মাত্র দু'দিনের। একটা সন্ধ্যেতে পুরনো বন্ধু ক্যাপ্টেন মিনারের সঙ্গে দোস্তীটা ঝালিয়ে নিলাম, সে আমাকে আর আমার একজিকিউটিভকে নেমন্তন্ন খাওয়ালে। সে বললে আমরা জুলাইতে যখন আবার পানামায় আসবো তখনও খেতে হবে। আসল কথাটা ভেঙে বলবার উপায় নেই, কাজেই সে নেমন্তন্নটা অম্লান বদনে নিতে হ'ল। নটিলাসের জাহাজীদের হাতে এখন টাকা পয়সা তেমন নেই, কাজেই তাদের পছন্দ সই উপহার সামগ্রী বেছেকুছে দোকানেই রেখে দিল—হয়তো কিছু টাকা অগ্রিম দিয়ে বায়না ক'রে রাখল, ফিরতি পথে জিনিষটা নিয়ে যাবে! একটা ক্যামেরার লেন্স দেখে জন ক্রাউজিকের চোখ দুটো লোলুপ হয়ে উঠল। চট্ ক'রে কিছু টাকা অগ্রিম দিয়ে লেন্সটা আটকে ফেলল সে। এবং পরে সেই দোকানে চিঠিও লিখল, জুলাইতে ফিরছি তখন বাকী টাকা মিটিয়ে দেবো, লেন্স নেবো।

মে মাসের চার তারিখে আমরা পানামা ছাড়লাম। কিছুটা ওপরে ভেসে চলে, আবার ডুব দিলাম। আর, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেই ধোঁয়ার উপদ্রব শুরু হয়ে গেল, এঞ্জিনিয়াররা সেটা লক্ষ্য করেছে। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাদের চোখ দিয়ে জল ঝরতে শুরু করল।

লেঃ বিল লালর আমাদের মেইনের প্রপাল্সন অফিসার মেশিনারীর নীচে ফাঁকা জায়গায় নেমে এসে একটা প্রপেলারের চাকার পাশ দিয়ে সমুদ্রের জল ঢুকতে দেখল। আরও কাছে গিয়ে ভালো ক'রে দেখল সে, ছ্যাঁদা হয়েছে, মেইন টারবাইনের ভেতর দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। দুশ্চিন্তার ছাপ পড়েছে তার মুখময়। লেঃ স্টিভেন হোয়াইট আর চীফ স্টুয়ার্ট নিল্সনের কাছে সে এসে বলল' দেখে মনে হচ্ছে যেন কেউ চুরুট টানছে।' কিন্তু সেখানে ত আর কেউ বসে বসে চুরুট

খেতে পারে না। তখন পরিচালন কক্ষে রিয়্যাক্টরের নিয়ন্ত্রণ আর বাষ্পের ক্রিয়াকলাপের দিকে নজর রাখার কাজে ব্যস্ত।

প্রথমে তারা ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দেয় নি, ভেবেছিল হয়তো বাষ্পীয় প্রণালীর কোনো যোগ-সন্ধি থেকে তেল গড়াচ্ছে। একজন এঞ্জিনিয়ারকে নিচে পাঠিয়ে দিল, বলল, তেলটা মুছে কনেক্‌শানের মুখটা শক্ত ক'রে এঁটে দাও।

কিন্তু একটু পরেই টের পাওয়া গেল, ব্যাপারটা অতো সামান্য নয়, সাধারণ তেল-গড়ানো ছেঁদা ওটা নয়। ইঞ্জিন ঘরের ওপর অবধি ধোঁয়া উঠে এসেছে, গল্‌গল ক'রে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। সেখানে যারা কাজ করছিল ধোঁয়ায় তাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন, কিছু দেখতে পাচ্ছে না তারা। মিনিট কয়েকের মধ্যেই লেঃ হোয়াইট কণ্ট্রোল রুমে খবর পাঠালো'—আমাদের এখানে ধোঁয়া। কেউ কিছু দেখতে পাচ্ছে না।' সঙ্গে সঙ্গে চাউর হয়ে গেল'—ইঞ্জিন রুমে আগুন লেগেছে।" আমি ছুটলাম সেখানে।

লালর আর জ: আলির পিছু পিছু জাহাজীরা দল বেঁধে চলেছে। তারা এতক্ষণ বিকেলের সিনেমা দেখছিল—পিলুচার, আকুইজাপ, বস্‌ওয়েল, হল্যাণ্ড, ক্রুস, বিয়ার্ডেন, ম্যাক্‌নালী এবং আরও অনেকে ইঞ্জিন-ঘরের দিকে ধাওয়া করল। পরে লালর বলেছিল—"একটু আগে আমি যা দেখে গেছি, আর ফিরে এসে যা দেখলাম—এই অল্প সময়ের মধ্যে এত ধোঁয়া যে কি ক'রে জমলো, দেখেও বিশ্বাস করা যায় না। ধোঁয়া ধোঁয়া সব একাকার। যারা ডিউটিতে ছিল তারা চেঁচাচ্ছে, কাঁদছে, কাসছে, তারা ঘাবড়ে গেছে।"

গোটা নটিলাস এখন সজাগ, সতর্ক। জাহাজের প্রতিটি প্রাণী কাজ করবার জন্য হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। আমি যখন ইঞ্জিন ঘরে পৌঁছলাম তখন ধোঁয়ায় কিছু দেখা যাছে না। শ্বাস প্রশ্বাসেও কষ্ট হচ্ছে। বেশিরভাগ লোকই মুখের ওপর ভিজে তোয়ালে মুড়ে কাজ করছে। অনেকে গগ্‌ল্‌স পরেছে।' যে-যেমন ভাবে পারে চোখ বাঁচাবার ব্যবস্থা করেছে।

আমাদের এখন প্রথম কাজ, এই ধোঁয়ার মূল উৎপত্তি স্থলটা

খুঁজে বার করা। জাহাজে চারটে ধোঁয়া আটকানোর বিশেষ মুখোশ রয়েছে। হল্যাণ্ড আর ম্যাক্‌নালী তার দুটো মুখে এঁটে মই দিয়ে মেশিনারীর গহ্বরে নেমে গেল। সাবধানে হাতড়ে হাতড়ে ওরা চলেছে, ফুটন্ত বাষ্পায় প্রপালসনের আঁচ বাঁচিয়ে চলতে হচ্ছে ওদের। আর কয়েকজন চলেছে ওদের পেছনে আগুন নেভাবার সিওই সরঞ্জাম। পোর্ট সঞ্চারকদণ্ড থামিয়ে দিতে বললাম, আর তার স্টীমটারবাইন ঠাণ্ডা করতে হুকুম দিলাম। আমরা 'স্নরকেল' দিয়ে ধোঁয়াটা বার ক'রে ফেলার অনেক চেষ্টা করলাম—কিন্তু কোন ফল হ'ল না তাতে।

পরিস্থিতি গুরুতর তাতে আর কোন সংশয় নেই। এখন নটিলাসকে ওপরে ভাসাতে হবে। সেখানে উঠে ইঞ্জিন ঘরের তলার পাল্লা খুলে দিলে, সেখান দিয়ে খানিকটা ধোঁয়া বেরিয়ে যাবে। আর, তখন জরুরী কাজের জন্য ব্যবহার্য ডিজেল ইঞ্জিনটাও বন্ধ রাখতে পারবো, তাতেও ধোঁয়া কিছুটা কমবে। অতএব, সেই হিসেবেই হুকুম জারি করলাম।

বরাত জোর মানতেই হয়, ওপরের আবহাওয়া শান্ত। দরিয়ার জলে ঢেউয়ের ঝাপ্‌টা নেই। যে সব লোক এতক্ষণ ইঞ্জিন ঘরে ধোঁয়ায় কাজ ক'রে চোখ রাঙিয়ে ফেলেছে, তাদের ডেক-এ গিয়ে খোলা হাওয়া খেয়ে আসতে বললাম।

ওদিকে হল্যাণ্ড আর ম্যাক্‌নালী ধোঁয়ার উৎস সন্ধানে জাহাজ তোলপাড় ক'রে বেড়াচ্ছে, পাইপের জটাজাল, ভাল্‌ভ, টারবাইন ওদের দেখে আমার মনে হ'ল যেন, র‍্যাটল-সাপের বাসা আবিষ্কারের দুঃসাধ্য সংকল্প নিয়ে জঙ্গলে ঘুরছে দুটি প্রাণী।

কিন্তু আগুনের আসল উৎপত্তি ক্ষেত্র ওরা বের ক'রে ফেলল। পোর্টের হাই-প্রেসার টারবাইনের ওপরের আবরণটা দীর্ঘ দিন কাজ ক'রে জীর্ণ হ'য়ে গেছে, তার গা তেলে ভিজে জবজবে হয়ে ছিল। দ্রুতবেগে উষ্ণ জল চলাচলের ফলে দপ্‌ ক'রে আগুন লেগে গেছে।

বড় ছুরি, প্যাঁচ-সাঁড়াসী দিয়ে হল্যাণ্ড আর ম্যাক্‌নালী ওই আবরণের ছালটা ছিঁড়ে-ফেড়ে খুলে দিল। ফাঁক পেয়ে ধক্‌ ক'রে

তিন-চার ফিট উঁচু আগুনের শিখা লাগিয়ে বেরিয়ে এল—ওদের মুখ প্রায় ঝলসে দিয়েছিল, একটুর জন্যে বেঁচে গেল ওরা। আগুন নেভানোর যন্তর নিয়ে যারা অপেক্ষা করছিল, তারা সিও২ এর তরল ফেনা ছড়াতে লাগলো। সাবধানে, হ্যাঁ, নইলে তাদের আপন লোকের গায়েই হয়তো এই ফেনা পড়বে। এই ফেনার বৈশিষ্ট্যই হল, যা কিছু এর সংস্পর্শে আসবে তা-ই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। অতএব এর ছোঁয়া লাগলে ওরা দু'জনে রীতিমত জখম হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ইঞ্জিন ঘরে যারা ছিল তারা কাশছে, বমি করছে—ঘরের ভেতরে দশ-পনের মিনিটের বেশি টিকতে পারছে না। ওদের মধ্যে পিল্চার ত টলতে টলতে বেরিয়ে এসে ডেকের উপর মুখ থুবড়ে পড়ল। জ্ঞান ফিরে এলে পরে সে বলল যে, কি করে যে বেরিয়েছিল সে বা উল্টে পড়ে গিয়েছিল কখন কিছুই জানে না। আর কতো জনে যে বমি করল তার হিসেব নেই। যাই হোক, দু'জনে মিলে হাতড়ে হাতড়ে ছোট ডিজেল ইঞ্জিনের কণ্ট্রোলটা খুঁজে বার ক'রে সেটা বন্ধ করে দিতে ধোঁয়া কিছুটা কমল। সার্চ আর কালাহানকে ডেকের উপর দিকে থাকতে বললাম, আবার কেউ হুমড়ি খেয়ে পড়বার আগেই ওরা তাকে সামলাবে।

নিচে তখনও জ্বলন্ত আস্তরণের ছালগুলো তখনো ছাড়ানো হচ্ছে, কয়েক মিনিট অন্তর এই কাজে লোক বদলানো হচ্ছে। কাজটা যেমন বিপদ জনক, তেমনি দুঃসাধ্য, আর মনে হচ্ছে যেন এর শেষ নেই। পোড়া আস্তরণ আর সিও২-এর শাদা ফেনায় জাহাজের তলাটা ভরে উঠল। চার-ঘণ্টা ধরে ইঞ্জিন বিভাগ, ইলেক্ট্রিক বিভাগ এবং অন্যান্য শাখার লোকেরা মিলে মেহনত ক'রে আগুনটা শেষ পর্যন্ত নিভিয়ে ফেলল।

দুর্ঘটনাটা আরও মারাত্মক হ'তে পারত, কিন্তু নটিলাসের সুশিক্ষিত কর্মী জাহাজীদের তৎপরতার ফলেই ব্যাপারটা অল্পের ওপর চুকে গেল। এবারের আগুন নেভানোর কাজে যে দু'জন লোককে সবচেয়ে বাহাদুরী দিতে হয় সেই কুক্কস এবং বিয়ার্ডেনই গত বছর পেরিস্কোপ জ্বালাই-এর কাজে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল।

আজকের এই আগুন আমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল, যেন গালে চড় মেরেই বলল, বরফের তলায় এই অগ্নিকাণ্ড ঘটলে কি হ'ত? সে-রাতে

বিছানায় শুয়ে ভাবতে ভাবতে শিউরে উঠলাম—এই ক্ষুদে অগ্নিকাণ্ডটা যদি বরফের তলায় ঘটত তাহলে আমাদের ওপরে ওঠার কোনো পথই সেখানে খোলা পেতাম না। তার মানে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে নটিলাস নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

অতএব এখন আমাদের আগুনের বিপদটা খেয়াল রেখে সেই মতো তৈরী হয়ে নিতে হবে। জাহাজের অন্দিসন্দি ভালোভাবে খুঁটিয়ে দেখে নিতে হবে। বরফের নিচে হঠাৎ দরকার পড়লে আগুনের মধ্যে কাজ করবার সময় যাতে জাহাজীরা শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারে তার বিশেষ বন্দোবস্ত রাখতে হবে।

সান্‌ফ্রান্সিস্কোতে পা দিয়েই জাহাজ-ব্যুরোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসলাম। তারা এত তাড়াতাড়ি নটিলাসের ওপর ধোঁয়া-বিজয়ী শ্বাসযন্ত্র বসিয়ে দিল, এগুলো রেগুলেটারের প্রণালীতে কাজ করবে। বাতাস সরবরাহের জন্য জাহাজের বায়ুভাণ্ডারের সঙ্গে সরাসরি যোগ থাকবে। হাতে সময় বেশি নেই, তাই কেবলমাত্র যারা কণ্ট্রোলে কাজ করবে তাদেরই মতো বন্দোবস্ত করা গেল। যদি বরফের তলায় থাকার সময়ে আগুন লাগে তাহলে এরা চেষ্টা করলে জাহাজকে বাঁচাতে পারবে। কিন্তু জাহাজের বাকী দুই তৃতীয়াংশ আরোহী পুড়ে মরবে। আমাদের জাহাজে অগ্নিপ্রতিষেধক কার্যসূচী বলবৎ ক'রে দিলাম, ইতিপূর্বে এমন ভাবে কোনো সাবমেরিনে এইভাবে আগুন না লাগার দিকে কড়া নজর দেওয়া কেউ ভাবেনি।

জাহাজঘাঁটি ছাড়বার আগে ভালোভাবে জাহাজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যেখানে যতো জীর্ণ আস্তরণ ছিল, যা তেলে ভিজে গিয়েছে সব পাল্টে নতুন 'ইন্‌সুলেশন' চড়ানো হল—দিন রাত কাজ চলল।

এদিকে সেই কন্‌ডেন্সারের ছিদ্রটা অনুসন্ধান চলল, কন্‌ডেন্সারের যে ছেঁদা দিয়ে সমুদ্রের লোনা জল চোঁয়াচ্ছে সেটা খুঁজে বার করার জন্য আচ্ছা আচ্ছা তকমা আঁটা উমদা ইঞ্জিনিয়ারেরা আমাদের সমস্যা সমাধানে হাত লাগালেন। জাতির সেরা লোক এঁরা, কিন্তু এই ধাঁধাঁর উত্তর তাঁরাও বার করতে পারলেন না। প্রতিটি ইঞ্চি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা হ'ল। কিন্তু ফাটল বা ছেঁদা কিছুই ধরা পড়ল না। আমার মহাসঙ্কট উপস্থিত। বরফের

তলায় বড় রকমের বিপদের চেয়ে এখন আমার দুর্ভাবনা, ওয়াশিংটনে এ খবর পৌঁছলে সেখানকার কেউ যদি ব'লে বসেন যে, এতবড় বিপদের ঝুঁকি নিয়ে নটিলাসের যাওয়ার দরকার নেই। ব্যস, তাহলে আমাদের এতদিনের উদ্যোগ, আয়োজন, আশা, সব বরবাদ! সফর নাকচ!

আমাদের এই ধরণের "একান্ত গোপন" সফরে অনেক উদ্ভট অবস্থার উদ্ভব হয়। কিন্তু এই কাজে নেমে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যা ঘটেছে তার দোসর নেই। সানফ্রান্সিস্কোতে বসেই 'চূড়ান্ত গোপন' ডাকে মেরু অববাহিকার নক্সাগুলো পেলাম! কিন্তু এই ডাকের মারফতে আমাদের 'শুভযাত্রার' নির্দেশপত্র আনিয়ে নিতে ভরসা হ'ল না। ডঃ লয়েন যে শেষমুহূর্তের সাক্ষাতের জন্য ওয়াশিংটনে রয়েছেন সেটা জানি! তাই পেণ্টাগণের যোগাযোগ ক'রে জানিয়ে দিলাম, ডঃ লয়েন যেন সনদ পত্রটা সঙ্গে নিয়ে পশ্চিম উপকূলে চলে আসেন। এদিক থেকে আমি উড়ো জাহাজে লস এঞ্জেল্‌সে চলে যাবো। অছিলা, নর্থ আমেরিকান প্ল্যান্টের এঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে 'ইনার্সিয়াল নেভিগেটর সম্পর্কে জরুরী কথা কইতে হবে। আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ডঃ লয়েন যখন সান্ ডীয়েগোর সবার জন্য প্লেন বদল করবেন সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর কাছ থেকে নিজে হাতে হুকুমনামাটা নিয়ে নেবো।

উড়োজাহাজে জায়গা পেতে দেরী হয়ে গেল। আমি যখন সন্ধ্যে বেলা সাধারণ নাগরিকের পোশাকে লস্ এঞ্জেল্‌সে পৌঁছালাম তার আগেই ডঃ লয়েনের প্লেন ছেড়ে গেছে। হুকুমনামা তাঁর সঙ্গেই চলে গেছে। টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে কথা কইলাম, তাঁকে সান্‌ডায়েগোর বিমান বন্দরে সনদ নিয়ে অপেক্ষা করতে অনুরোধ জানালাম, এ ছাড়া উপায়ই বা কী!

তারপর টিকিট ঘরে গিয়ে সান্‌ডায়েগোর যাওয়া-আসার টিকিট চাইলাম। জায়গা পেলাম যে জাহাজটায় সেটা সান্‌ডায়েগোতে মাত্র পনের মিনিট থেকেই আবার এখানে ফিরবে।

টিকেট এজেণ্ট জিগ্যেস করল—"আপনি কোন্ প্লেনে ফিরতে চান? বললে, সে ব্যবস্থাও করে দিতে পারি।"

"ওই প্লেনেই ফিরতে চাই আমি।"

সে আবার বললে—"ওটা ত পনের মিনিট মাত্র থাকবে।

সে আমার মুখের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তার নজরে আমার খেয়াল হ'ল যে, সাধারণতঃ সান্‌ডায়েগোতে কেউ যায় না। সে হয়ত ভেবে নিল যে হয়ত আমি কোনো মাদক দ্রব্য কিম্বা রেসের 'টিপ্‌স্' আনবার জন্যেই সেখানে যাচ্ছি।

অবিশ্যি সে আর জেরা করে নি আমাকে।

ডঃ লয়েন আমার জন্যে বিমান বন্দরেই অপেক্ষা করছিলেন।

একটা নির্জন বেঞ্চে বসে আমার কাগজপত্র সই করে নিলাম। তারপর কিছু দরকারী কথাবার্তা সেরে প্লেনে উঠে লস্ এঞ্জেল্‌সে ফিরলাম। নটিলাসে যখন পৌঁছলাম তখনও ভোর হয়নি।

এঞ্জিনিয়াররা তখনো নটিলাসের কন্‌ডেন্সারের গায়ে সেই ছিদ্রটা আবিষ্কারে ব্যস্ত। ওরা কিছু পায় নি।

এদিকে সময় ঘনিয়ে আসছে। আমার ভয় হল যদি এখন রওনা না হই তাহলে হয়তো এখানে মাস খানেক আটকে থাকতে হবে। আমাদের জাহাজের ওপর আমার আস্থা আছে। যদি কন্‌ডেন্সার একেবারে অকেজোই হয়ে পড়ে তাতেও আমাদের মেরু অভিযান সফল হওয়া আটকাবে না। অতএব হকস্মাৎ সিদ্ধান্ত ক'রে ফেললাম, পরদিন সকালেই নটিলাস ডক ছাড়বে। স্থানীয় নৌ-অধ্যক্ষকে আমার অভিপ্রায় জানিয়ে দিলাম।

জানি তিনি আমার চেয়ে অনেক বড়দরের অফিসার তবু আমার সংকল্পটুকু ছাড়া বেশি কিছু জানানো সম্ভব হ'ল না, কেন যাচ্ছি এত তাড়াহুড়ো করে সেটা ত বলার উপায় নেই।

বন্দরের অনেক এঞ্জিনিয়ার আমাদের জাহাজের ছিদ্র অনুসন্ধানের চেষ্টায় প্রচণ্ড মেহনৎ করেছে। তারা জনৈক এ্যাণ্ডারসনের খামখেয়ালীতে খুব বিরক্ত হয়েছিল। কন্‌ডেন্সারের ফুটো দিয়ে জল চোঁয়াচ্ছে ঠিকই, কিন্তু আমরা নিজের ভাগ্যের উপর আত্মসমর্পণ করে ডুব দিয়ে চলেছি এগিয়ে। এখন সিয়াটলের পথে আমাদের সফর, সেখান থেকে অভিযান পর্ব আরম্ভ হবে। চলতে চলতে আমার দুচোখ ঘুরে মরল সেই সব মাছের ঝাঁকের

বৃথা সন্ধানে। ওরা আমাদের যাত্রার শুভ সূচনার সঙ্কেত ঘোষণা করবে! কিন্তু তাদের কোনো চিহ্নই মিলল না। এর উপর আমরা যখন পাগেট সাউণ্ডে প্রবেশ করলাম, তখনই আমাদের জাহাজ মৃত্যুর স্পর্শে বিষণ্ণ হয়ে উঠল। নটিলাসে এই প্রথম মৃত্যু। আমাদের জাহাজের ধুরন্ধর টর্পেডোম্যান বিয়েডোর জারুজিন্‌কি মস্তকের রক্ত ক্ষরণে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল।

॥ তের ॥

সিয়াট্‌লে যাবার পথ আমার নানা কাজ আর উদ্বেগ-ভাবনায় আবৃত ছিল। আর সব ছাপিয়ে ওই কন্‌ডেন্সার-প্রণালীর ছিদ্রটা আমার দুশ্চিন্তার প্রধান কেন্দ্র হয়ে রইল। যদিও ওয়াশিংটনে এই ব্যাপারে সে বিবরণ পাঠানো হয়েছে তাতে আশ্বাসের ভাবটাই প্রবল, তবু সোজা কথায় আসল তথ্য এই যে, লোনা জল চোঁয়ানো আমরা বন্ধ করতে পারি নি। এ নিয়ে আমি পল আর্লির সঙ্গে দিনে দু-তিন দফা আলোচনা করি, কিন্তু মাথা খুঁড়ে কোনো হদিস বার করতে পারি নি।

আমাদের সিয়াট্‌লে পৌঁছতে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকী রয়েছে। এর মধ্যে আমি, আমার জাহাজের লোকেরা আর সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোর বিশেষজ্ঞরা যতো রকমে চেষ্টা সম্ভব ক'রে হেরে গেছি।

অনেক ত হ'ল! ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে গেল আমার শ্বশুর মশাইএর কথা। তিনি একটা বড় প্রতিষ্ঠানের রাসায়নিক গবেষক। একটা রবিবারে তাঁর সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছিল হঠাৎ তার কথা মনে পড়ে গেল আমার মাথায় একটা উদ্ভট মতলব খেলে গেল। জানি আমার কথা শুনলে লোকে হাসবে। তবু, আর সবই ত পরখ করে দেখা হয়ে গেছে, এটাই বা বাকী থাকে কেন!

পল্ আর্লিকে আমার ঘরে ডেকে বললাম—"ভাখো পল, আমরা সিয়াট্‌লে থামলে পরেই তুমি কয়েকজন লোককে সাধারণ নাগরিকের পোশাকে শহরে পাঠিয়ে দেবে, বুঝলে! তারা এক একজন এক একটা গ্যাসোলিনের দোকানে যাবে। তাদের কাজ, মোটর গাড়ির রেডিয়েটরের ফুটো বন্ধ করে যে-জিনিস দিয়ে তাই কয়েক কৌটো

ক'রে কিনে আনা। কি যেন বলে সে জিনিসটাকে—ছেঁদা-সারাই, না কি?"

আর্লির ঠোঁটে বাঁকা হাসি ঝিলিক দিল। বুঝলাম, আমি বিদ্রূপ করছি, না সত্যিই গুরুত্বসহকারে বলছি, সে ঠিক ধরতে পারছে না।

আমি গম্ভীরভাবে বললাম—" না, না, ঠাট্টা নয় পল। সত্যি বলছি, ধরো আমাদের ত্রিশ গ্যালন আন্দাজ ওই জিনিস দরকার। এক কৌটোয় এক কোয়ার্ট আন্দাজ মাল থাকে। তা যদি হয় তবে আমাদের অনেকগুলো কৌটো দরকার, কি না বলো! আর হ্যাখো, তোমার লোকগুলোকে বারণ করে দিয়ো, নটিলাসের নাম যেন তারা মুখেও না আনে। একেবারে গোপনে কাজ সারতে হবে, হাঁ!"

আর্লি পরমোৎসাহে জবাব দিল— "আচ্ছা, তাই হবে ক্যাপ্টেন সাহেব!"

সে বুঝেছে যে আমি রসিকতা করছি না।

"তারপর, ওগুলো এসে পড়লে কি করতে হবে জানো? একেবারে কনডেন্সার প্রণালীর মধ্যে ঢেলে দেবে। যেভাবে মোটরগাড়ির রেডিয়েটরে দেওয়া হয়—বুঝলে! আর হ্যাখো, বেশি ক'রেই আনাও। পথের জন্যে যেন থাকে খানিকটা।"

ছিদ্ররোধ অভিযানের দায়িত্বটা আর্লি চাপিয়ে দিল প্রধান স্টুয়ার্ড নেল্‌সনের ঘাড়ে। জাহাজ নোঙর ফেলামাত্র আধ ডজন জাহাজীকে, সাধারণ বেশে শহরে পাঠিয়ে দিল। আমার ত মনে হয়, শহরে যতগুলো ছেঁদা বোজানোর কৌটো ছিল, তার একটিও রেখে আসে নি ওরা, একশ চল্লিশটা কৌটো কিনে এনেছে। তার অর্ধেকটা কনডেন্সারে ঢালা হল আর্লির তত্ত্বাবধানে। কি অপূর্ব দৃশ্য! দশ লক্ষ ডলারের নটিলাস, যা অধুনাতম বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের সেরা নমুনা, আনবিক শক্তি যার মুঠোর মধ্যে, তার কনডেন্সারের ছেঁদা বোজানোর জন্য যে বস্তু প্রয়োগ করা হচ্ছে তার দাম দু-ডলারও নয়! কিন্তু এটা আমাদের কাছে মোটেই হাসির ব্যাপার নয়। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমরা জানি যে এরই ওপর হয়তো আমাদের মেরু অভিযান নির্ভর করছে।

যাই হোক, আপাতদৃষ্টিতে উদ্ভট হলেও এই ছেঁদা বোজানো প্রক্রিয়ায় কাজ হল। যে ভাবেই হোক জল চোঁয়ানো বন্ধ হয়ে গেল। সিয়াট্‌লে ত নয়ই, আমাদের সারা পথে আর এই সমস্যা দেখা দেয় নি। এমন কি, আমি যখন এই বিবরণী লিখছি তখনো পর্যন্ত কন্‌ডেন্সারে ছেঁদা হয় নি। হয়তো অন্য কোনো কারণে, হয়তো বা সান্‌ফ্রান্সিসকোর বিশেষজ্ঞদের চিকিৎসার ফলেই কন্‌ডেন্সারের রোগটা সেরে গিয়েছিল। কিন্তু নটিলাসের কেউ সেকথা মানবে না, কিছুতেই নয়। দুনিয়াতে এরাই বোধ হয় ছেঁদা-সারাইএর সবচেয়ে বড় তারিফদার।

আমরা সিয়াট্‌লে থাকতে থাকতেই আমার মনের তলার আর একটি পরিকল্পনাকে প্রকাশ্যে কাজে লাগালাম। যাত্রার প্রাক্‌কালে শেষ মুহূর্তের পর্যবেক্ষণটা জরুরী। অর্থাৎ এখান থেকে আকাশ-পথে বেরিং প্রণালী এবং আলাস্কার কাছাকাছি অঞ্চলে বরফের বর্তমান অবস্থাটা পরখ করে নিতে হবে। এটাও গোপনেই সারতে হ'ল। সিয়াট্‌লে জাহাজ থামার কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি সাধারণ বেশে বেরিয়ে এলাম। গ্যাংওয়ের পথে কমিটির সঙ্গে দেখা হ'ল। তাদের অভিবাদন ক'রে, জরুরী কাজের অছিলায় পথে নেমে পড়লাম। ডঃ লয়েনের সঙ্গে দেখা হ'ল। আগেকার বন্দোবস্ত অনুসারে আমরা দু'জনে মিউনিসিপ্যাল বিমান বন্দরে হাজির হ'লাম। তিনি আগে থেকেই উড়ো জাহাজে জায়গা রক্ষিত ক'রে রেখেছিলেন। এটা বাণিজ্যিক বিমান, কয়েক মিনিটের মধ্যেই আলাস্কা অভিমুখে যাত্রা করবে।

এই যাত্রার জন্য আমার পৃথক নাম, পরিচয়-পত্র তৈরী ছিল। আমি এখন ডঃ লয়েনের সহবর্তী একজন বিশেষজ্ঞ, নাম চার্লস হেণ্ডারসন, সান্‌ ডায়েগোর নেভাল ইলেকট্রনিক্‌স ল্যাবরেটরীতে কাজ করি। যেহেতু ডঃ লয়েনের যা পেশা তাতে আলস্কার বরফের অবস্থা পর্যবেক্ষণটা খুব স্বাভাবিক কাজ এবং যেহেতু এখনো পর্যন্ত নটিলাসের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ কোনো সম্পর্ক নেই সেহেতু নিজের আসল নামে তাঁর পরিচিত হওয়ায় আটকাচ্ছে না।

সিয়াট্‌লে উড়ো জাহাজে ওঠবার সময় তিনি আমায় বললেন-"মশাই, যা কাণ্ডকারখানা ঘটছে তা এতকাল কেবল গল্পের বইতেই পড়েছি।"

ফেয়ারব্যাঙ্কস পর্যন্ত পৌঁছে সেখানে রাত কাটালাম। তারপর সেখান থেকে নোম-এ এসে ভ্রমণকারীদের সঙ্গে দলবেঁধে বাসে চড়ে শহর ঘুরে দেখলাম। নোম থেকে আবার প্লেনে করে আমরা উত্তরে ছোট একটি গ্রামে পৌঁছলাম। গ্রামটির নাম কোটেজবু। এখানে ডঃ লয়েন একখানা ছোট প্রাইভেট্ বিমান বন্দোবস্ত করে রেখেছেন।

আমরা যখন হাজির হলাম তখন বিমানের পাইলট আর্নি কেয়ার্ণস তার ইঞ্জিন নাড়াচাড়া করছে।

আমাদের দেখে সে বলল—"সবই ভালো করে দেখে নিয়েছি বুঝলেন। একটু অপেক্ষা করুন, চড়বার আগে এই ইয়েটা সেরে নেওয়া ভালো, বুঝলেন!"

তা বটে, ফড়িং-এর মতো ক্ষুদে এরোপ্লনটা দেখেই মনে হচ্ছে যে ওকে সামলে সমঝে চলা দরকার। পায়চারী করতে করতে ডঃ লয়েনকে বললাম—"এমনি যদি বা বাঁচতাম, এই উড়ো যাত্রাব নিরাপত্তা ব্যবস্থাই আমাদের মারবে, বুঝলেন ডক্টর।"

অবশেষে আমরা বেরিং প্রণালীর দিকে রওনা হলাম। সেখান থেকে, যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত সীমান্তভূমি পয়েণ্ট ব্যারোর দিকে। কেয়ার্নের কাছে শুনলাম, গোটা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মাত্র আমরা এই দুজন বৈজ্ঞানিক নৌবিভাগের জন্য তথ্য সংগ্রহ করছি। আমি এখানেও ডঃ লয়েনের সহকারীর পরিচয়ে চলছি।

আমি কি মেজর কীটিং-এর মতো হয়ে যাচ্ছি? নিজের বক্তৃকারখানা ভেবে আমি মনে মনে হাসছি। এখন আর সে নটিলাসে নেই, থাকলে হয়তো এই ব্যাপারে তার কাছে পরামর্শ চাইতাম।

এই একরত্তি এক ইঞ্জিনের প্লেনে চড়ে কখনও বা মাটি থেকে পঞ্চাশ মাইল দূর দিয়ে উড়ে চলেছি এক এক সময় মনে হচ্ছে প্রাণটা বুঝি ঠোঁটের ডগায় এসে পড়েছে, খাবি খাচ্ছি ভয়ে। কিন্তু কাজ ঠিকই করছি, আমরা কেবল তথ্য সংগ্রহ করে চলেছি, নিরন্তর খবর জমা করছি। অনেক জায়গায় খোলা জলের সন্ধান পেলাম, আমাদের সম্ভাব্য বরফযাত্রায় এগুলো পাবো আশার কথা বই কি। মোটের ওপর যা দেখলাম তাতে

উল্লাসের কিছু নেই, পথ বিঘ্নবিপদ সঙ্কুল—তবে এত বড় অভিযানের জন্য এটুকু ঝুঁকি ত নিতেই হবে।

আমাদের এই ছোট্ট পরিক্রমাতেও নাটকীয়তা কিছু কম জোটে নি। যাত্রার ফিরতি-মুখে হঠাৎ আমাদের প্লেনের তেল ফুরিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি কেয়ার্ন নিকটবর্তী বিমান বাহিনীকে রেডিয়োযোগে বিপদের কথা জানিয়ে ডিইউ-র বিমানক্ষেত্রের মাটিতে নামবার অনুমতি চাইল। বিমান বাহিনী জানতে চাইল—"তোমাদের প্লেনে যাত্রী কারা?"

কেয়ার্ন বলল— "দু'জন নাগরিক।"

বিমান বাহিনা— "অনুমতি দেওয়া চলে না।"

এই সমস্যার সমাধান শেষে কেয়ার্নই করল। ছোট একখানা এস্কিমোদের গ্রাম, আলাস্কার মধ্যেই সেটা পড়ে—তার কাছাকাছি একটা জায়গায় সে নেমে পড়ল। এটা নাকি আমাদের হুদ্দোর মধ্যেই পড়ে। কেয়ার্ন তার ছোট প্লেনখানা সমুদ্রতীরের বালিতে নামালো। এরই কয়েক মাইল দূরে অনেককাল আগে উইল রজার্স, আর উইলি পোষ্ট তেল ফুরিয়ে যাওয়ায় নামতে গিয়ে মরেছিল। সেখানে নেমে তেল ভর্তি করে নেওয়া হ'ল, তারপর ছ'জন এস্কিমোতে মিলে প্লেনটাকে নরম বালি থেকে ঠেলে আনলো আর কেয়ার্ন আবার প্লেনটাকে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিল।

আমরা পয়েণ্ট ব্যারোর পিছল বিমান-ভূমিতে নেমে লিমোসিনে চড়লাম। গাডিখানা যেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিল, এমনই তার চেহারাসুরৎ। ব্যারোর হোটেলটা সেকেলে কুঁড়ের মতো। এর মালিক একজন স্কুলের শিক্ষিকা, তিনি মিসিসিপি থেকে গ্রীষ্মকালে এখানে এসে থাকেন। এখানে আমি চার্লস হেণ্ডারসন নামে পরিচয় দেখালাম। হোটেল থেকে বেরিয়ে এস্কিমোদের আস্তানায় খেতে গেলাম। এখানে খাবার-দাবার বেশ আক্রা, হ্যামবুর্গারের জন্যে এরা এক ডলারেরও বেশি দাম নিল। তবে হ্যাঁ বেশ ভালো জিনিস। একটা বুক্-বক্সের চারপাশে বসে এস্কিমোরা কফি খাচ্ছে আর গান শুনছে। আমরা হোটেলে ফিরলাম তখন ভোর একটা, কিন্তু তখনো দিনের আলো রয়েছে। নটিলাসে ফিরে এলাম রবিবার, জুনের আট তারিখ।

জাহাজে ফিরে দেখলাম, ক্যাপ্টেন জ্যাক কিন্‌সৌ (ইনি স্বর্গতঃ যেন-শাস্ত্রী কিন্‌সের আত্মীয় নন) পৌঁছে গেছেন—মেরু অঞ্চল ডুবো-জাহাজ পরিকল্পনার ইনি মনস্তত্ত্ববিদ। আমাদের অভিযাত্রার সঙ্গে ইনি সংশ্লিষ্ট। ডাক্তার এবং মনস্তত্ত্ববিদ হিসেবে নৌ-বিভাগে এর খুব হাতযশ। আমরা যে দীর্ঘদিন ধরে নৌ-বহরের জন্য তথ্য সংগ্রহের কাজে ডুবো-যাত্রায় ব্যাপৃত থাকব মেরু অঞ্চলে, এই কথাটা জাহাজের লোকদের বোঝানোই এর কাজ। এতদিনের ডুবো-যাত্রার অস্বাভাবিক অবস্থায় যদি কারও মনে তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, সেই সমস্যার ক্ষেত্রে তিনি চিকিৎসাপত্র করবেন। এইজন্য তাঁকেও জাহাজে থাকতে হচ্ছে। আমি জাহাজে পৌঁছাবার আগেই, তিনি এখানে পা দেবার পরই একজন মাতব্বর তাঁকে নাকি বলেছিল—"দেখুন ক্যাপ্টেন মশাই, যাত্রা শুরু হবার আগে হয়তো আপনি আমাদের কৌচে শুষে ফেলতে পারেন। কিন্তু একটা কথা জেনে রাখুন, যাত্রা শেষ হওয়ার অনেক আগেই আপনাকে আমরা কৌচে শুইয়ে ফেলব!" কিন্তু যেহেতু জাহাজে কোনো কৌচ ছিল না সেহেতু ব্যাপারটার শেষ পর্যন্ত কোনো ফয়সলা হয় নি।

এর আগে অনেক মনস্তত্ত্ববিদ নটিলাসে এসেছেন এটা-সেটা পরখ যাচাইএর সদুদ্দেশ্য নিয়ে, কিন্তু নটিলাসের জাহাজীরা তাঁদের গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে নি। একবার একজন এলেন, তাঁর সঙ্গে ছোট একটি বাক্স নিয়ে। বাক্সটার মধ্যে একটি ছিদ্র রয়েছে। সেই ফুটোর মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে দিতে হবে জাহাজীকে। যদি তার আঙুল কাঁপে, তাহলে সেটা বাক্সের গায়ে ঠেকবে, সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় তার কম্পনের মাত্রা-অঙ্ক ধরা পড়বে। প্রতিদিন প্রত্যেক লোককে ওই বাক্সের ফুটোতে আঙুল দিয়ে পরীক্ষা করা হ'ত। বিশেষজ্ঞের মত এই যে, নটিলাস যত বেশি দিন জলের তলায় থাকবে জাহাজীদের আঙুলের কম্পন-দ্রুতি ততই বাড়বে। জাহাজীরা এই পদ্ধতির নাম দিয়েছিল, "কাঁপুনে বাক্স।"

এক বিচ্ছু ক্ষুদে অফিসার, আর সব জাহাজীর মতোই এই পদ্ধতিকে বুজরুকী ঠাউরে নিয়ে খুব চালাকী করল। প্রথম দিনেই সে জোরে জোরে আঙুল কাঁপালো, ৫৫০০ বার কম্পন মাত্রা তুলে দিল সে। কিন্তু তারপর রোজই তার কম্পনমাত্রা কমতে থাকল। তার হাত ক্রমশঃ স্থির হয়ে

আসতে লাগল। এবং শেষ দিনে তার আঙুল মোটেই কাঁপল না। বিশেষজ্ঞের সব মতামত সে উল্টে দিল। আজও নটিলাসের লোকেরা সে গল্প করে।

আর একজন মনস্তত্ত্ববিদকে ওরা কিভাবে জ্বালিয়েছিল সে গল্প এখনও করে। জন টিক্সেরিয়া ছিল কোয়ার্টার মাস্টার, একজন ওস্তাদ নাবিকও বটে। মনস্তত্ত্ববিদ মশাই জাহাজে গুছিয়ে বসে তাঁর 'অনুধাবন, পর্যবেক্ষণ পর্ব' শুরু করার পর থেকেই টিক্সোরিয়া তাঁর পিছনে লাগল। কোথা থেকে 'ক্যামেল' মার্কা এক বাক্স সিগারেট জোগাড় ক'রে সে, একটা লম্বা সুতো দিয়ে প্যাকেটটা বাঁধল। মনস্তত্ত্ববিদ মশাইকে আসতে দেখলে, কিম্বা তিনি আসবেন টের পেলেই, সে করত কি প্যাকেটটা জাহাজের মেঝেতে ফেলে দিয়ে সুতোটা ধরে টানত আর বলত—"আয়, আয়, উটের বাচ্ছা, চলে আয়।" আর ঘুরে ঘুরে দেখত উটটা আসছে কি না। খাবার সময়ে সে সুতোর বাঁধা প্যাকেটটাকে খাবার ঘরে এনে একটা জায়গায় বেঁধে রাখত, সেটা নাকি উট বাঁধার খুঁটি। হয়ত একজন জাহাজী বলল—"আঃ, টেক্স খাবার সময় উটটাকে আবার এখানে আনলে কেন? ওকে হটাও বাপু। ওকে দেখলে আমার অরুচি হয়।" আবার কেউ হয়তো খাবারের প্লেট থেকে কল্পিত উটের গায়ের মাছি তাড়াতো। শেষে টেক্স হাল ছেড়ে দিয়ে, বিরস বদনে তার উটকে খাবার ঘর থেকে সরিয়ে নিয়ে যেত, বলত—"আচ্ছা ভাই, তোমরা বেজার হচ্ছ কেন? আমি উটকে সেই টর্পেডো ঘরের খুঁটিতে বেঁধে রেখে আসছি, তাহলেই ত হবে! দাঁড়াও না, যখন কায়রোতে গিয়ে পড়বে, তখন ত এর ঘাড়ে তোমরাই চড়বে।"

নটিলাসের লোকেরা বলে যে, জাহাজটা বন্দরে ভিড়তে তর সয় নি—মনস্তত্ত্ববিদ মশাই সোজা কেটে পড়লেন। তারপর আর তাঁকে বা তাঁর অনুধাবনের বিবরণীর পাত্তা পাওয়া যায় নি।

আমাদের জাহাজে এখন 'ছেঁদা-সারাই' মজুত, আর ডাঃ কিন্‌সেও হাজির—এবার আমরা ডুবযাত্রায় রওনা হবার জন্য তৈরী। সেই দিন, অর্থাৎ রবিবার আটই জুন, বিকেলের দিকে আমি আকাশ-পাতাল উদ্বেগে উতল, আমার স্টেটরুমে বসে কালো কফিতে চুমুক দিতে দিতে অধীর আগ্রহে ওয়াশিংটনের হুকুমের প্রতীক্ষা করছি। কি নির্দেশ আসবে?

আমাদের প্রচারিত সাধারণ কর্মসূচী অনুযায়ী যাত্রা করতে হবে? না কি মেরু অভিযানের নির্দেশ?

যখন এগিয়ে যাবার হুকুম পেলাম তখন সমস্যা হ'ল, এখন কোথায় পাবো ডঃ লয়েনকে, কোথায় পাবো তাঁর সহকারী রেক্স রাউরিকে। তাঁরা ট্যাকোমার কোনো হোটেলে গা-ঢাকা দিয়ে বসে রয়েছেন—যাতে জাহাজের কেউ তাঁদের পাত্তা না পায়।

নৌ-বহর আর বৈজ্ঞানিক মহলে এই ধারণা প্রকট যে, একটা সাবমেরিনের সঙ্গে ডঃ ওয়াল্ডো লয়েন থাকা মানেই একটি মেরু অভিযান। সেই জন্যে আমি মতলব এঁটে রেখেছি যে তাঁকে একেবারে শেষ মুহূর্তে জাহাজে তুলবো—নৌ-বিভাগের ফটোগ্রাফার আমাদের যাত্রার ছবি তোলা চুকোলে পর। একবার যদি জাহাজের গ্যাংওয়েতে ডঃ লয়েনের ফোটো খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়, তাহলে আমাদের গোপন কথা সব ফাঁস হয়ে যাবে। আর যদি ডঃ লয়েন আর তাঁর সাকরেদকে আগে থেকে জাহাজে তুলি তাহলে জাহাজীরা ত বটেই, অন্য লোকেও আমাদের মতলব টের পেয়ে যাবে।

যা-ই হোক, অনেক ভেবে চিন্তে একটা সাঙ্কেতিক ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিলাম। এদিকে সব গোছগাছ ক'রে নিয়ে সেই সঙ্কেত দেওয়ামাত্র তাঁরা দু'জনে জাহাজে উঠে এলেন। যে-সময়ে আমার জাহাজের লোকেদের একত্রে জড়ো ক'রে একজিকিউটিভ্ অফিসার, কার কি কর্তব্য বোঝাচ্ছেন, সবাই যখন পানামা যাত্রার হিসেব নিয়ে ব্যস্ত, সেই সুযোগেই ওঁদের স্টেটরুমের মধ্যে পুরে দরজা বন্ধ ক'রে দিলাম। লেঃ ফেনৃকার বাঁকা মন্তব্য করল—"এই দুটো লোকই পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম বন্দী হ'ল যাদের উত্তরমেরুর পথে জাহাজের নাবিক হিসেবে বাধ্যতামূলক ভাবে কাজ করানো হবে।"

টারবাইনের সামান্য গোলযোগের দরুণ আমাদের রওনার বিলম্ব হ'ল। রাত দুপুর পর্যন্ত বন্দরে কাটল। এমন হয়েই থাকে, বেশিক্ষণ প্রপাল্‌সনের চক্রপ্রণালী বন্ধ থাকলে, এটা চালু করতে বেগ পেতে হয়! সেজন্য নটিলাসের জাহাজীরা উড়ো-জাহাজীদের মতো বলে—"প্লেনকে মজবুত রাখতে হ'লে তাকে সর্বদা আকাশে উড়িয়ে রাখো।"

মাঝ থেকে ডঃ লয়েনের বন্দীদশার কাহিনী বেড়েই চলল। কিন্তু

নিরুপায়। লেঃ শেপ, জেঙ্কস, লুকিয়ে ছাপিয়ে কয়েকটা লেবু আর আপেল তাঁদের দরজা গলিয়ে দিয়ে এল, বেচারাদের পেটের জ্বালা থেকে বাঁচাবার জন্য। আর শূন্য বোতলও কয়েকটা দিয়েছিল, কারণটা সহজেই আপনারা অনুমান করে নিতে পারেন।

ঠিক রাত বারোটা—১৯৫৮-র জুনের নয় তারিখ পড়ে গেছে, পল আর্লি খবর দিল—"এখন সলিল গহ্বরে নামা যাবে।"

সব দিক ভালো ভাবে তদারক করে আমি হুকুম দিলাম, "যে-যার জায়গায় মোতায়েন হয়ে যাও!"

আবার নটিলাস বরফরাজ্যের অভিমুখে যাত্রা করল।

॥ চৌদ্দ ॥

পাজেট সাউণ্ডের অন্ধকারের ভেতরে ঢুকে পড়বামাত্র, লেঃ বব্ কেল্‌সি কাছে মেইন ডেকে খবর পাঠালাম—আমাদের জাহাজের হাল আর পালে জল্‌জ্বলে হরফে পরিচিত সংখ্যা "৫৭১" লেখা রয়েছে, সেটার ওপর রঙ চাপিয়ে ঢেকে দাও। একেবারে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের চলতে হবে। যদি কেউ দেখতে পায় আমাদের, তবু যেন চিনতে না পারে। পাজেট সাউণ্ডের এই অন্ধকারে যতক্ষণ আমরা জলের ওপর ভেসে চললাম তার মধ্যেই ধূসর রঙটা শুকিয়ে গেল।

এবার আমাদের দুই বন্দীকে খালাস করা যায়। তাঁরা শেপ জেঙ্কসের হেফাজতে রয়েছেন। তাকে ডেকে বললাম—"এবার বন্দীদের মুক্তি দাও।"

অবিশ্যি জাহাজীদের মধ্যে অনেকেই আগে থেকে ডঃ লয়েন আর রাউরিকে দেখে ফেলেছে এবং আন্দাজ করে নিয়েছে যে আমরা মেরু-বিশেষজ্ঞ লয়েনকে জাহাজে নিয়ে নিশ্চয় অক্ষরেখা আর পানামায় যাচ্ছি না। তাই ওদের শুনিয়ে জেঙ্কসকে কথাগুলো ব'লে, প্রসঙ্গের মুখপাত ক'রে নিলাম। তারপর সাধারণকে সম্বোধনের ভঙ্গিতে মাইক্ নিয়ে বললাম—"জাহাজের সকলকে বলছি। আমি ক্যাপ্টেন কথা বলছি। শোনো, আমাদের এই সফরের গন্তব্য হ'ল পোর্টল্যাণ্ড, ইংলণ্ড—উত্তরমেরু হয়ে..."

আমার এই কথায় সাড়া পড়ে গেল। সুন্দর ভাবে জাহাজীরা জবাব দিল। রবার্ট সিমোনিনি গলা ফাটিয়ে বলল—"আরে মশাই, আমি অনেক হিসেব ক'রে দুটো ব্রিটিশ পাউণ্ড জোগাড় ক'রে রেখেছি।" তার পাল্টা জবাবে স্টুয়ার্ট হার্ভে আপশোসের ভঙ্গিতে বলল—"তোমার ত পোয়া বারো হে! কিন্তু আমার যে বিরাট ক্ষতিটা হ'ল সেটা কে দ্যাখে! আরে আমার কাছে দু-দুটো পানামার সিকি মুদ্রা রয়েছে, তার খেসারত কে দেয় বলো।"

নটিলাসের এক নাবিকের পরিবর্তে এক কোয়ার্টার মাষ্টার কাজে যোগ দিয়েছে, নাম তার উইলিয়ামসন। সে বলল—"এখন বুঝতে পারছি ওরা কেন বলছিল, আরে তুমিই যাও, তোমার ত বিয়ে হয় নি! গেলে একা যাওয়াই ভালো।"

এ সবই হাল্কা তামাসার কথা জাহাজের কোথাও আতঙ্ক উদ্বেগের ছিটেফোঁটা নেই। যাকে যা বলা হচ্ছে, সে তৎপর ভাবে তা-ই করছে, সব ঠিক আছে, নটিলাস ষোলআনা তৈরী। নটিলাসের জাহাজীদের সম্পর্কে আমার ধারণা আরও দৃঢ় হল—এর চেয়ে যোগ্য নাবিক দুনিয়ার কোনো জাহাজে কেউ দ্যাখে নি।

পাজেট সাউণ্ডের মধ্যে দিয়ে প্রথম দুঘণ্টা জাহাজ ধীরে ধীরে চলল—পাছে কাঁচা রঙটা জলের তোড়ে ধুয়ে গিয়ে আমাদের পরিচয় সংখ্যা বেরিয়ে পড়ে। ম্যারোষ্টোন পয়েন্ট থেকে আমরা পুরোদমে গতিবেগ দিলাম। আসলে নটিলাসকে জলের নীচ দিয়ে চলবার মতো ক'রে বানানো হয়েছে। ভেসে চলার সময় বেশি জোর দিলে তার শক্তির অপব্যয় হয়, কিন্তু জলের তলার ঢেউ কাটানোর অসুবিধে থাকে না, নটিলাস তখন তীর বেগে ছুটে চলে। এই জন্যে আমরা নিচ দিয়ে চলাটাই পছন্দ করি।

পাজেট সাউণ্ডে দিনের আলো সকাল সকাল দেখা দেয়। এই সময়ে ডেকের অফিসারকে একটু কায়দা ক'রে অন্যান্য জাহাজের পথ এড়িয়ে জাহাজকে চালানোর দিকে নজর রাখতে হয়। বাণিজ্যপোতের সঙ্গে দেখা হলেই মুস্কিল। তারা যদি দ্যাখে, পতাকা নেই, পরিচয় সংখ্যা নেই এমন একটা সাবমেরিন তীরবেগে চলেছে, তাহলে উদ্বিগ্ন হবে, উত্তেজিত হবে! বেলা নটা নাগাদ স্ট্রেটসিওর লাইট্‌হাউসফট থেকে কয়েক মাইল দূরে জুয়ানদা ফুকা প্রণালী অতিক্রম করার পর, জোরালো দুট মোলায়েম আওয়াজ ক'রে আমাদের জাহাজ সমুদ্রের সত্যিকার গভীর দরিয়ায় নেমে পড়ল। চটপট্ জাহাজের কলকব্জা ভালো ক'রে দেখে নিয়ে গতিবেগ ত্রিশ মাইল উর্ধ্বে তুলে দেওয়া হ'ল। আমরা সমুদ্রের তলায় কয়েক শ ফিট নিচ দিয়ে চলেছি।

আমাদের এই সফরের আসল গাঁট ত এখনো আসে নি। এ পথের সবচেয়ে বিপদজনক, দুরতিক্রম্য অংশ হ'ল অল্প পরিসর, অগভীর বেরিং

প্রণালী পেরোনো—সেই শীর্ণ অগভীর জলরাশি বরফ চাপা। এই পথটুকু যে-কোনো জাহাজের পক্ষেই দুর্গম, পৃথিবীর মধ্যে এত খারাপ পথ আর বোধ হয় নেই। আমাদের সামনে দুটো "দরজা" খোলা রয়েছে। একটি হ'ল পশ্চিম দিকে অর্থাৎ সেণ্ট লরেন্স দ্বীপের সাইবেরিয়ার দিকটা। প্রণালীর দক্ষিণ সীমান্ত পর্যন্ত এই বন্ধুর এবড়ো-খেবড়ো পথটা ছড়িয়ে গেছে। দ্বিতীয় দরজাটি পূর্ব দিকে অর্থাৎ সেণ্ট লরেন্স দ্বীপের আলাস্কার দিকটা। আমরা পশ্চিমের পথ দিয়েই বেরুবার চেষ্টা করব, তার কয়েকটা কারণও রয়েছে। আমাদের বৃহৎ চক্রপথের পক্ষে ওটা নিকটতর। তাছাড়া পশ্চিমের জল গভীরতর এবং পুরনো একখানা বই‌তে পড়েছি যে বছরের প্রথমার্ধে ওই বিপদসঙ্কুল তটতুষার তীরের দিকেই ঘেঁষে থাকে।

সেণ্ট লরেন্স দ্বীপ আর আমাদের মধ্যবর্তী দূরত্বের ভেতরেই অবশ্য অস্টেলিয়ার রুক্ষ দ্বীপমালা রয়েছে। প্রায় সাতের শ মাইল দূর এখনো। আমরা ডুবোপথে চলতে শুরু করার পরই ফ্রেঙ্কস যে পথ ধরেছে সেটা আমাদের ওই বাধার মুখে হাজির করল না। শেষে ডাইভিং অফিসার লেঃ বব্ কেল্সি ষ্টিয়ারিং আর ডেপ্থ কণ্ট্রোলকে ঘুরিয়ে "অটোম্যাটিক" পদ্ধতিতে চালিত করল। এই অটোম্যাটিক পদ্ধতি একেবারে এরোপ্লেনের অটোম্যাটিকের মতো। এবার আমরা ঠিক পথে চলেছি। এমন এক পথ যেখান দিয়ে এর আগে কোনো নাবিক কখনো যায়নি।

সমুদ্রের প্রথম সকালটা শান্ত। জাহাজী আর অফিসারদের অনেকেই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ঘুমোয় নি—কেউ বা তার চেয়েও বেশি। পশ্চিম উপকূলে অনবরত দর্শকের ভিড় আর সাবমেরিন-প্রতিরোধের মহড়াতে সবাইকে উদ্বাস্ত থাকতে হয়েছে। অবিশ্যি আমাদের জাহাজীদের মধ্যে প্রায় সবাই তরুণ, গড়ে ছাব্বিশ বছরের কাছাকাছিই এদের বয়স—কাজেই এদের ধকল সামলাবার ক্ষমতা খুব বেশি। নটিলাসে চন্‌নে প্রাণময়তা ফিরে আসতে তাই দেরি হয় না। বিকেলের দিকে সবাই চাঙ্গা হয়ে উঠল। একজিকিউটিভ্ ফ্র্যাঙ্ক এ্যাডাম্‌সই শুরু করল, সমুদ্রগর্ভে বরফের তলার সফর সম্পর্কে আলোচনা। পর পর এমনভাবে এই বক্তৃতামালা সাজানো রয়েছে যে, বরফের এলাকায় পৌঁছবার আগেই জাহাজীরা তৈরী হয়ে যাবে কেমনভাবে বরফের নীচ দিয়ে জাহাজকে নিরাপদে স্বচ্ছন্দ গতিতে নিয়ে

যেতে হবে। ঐক্যবদ্ধ কাজের হুক তারা পেয়ে যাবে। বিশেষভাবে কোন্ কোন্ বিষয়ে নজর রাখা দরকার সেটা শিখতে হবে, খুঁটিনাটি নির্দেশ-উপদেশ দিতে হবে। আর আমাদের সফরের মুখ্য উদ্দেশ্য তথ্য সংগ্রহ, সে বিষয়েও বৈজ্ঞানিক তথ্যপত্র সংগ্রহের সংগঠন তৈরী করতে হবে।

উত্তর মুখে চলতে চলতে মাঝেসাজে পেরিস্কোপ-পর্যবেক্ষণ, রেডিও পরখ আর স্নোরকেলের জন্য, আমরা গভীর দরিয়া ছেড়ে ওপরে উঠেছি। আকাশের নক্ষত্রের দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের নৌ-পথের নিশানা সম্পর্কে সংশয় ঘুচিয়ে নিচ্ছি, জরুরী সরকারী বেতারবার্তা আহরণ করছি স্নোরকেল দিয়ে তাজা বাতাস আমাদের ভাণ্ডারে মজুত করছি। অবিশ্যি, বাইরের বাতাস না পেলেও আমরা অক্লেশে একাদিক্রমে কয়েক সপ্তাহ চলতে পারি। তবু আমাদের অক্সিজেন ভাণ্ডারটা দূরপাল্লার মেরু অববাহিকা আর তার পরের দ্রুতগতির ইংলণ্ড সফর আর দেশে ফেরার সময়ের জন্য মজুত রাখাই আমার ইচ্ছে।

আনবিক শক্তির ডুবোজাহাজ মুখ্যতঃ যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হলেও, মানুষের দরিয়া সফরের পক্ষে এর মতো আরামপ্রদ আর কিছু হয় না। আমাদের এই গভীর জলযাত্রায় জাহাজে বিন্দুমাত্র ঝাঁকুনী নেই, টলমল করছে না একটুও—ডাঙার সাধারণ ঘরের মতোই স্থির। মাথার ওপরে যখন উথল-পাথাল ঝড়ের ধাক্কায় সমুদ্র বিক্ষুব্ধ তখন আড়াইশো ফিট গভীরে জল একেবারে ঘেরা পুকুরের মতো অচঞ্চল। জাহাজের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও চমৎকার। নটিলাসের জাহাজীরা এই পরিবেশে এমন অভ্যস্ত যে, তারা জলে ভেসে চলা মোটেই পছন্দ করে না। একমাত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরার সুবিধের জন্যে ডাঙাতে যাওয়ার ইচ্ছে হয় বটে। এখানে আমাদের একমাত্র অসুবিধে এই যে, ওপরের দুনিয়ার খবরাখবর পাই না। তাছাড়া আর সবই রয়েছে। অবসর বিনোদনের জন্যে নিত্য নতুন ছায়াছবি দেখানো হয়—দিনে দুবার সিনেমা দেখানো হয়, একবার বিকেলে আর একবার রাত্রে খাওয়ার পর। তাতে ক'রে সবাই ছায়াচিত্র দেখার সুযোগ পায়। এই সফরে আমরা মোট ত্রিশখানা পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র নিয়ে বেরিয়েছি।

সিয়াট্‌ল বন্দর ছাড়বার পর প্রথম যে ছবিটি দেখানো হ'ল, সেটি সাবমেরিণকে কেন্দ্র ক'রে, 'হেল্‌ এ্যাণ্ড হাই ওয়াটার'। এটা দেখে জাহাজীরা খুব হাসাহাসি করল, ছবিতে এক জায়গায় আশ্চর্য একটা উক্তি রয়েছে যার সঙ্গে আমাদের অবস্থার কাকতালীয় সামঞ্জস্য রয়েছে—"ছ মাস আগে কে জান্‌তো যে আমি মেরু অভিযাত্রী জাহাজে সফর করব... ?"

আমাদের এই জলের নিচে দিন, রাত্র, স্থান, পরিবেশ সবই ত একাকার, সেই জন্যে নিয়মিত সময়ের হিসেব মাফিক যখনকার যা কাজ তখন তা-ই করি—সেটাই যেন ভালো মনে হয়।

পাজেণ্ট সাউণ্ড ছাড়বার কিছু পরেই আমরা ঘড়ির কাঁটা আট ঘণ্টা এগিয়ে দিয়ে গ্রীন্‌উইচ সময়ের সঙ্গে সমান ক'রে নিলাম। এতে এই হ'ল যে, গোটা সফরটাই আমরা একটা সামঞ্জস্য সময় ধরে চলতে পারব অবিশ্যি রসুইঘরের লোকেরা এই হঠাৎ-বদলে প্রথম চোটে অসুবিধেতে পড়েছিল। সবেমাত্র রাতের খাবার-পাট চুকোতে না চুকোতেই প্রাতরাশের সময় হাজির।

নাবিকের কাজ ভাগ ক'রে দেওয়া হ'ল এই ভাবে—চার ঘণ্টা কাজ, আট ঘণ্টা ছুটি। আর বিশেষ সতর্কতার জন্য দু'জনের বদলে তিন জন ক'রে অফিসার মোতায়েন করা হ'ল—কণ্ট্রোল রুমে একজন ডাইভিং অফিসার, পেরিস্কোপ স্টেশনে একজন কর্ণধার, পরিচালনার কক্ষে একজন এঞ্জিনিয়ারিং অফিসার। ওদিকে ডঃ লয়েন এবং তাঁর সহকারী রেক্স বাউরী বরফ-সন্ধানী সূক্ষ্ম যন্ত্রটার জটিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তদারকীতে লেগে গেছেন। আমরা বসন্তের গোড়াতেই এই যন্ত্রটা ঘটা ক'রে লাগিয়েছিলাম —হাফবীক আর স্কেট-এর সঙ্গে। 'বরফচর্চার' বিজ্ঞাপন হিসেবে। ডঃ লয়েন দেখলেন, গভীর জলের চাপে ওপর দিকের একটা বরফ-সন্ধানী যন্ত্র ফুটা হয়ে গেছে। তার জন্য আমরা থোড়াই পরোয়া করি, কেন না আমাদের কাছে ওরকম যন্ত্র আরো গোটা কয়েক মজুত রয়েছে।

দু-দিন কেটে গেছে। হঠাৎ সেদিন ভোরের দিকে আমাদের রেডিওতে খবর পাওয়া গেল—আমাদের পথে সামনের দিকে প্রচণ্ড ঝড় চলেছে। ঝড়টা উত্তরদিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অবিশ্যি আমাদের এই অতল জলে

অবস্থিত বাড়িতে তার ধকল এতটুকু লাগবে না তা ঠিক। কিন্তু আমাদের দুর্ভাবনা এই যে, বেরিং প্রণালী এবং তার তুষার অঞ্চলে এর প্রতিক্রিয়া কি ধরণের হবে? যাকগে, এতদূর এগিয়ে ওসব ভেবে কোনো লাভ নেই —কপাল ঠুকে এগিয়েই দেখা যাক কি হয়।

আমাদের অভিযানের মেজাজ এখনও দস্তুর মতো চাঙ্গা। ওস্তাদ ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী উইলিয়ম ম্যাকনালী উত্তরমেরু অতিক্রমের ঐতিহাসিক চিহ্নসূচক ছবি আঁকছে হরদম। জাহাজের ফটোগ্রাফার জন ক্রাউজিঙ্ক ক্রমাগত ক্যামেরার কল টিপে ছবি তুলে চলেছে। আমাদের জাহাজের একজন রাঁধুনী নাম তার মারফি. সে মাস দশেক হ'ল এই জাহাজে কাজ করছে। আমি অলক্ষ্যে থেকে শুনলাম, সে জেমস মর্লিকে বলছে— "ছাখো মার্ল, এক বছর আগেও আমি নিতান্ত সাধারণ যদু-মধু ছিলাম। কিন্তু আমি, বরাত-জোরে—এই আমি উত্তর মেরুতে চ.া.ছি। কী কাণ্ড!"

॥ পনের ॥

তৃতীয় দিনে আমরা অপেক্ষাকৃত উষ্ণজলস্রোত ছাড়িয়ে গেলাম, হঠাৎ তাপমাত্রা কমে গেল। ব্যাথি-থার্মোগ্রাফের সাহায্যে আমরা বাইরের জলের তাপমাত্রার হিসেব পাই—দেখা গেল জলের তাপমাত্রা একেবারে ৩৯ ডিগ্রি ফারেনহাইটে নেমে গেছে।

কয়েক মাসের মধ্যে নটিলাস এত ঠাণ্ডা জলের মধ্য দিয়ে চলে নি। সেই সকালেই আমাদের হিসেব মাফিক, যতোটা নিচ দিয়ে চলবো তার শেষতম গভীরতায় জাহাজকে নামিয়ে, চলতে শুরু করলাম। পরখ করে নেওয়া দরকার, কোথাও কোনো ছিদ্র দিয়ে জল ঢুকছে কি না। এটা দেখা গেছে যে, গরম জলস্রোত থেকে হঠাৎ ঠাণ্ডা জলে গিয়ে পড়লে, তাপমাত্রা কমে গেলে, জাহাজের গুপ্ত ছিদ্র যদি কোথাও থাকে সেখান দিয়ে জল চোঁয়ায়। ইমন পিল্‌চার প্রত্যেক ঘরে ঘরে টেলিফোন ক'রে খবর নিয়ে; ডাইভিং অফিসার লেঃ কেলীকে জানাল, "কোনো ঘরেই ছেঁদা নেই এই খবর।" ছিদ্র সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে, সাধারণ জল দিয়ে জাহাজ চালাতে হুকুম দিলেন।

চতুর্থ দিনে আমরা Alentian chain-এর কাছাকাছি পৌঁছলাম, তার মানে গভীর জলের মধ্য দিয়ে চলার আরাম আমাদের ঘুচলো। এবার আমরা ধীরে ধীরে ওপরের দিকে উঠতে লাগলাম—ফ্যাদোমিটারের দিকে নজর সেঁটে রয়েছে, দেখছি আমাদের নীচের দিকে জলের গভীরতাও কমছে। এখন কয়েকদিন খুব হিসেব ক'রে অগভীর জল দিয়েই চলতে হবে, মাঝে মাঝে জলের বুক থেকে দ্বীপ গজিয়ে উঠতে দেখবো। জুনের বারো তারিখ রাত্রে আমরা প্রথম দ্বীপ ইউনিম্যাককে দেখলাম। মাটির স্পর্শ! সিয়াট্‌ল থেকে সতের শ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ইউনিম্যাক।

ওপরে পেরিস্কোপের নাক তুলে দেওয়া হ'ল—তৃণচিহ্নহীন এ্যালুসিয়ান দ্বীপগুলির চুড়াতে বরফের টুপী চড়ানো। এই দ্বীপমালার গোলক ধাঁধাঁকে এড়িয়ে পাশ কাটিয়ে উত্তর দিকে আমাদের পথ খুঁজে খুঁজে চলতে হবে। নেভিগেটর শেপ্ জেঙ্কস অনবরত গতি পরিবর্তন করছে। অবশেষে নটিলাসকে দুটো দ্বীপের ঠিক মাঝখান দিয়ে নিয়ে যাবার মতো খোলা যায়গায় এনে ফেলে সে নিশ্চিত হ'ল। গভীরে ডুবে আমরা দ্রুতবেগে চললাম। মাঝরাত নাগাদ আমরা প্রথম ছুঁচের ফুটোর ভেতর দিয়ে গলে' পেরিয়ে এলাম। কিন্তু আমাদের সামনে আর একদফা বাধা উপস্থিত—বেরিং সমুদ্র।

আমরা হিসেব মতো, অগভীর জলের তলা দিয়ে চলেছি, মাঝে মাঝে পেরিস্কোপের ভেতর দিয়ে ওপরের চেহারা দেখছি। এই বেরিং সমুদ্রের অগভীর জলের তলার মাটি যেন আশ্চর্যরকম সমতল। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে ভাসমান বরফের সঙ্গে মাটিও চলে আসে ভেসে, তারপর বরফ গলে' মাটিগুলো ধুয়ে ধুয়ে সমুদ্রের নিচে জমা হয়ে পলি পড়ে' পড়ে' একদিকে জলের গভীরতা যেমন ক'মেছে তেমনি সমতলত্বও বেড়েছে। সে যা-ই হোক আমরা সন্তর্পণেই চলেছি। কিন্তু বেরিং সমুদ্রের বেতালা সময় সঙ্কেতই আমাকে তাজ্জব করে দিয়েছে। আমাদের ঘড়ির হিসেবে এখানে সকাল সাতটায় সূর্যাস্ত আর বিকেল দুটোয় সূর্যোদয় হয়। অবিশ্যি আমাদের এই দুনিয়া-ছাড়া নিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রায় এসব ধর্তব্যের বাইরেই মনে করতে হবে।

জাহাজের জীবনযাত্রা যথানিয়মে চলেছে।

সফরের শুরু থেকে তাস খেলার প্রতিযোগিতা অব্যাহত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এই ত আজকের তৃতীয় খেলায় প্রথম শ্রেণীর ইঞ্জিনম্যান গিলবার্ট স্পারলেঃ কেন কারের কাছে হেরে গেল—তখন ভোর সাড়ে চারটে। যারা কাজ থেকে ছুটি পেয়েছে তারা এখন কফি আর হাল্কা কিছু খেয়ে ঘুমিয়ে বিশ্রাম নেবে। ওদিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর ইঞ্জিনম্যান ডেভিড্ লং ইঞ্জিন ঘরে কাজ করছে, গরম জলের ব্যবস্থা দেখা তার কাজ। এই টাট্‌কা গরম জল স্নান, দাড়ি কামানো, রান্না আর বাষ্প জনিত্রের কাজে ব্যবহার হয়। জলের কোনও দুঃখ দরদ নেই আমাদের এখানে। অবিশ্যি

এখানকার কৃত্রিম আলোতে তাজা ফল, তরিতরকারী খুব দ্রুতই কমে আসছে—খিদেও খুব তাজা দেখা যাচ্ছে।

এখন যে রকম জাহাজের অবস্থান নিয়ে সবাই মাথা ঘামাচ্ছে, এর আগে নটিলাসে এ রকম সজাগ মনোভাব আমি দেখি নি। বড় বড় বেস-বলের লীগের প্রতিও যেন এতখানি আকর্ষণ দেখা যায় না। মাঝে মাঝে আমাদের বেতার সংবাদ পরিবেশনের তরঙ্গ স্তর ধরা পড়ে, তাতে কচিৎ খেলার খবরও মেলে। সেদিকে তাদের যতো না লক্ষ্য তার চেয়ে বেশি নেভিগেটরের মানচিত্রের দিকে। তারা নেভিগেটরের এপাশ ওপাশ দিয়ে ঝুঁকে পড়ে' নকশা ছাখে। মেশিনিস্টের মেট রিচার্ড বিয়ার্ডেন আর ফার্স্টক্লাস ইঞ্জিনম্যান নরম্যান ভিটালে "ইঞ্জিনঘরের নেভিগেটর" রূপে বহাল হয়েছে। রিয়্যাক্টর প্ল্যান্ট কণ্ট্রোলের কাছে তারা মেরু অঞ্চলের এক নকশা টাঙিয়ে রেখেছে প্রায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় নটিলাস কতোটা উত্তর দিকে এগোলো নকশায় তার চিহ্ন করে রাখছে তারা।

তেরোই জুন শুক্রবার, আমাদের যাত্রার চতুর্থ দিনে, বেরিং সমুদ্রতলের অগভীর জলরাশির একশ ফিট ওপর দিয়ে আমরা প্রিবিলফ দ্বীপপুঞ্জ পেরিয়ে গেলাম। পরদিন একবার ওপরে উঠে শেষবারের মতো স্নোরকেলে ওপরের টাটকা হাওয়া নিয়ে নিলাম।

এরপর আমরা জাহাজের নিজস্ব বায়ু ভাণ্ডার থেকে বাতাস ব্যবহার করব স্থির করে রেখেছি—মজুত বোতল থেকে অক্সিজেন নেওয়া হবে। আর, কার্বন-ডায়ক্সাইড, কার্বন-মনক্সাইড্, এবং হাইড্রোজেন গ্যাসকে ক্ষতিকর পর্যায় থেকে মুক্ত রাখার জন্য যন্ত্র ব্যবহার করা হবে। নটিলাসের ডাক্তার কমাণ্ডার ডবিন্স এবং তাঁর দুজন সহকারীর উপর এই দিকে নজর রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁরা লক্ষ্য রাখবেন যাতে জাহাজের ভেতরের বদ্ধ বাতাস অস্বাস্থ্যকর না হয়ে পড়ে।

আমাদের জাহাজের ঘড়ি হিসেবে তখন দুপুর হওয়ার কথা, কিন্তু যখন বাতাস নেওয়া চুকল তখন ওপরের পৃথিবীতে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সমুদ্রের জল শান্ত, কিন্তু কুয়াশার পর্দা পেরিয়ে বিশেষ কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আমরা গভীর জলে নেমে চৌম্বক কম্পাসটা পরীক্ষা করে নিলাম; যদি ইলেকট্রনিক কম্পাসগুলো এবং ইনার্সিয়াল নেভিগেটর কাজ না করে তখন

ও চৌম্বক কম্পাসই আমাদের ব্যবহার করতে হবে। অতএব তার হাল্-হকিকৎ যাচাই করে রাখা দরকার।

সেদিন, রাত দশটায় আমরা পশ্চিম দরজায় হাজির হলাম। আমাদের বাঁদিকে সাইবেরিয়া আর দক্ষিণে সেণ্ট লরেন্স দ্বীপ। আবার ওপর দিকে উঠলাম, পেরস্কোপ-গভীরতা থেকে আমাদের নৌ-অবস্থা-নিরূপণের জন্য। আকাশ আজ কী সুন্দর, মেঘমুক্ত নীল রং-এর এত মাধুর্য কতকাল নজরে পড়ে নি! সমুদ্র মৌন। বিশ মাইল দূরে সাইবেরিয়ার তুষার-মুকুটিত উপকূল এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পরিবেশের বিশেষ অবস্থার দরুনই বোধহয়, আমরা সাইবেরিয়ার উপকূলে অবস্থিত পাহাডগুলো এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—ওগুলো আসলে এখান থেকে একশ মাইল দূরে রয়েছে। কিন্তু এটা দৃশ্য-শোভা উপভোগের সময় নয়। তাই, আমাদের কাজ চুকিয়ে আবার গভীরে নেমে উত্তর মুখে বেরিং প্রণালীর দিকে যাত্রা করলাম! আমরা যে-পথ ধরলাম সেটা আন্তর্জাতিক সীমারেখার পূর্ব দিক—অনেক বছর আগে এই সীমান্ত সীমা নির্ধারিত হয়েছে। এই রেখার মর্যাদা এতকাল যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রাশিয়া বজায় রেখে এসেছে।

১৪ই জুনের "শেষরাতের" দিকে আমরা এই অভিযানের প্রথম বরফের সম্মুখে এলাম। ইলেকট্রনিক গীয়ারেই সেটা সব আগে ধরা পড়ল। পেরিস্কোপের ভেতর দিয়ে লক্ষ্য ক'রে দেখা গেল যে তুষারের ছায়াতে সূর্যের রশ্মি চাপা পড়ে গেছে। অবিশ্যি এ বরফ তেমন পুরুও নয় আর প্রচুরও নয়। তবু গতিবেগ কমিয়ে দেওয়া হল। জাহাজে খবরটা চাউর হয়ে গেল, জাহাজীরা এসে জমায়েত হল ইলেকট্রনিক্সের যন্ত্রপাতির কাছে, ব্যাপারটা দেখতে। যারা এই সফরেই নতুন এসেছে তাদের জীবনে এই প্রথম-সমুদ্র-তুষার অভিজ্ঞতা—তারা বিস্ময়ে চকিত চোখে দেখতে লাগল। আর যারা পুরনো, তাদের কাছে তুষার কিছু নতুন বস্তু নয়, তারা গজরাতে লাগল "আবার সেই টুক্‌রো আর চাঁই-এর ঝামেলা শুরু হ'ল! কেউ বা বলল—"ঠিক সেবারের মতো মামলা! হ্যাঁ, সবই গতবারের মতো। তফাতের মধ্যে এই যে, আমাদের যাত্রাপথ অগভীর বেরিং প্রণালী, তাই খুব সন্তর্পণে মন্থর বেগে চলতে হচ্ছে। আমাদের উভয় সঙ্কট—মাথার ওপরে বরফ

আর তলায় খুব কাছাকাছি অগভীর সমুদ্রতল। দুদিকের ধাক্কা বাঁচিয়ে সাবধানে চলো।

যখন পালাবদল হল তখন আমরা চল্লিশ গজ হিমানীহীন জলরাশির মধ্যে এসেছি, এটা কুড়ি ফিট চওড়া। ভালোভাবে পরখ করে দেখা গেল, মাথার ওপরে জলরাশির শতকরা ষাট ভাগ তুষারময়। এই বরফের অনুপাত আমার মনে রীতিমত উদ্বেগের সঞ্চার করল। এই নিম্ন দ্রাঘিমায় বরফের ভাগ আরও কম হবে অনুমান ছিল। এখন অনবরত সোনারের খুঁটিনাটি সঙ্কেতের উপর তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে কেন না আমাদের জাহাজের তলা থেকে সমুদ্রের নীচের মাটির দূরত্ব মাত্র পঁয়তাল্লিশ ফিট জল, আর মাথার ওপরে মাস্তুলের সঙ্গে বরফের নিম্নভাগের দূরত্ব পঁচিশ ফিটও নয়।

রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ আমরা এক বিরাট বরফের চাঁই পেরুলাম, এটা জলের নীচে ত্রিশ ফিট নেমে এসেছে। সত্যি কথা বলেত কি আমি ত ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, ডঃ লয়েনের সঙ্গে চোখে চোখে সেই ইশারা হ'ল—তিনিও রকমসকম দেখে তাজ্জব।

শীতকালে যখন মেরুতুষার দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হতে থাকে, বেরিং প্রণালীর প্রাচীরে বরফ জমে ওঠে, তার সরু চোঙের মতো মুখটা তুষার চাপে প্রায় রুদ্ধ হয়ে যায়—এক এক স্তর তুষারের উপর আরও অনেকগুলো বরফের স্তর জমে। ভারনত জমাট বরফ সাগরের বুকে রীতিমত ঝুলে পড়ে। শীতকালে বেরিং সৈকতে যে বরফ জমে থাকে একে বলা হয় "বরফের ভেলা।" উষ্ণ আবহাওয়ার সঙ্গে এই বরফ সরে যায় আবার উত্তরে। তখন তীরের জমা বরফ গলে, ভাঙে,—সমুদ্রে ন য, ভেসে বেড়ায়, টুকরো-টাকরা খণ্ড হয়ে জলস্রোত আচ্ছন্ন করে।

যে মেরু তুষারের জন্ম মেরু সমুদ্রের বুকে, সমুদ্রে ভেসেই যে বরফ জীবনযাপন করে তা কতখানি পুরু হতে পারে সেটা বৈজ্ঞানিকের হিসাবে অনুমিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু যে 'ভেলা-বরফ' উপকূল থেকে দরিয়ায় ভেসে পড়ে তার স্থূলতা আন্দাজ করা অসম্ভব। এই 'ভেলা-বরফ' সম্পর্কে তেমন গবেষণা কেউ করেন নি। কিন্তু ডঃ লয়েন এবং আমি ষাট ফিট পুরু ভেলা দেখেছি—এগুলো আলাস্কার উপকূল থেকে দরিয়ার বুকে ভেসে পড়ে।

অবশ্য সাইবেরিয়ার উপকূলবর্তী অঞ্চলের ভেলা-ভাসা বরফ কতখানি পুরু হতে পারে সেটা আমাদের ধারণার বাইরে। পয়লা নমুনাই দেখলাম, জলের ত্রিশ ফিট তলায় পা বাড়িয়ে দিয়েছে!

আমার আশঙ্কা হচ্ছে, এর চেয়েও অগভীর জল আমাদের সামনে পড়ে আছে। আচ্ছা এমন যদি হয়, এরপর একখানা বরফ চাঁই পড়ল যা জলের নিচে চল্লিশ ফিট নেমে এসেছে—তাহলে? ভাবনাটা অশুভ, ভাবনাটা ভীতিপ্রদ, সর্বনাশের করাল ছায়ায় মনকে আচ্ছন্ন করে ফ্যালে—কিন্তু অসম্ভবের কল্পনা এ নয়। তাহলে কি দশা দাঁড়াবে?

ডঃ লয়েনের সঙ্গে গোপনে একান্ত বৈঠকে আমার আশঙ্কার কথাটা খুলে বললাম। তিনিও সায় দিলেন, তিনিও ঠিক আমারই মতো চিন্তাকুল। একথা আমরা দুজনেই উপলব্ধি করি যে, বরফ সাধারণ শত্রু নয়, তাকে সমীহ করে চলতে হয়, তার জন্য বিলম্বের ক্ষতিও মেনে নিতে হয়। গত বছরে আনকোরা সৈনিকের অদম্য উৎসাহ নিয়ে, বরফকে পরাভূত করে দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দেবো ভেবে অধীর ক্ষিপ্রতা সহকারে এগোতে গিয়ে আমাদের কী দশা হয়েছিল—তা আমি হাড়ে হাড়ে জানি। এ বছরে আমি কৃতসংকল্প, কিছুতেই বড়রকমের ক্ষতির নতি স্বীকার করব না। তাতে ফল যা হয় হোক।

বসে বসে ভাববার অবসর নেই, সময়ের স্রোত সমুদ্রের জলের চেয়েও দ্রুত। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আমাদের ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করে ফেললাম। কনিং অফিসার লেঃ কেন্ কারকে মোলায়েম, অনুদ্বিগ্ন, স্থির কণ্ঠে বললাম জাহাজের গতি বিপরীত পথে ফেরাও।…পশ্চিমের দ্বার রুদ্ধ।

সেদিন আমাদের নিজস্ব সংবাদপত্রের শিরোণাম হল—"পানামা মেরু অঞ্চল বাঁটোয়ারা"...লেঃ হার্ভের প্রশ্ন হল, যে তুষার আমাদের বিপন্ন করছে সেটা আমেরিকান না রাশিয়ান?…এই টিপ্পনিতে জাহাজময় হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল।

॥ ষোলো ॥

পশ্চিম দরজার আশা ছেড়ে দিয়ে আমি ঠিক করলাম' সেণ্ট লরেন্স দ্বীপের দক্ষিণ প্রদক্ষিণ ক'রে আলাস্কা উপকূলের উত্তর দিয়ে বেরিয়ে যাবো। এই পথেও জলের গভীরতা স্বল্প। মাঝে মাঝে শুধু পালের ওপরই ভরসা ক'রে চলতে হবে, কোথাও বা জাহাজের উপরের অংশটা বাইরে বেরিয়ে পড়বে—তাতে আমাদের যাত্রার গোপনটা ফাঁস হয়ে যাবার আশঙ্কাও রয়েছে। কিন্তু এছাড়া ত কোনো পথ নেই।

পরদিন সকাল ছ'টা নাগাদ সাইবেরিয়ার বরফ অঞ্চল থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা চুকলো। একবার ওপরে উঠে সেণ্ট লরেন্সের অবস্থানটা দেখে নেওয়া হ'ল। হাওয়া প্রায় চলছেই না, বরফের চিহ্নও নজরে পড়ল না। এমন সময়ে সোনারের সংবাদে দেখা গেল জাহাজের সামনেই বরফ হাজির। ব্যস্তভাবে আমি পেরিস্কোপে চক্কর দিয়ে দেখলাম, "বরফ" বলতে দু'টো সিন্ধু-শকুন জলে ডুবছে—ভাসছে খেলা করছে। আমাদের বরফ-সন্ধানী যন্ত্রের এই বিস্ময়কর স্পর্শসংবেদনতা দেখে মুগ্ধ হলাম।

দুপুরে জাহাজের হাওয়া বদল করতে আবার যখন পেরিস্কোপ-গভীরতায় আমরা উঠলাম তখন আবহাওয়া ঘোলাটে কুয়াশায় ঢাকা-বায়ুস্তরে সামনে হাজার গজের বাইরে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আর একবার সেণ্ট লরেন্সের সঙ্গে আমাদের অবস্থান সম্পর্কে পরখ ক'রে নিয়ে আবার এগিয়ে চললাম। আমার জাহাজের লোকেরা জানে যে, আমরা পশ্চিম-দরজা দিয়ে সরাসরি মেরুসমুদ্রের গভীর জলে পৌঁছবার প্রথম প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে আলাস্কার দিক দিয়ে অল্প জলের অসুবিধে ভোগ করতে করতে যাবো। তারা এতে একটু হতাশ হয়েছিল বই কি। তারপর যখন শুনল যে অগভীর জলে পড়লে উপরে উঠে ভেসে ভেসে যেতে হবে, তখন যা

টিপ্পনি করা স্বাভাবিক তা-ই করল। সবাই বলল—"সেই যাত্রাটা আমার পালায় যেন না পড়ে।"

জাহাজীদের মেজাজ শরীর, কাজ চমৎকার। এখন ত ছেঁদা দিয়ে জলও চোঁয়াচ্ছে না, ছেঁদাটা মেরামত হয়েছে। আগুন লাগবার আশঙ্কাও নেই কিন্তু তবু একটা সন্দেহের কামড়ে মনটা ভারি হয়ে রয়েছে। কি যেন একটা অশুভ ঘটবে! পশ্চিম দরজার আশা ছাড়তে হয়েছে। এখন? নতুন কি বিপদ আসছে! অবশ্য নতুন দুর্লক্ষণ দেখা দিল, নৌ পরিচালনার পক্ষে জরুরী যে-যন্ত্র সেই মাস্টার জাইরোকম্পাস এলোপাতাড়ি চলতে শুরু করেছে।

আমরা সেণ্ট-লরেন্সের পূব দিক ঘুরে আলাস্কার উপকূল ধরে উত্তর মুখে চলতে শুরু করলাম। জল ক্রমেই কমে আসছে। ফ্যাদোমিটারে জাহাজের তলে পঁয়তাল্লিশ ফিট জল পাচ্ছি। এরপর সন্ধ্যের দিকে সেটা ষাট ফিটে উঠল। মাথার ওপরে, মাস্তুলের ডগাটুকু কেবল ডুবে রয়েছে। পরিচালন-অফিসার পল আর্লি নাগাড়ে পেরিস্কোপে চোখ লাগিয়ে রয়েছে। এখানে জল এত কম যে, খুব সাবধানে ঘুরে-ফিরে হিসেব ক'রে চলতে হবে, আমাদের গতিবেগ বিরক্তিকর মন্থরতায় যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছে।

একের পর একটা ক'রে আকস্মিক ছোট খাট ভাগ্য-বিড়ম্বনায় আমরা বিব্রত হয়ে পড়লাম। প্রথম গেল, আমাদের মাষ্টার জাইরোকম্পাস। উদ্বেগের জের কাটিয়ে আমরা আত্মনির্ভরতা ফিরে পেলাম। কম্পাস অকেজো হওয়ার ফলে, এতক্ষণ যে সব ভুলভ্রান্তি আমাদের নজর এড়িয়ে ছিল সেগুলো এখন ধরা পড়তে লাগল। বেমণ্ড ম্যাকুল যার খুব শীগ্‌গির পদোন্নতি হবে, আর তার সহকারী রোনাল্ড কেভ্‌-এর পালা, তারা কাজে গেল।

এর অল্পক্ষণের মধ্যেই পল্ আর্লি দিকচক্রবালে একটা মাস্তুল লক্ষ্য করল। আমাকে খবর দিতেই, ছুটলাম। পেরিস্কোপের মধ্য দিয়ে যা দেখলাম তাতে ত চক্ষু স্থির! আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম, ভেবেছিলাম যে যদিও আমাদের মাস্তুলের খানিকটা জলের ওপর জেগে রয়েছে। তবু সেটা কারুর নজরে পড়ে নি। কিন্তু ধারণাটা বোধ হয় ঠিক নয়। দূরের

ওই বস্তুটা ত সাবমেরিণ। কিন্তু ওটা এখানে কেন এসেছে? কি করছে? ওটা কি রুশেদের জাহাজ?

আমরা খুব কাছাকাছি এসে পড়েছি। যা হয় হোক, আমরা তার জন্য তৈরী! কিন্তু কিছুটা এগিয়ে, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। ওটা আর কিছু নয়, বড় একটা গাছ ভেসে আসছে—তার শেকড়গুলো এমনভাবে জেগে রয়েছে যে আমরা সেগুলোকে পেরিস্কোপের শুঁড় মনে করেছি। তাহলে আমরা এখন ইউকন নদীর মুখে এসে পড়েছি। এরপর আরও অনেক গাছই আমাদের নজরে পড়ল। দু'ঘণ্টার মাথায় একটা গাছ এমন আচমকা সামনে পড়ল যে সেটা আর পাশ কাটাবার রাস্তা রইল না—নিমিষের মধ্যে পেরিস্কোপে ধাক্কা খেল গাছটা। কপাল ভালো যে ক্ষতি হ'ল না কিছু।

বিকেলের দিকে আমরা আবার স্বচ্ছন্দে চলবার মতো উচ্চ অক্ষাংশে পৌঁছে গেলাম। আবহাওয়া মোটামুটি পরিষ্কার, জলের তাপ হিমাঙ্কের চেয়ে বেশ খানিকটা উষ্ণ, বরফের চিহ্ন নেই। এবার খানিকটা আরামে হাত খুলে জাহাজ চালানো যাবে এই খবরে জাহাজীরা চাঙ্গা হয়ে উঠল।

সন্ধ্যার-দিক ঘেঁসে বেরিং প্রণালীর দক্ষিণে কিং দ্বীপের রুক্ষ অবয়বটা আমাদের পেরিস্কোপে দেখা গেল। আমরা গভীর জলের আশায় পশ্চিম মুখে-চললাম। যাতে পেরিস্কোপকে জলের তলে রেখে চলা যায়। সেদিন সন্ধ্যায় পরিচালন অফিসার বিল লালর খবর দিল, সামনে কয়েকটা চাঁই-বরফ রয়েছে। আমরা উত্তরে বাঁক নিলাম। এর একটু পরেই দেখি, আমাদের সামনে মাইলখানেক পথ, ভাসা-বরফে ছেয়ে রয়েছে। এবং সেগুলো বেশ কয়েক ফিট পুরু। তাহলে আমরা এখন বেরিং প্রণালীর মোহনায় এসে পড়েছি—চুকচি সাগর দিয়ে আরও দূরের দিকে যাওয়ার এই হল পথ। মেরু অঞ্চলে প্রবেশের মুখে আমরা পৌঁছে গেছি!

ওদিকে আমাদের খবরের কাগজে যথারীতি অফিসারদের লক্ষ্য করে চুটকী প্রকাশিত হচ্ছে, সেই সঙ্গে যন্ত্রপাতির উপরও ফতোয়া বেরুচ্ছে:

স্থলপথে সম্পাদিত: নর্থ আমেরিকার 'এনডএ' ইনার্সিয়াল নেভিগেটর আমাদের স্থলপথে নিয়ে যাচ্ছে—সেন্টলরেন্সের ঈশাণ কোণ দিয়ে। বস্তুতঃ এটাই সবচেয়ে কাছের রাস্তা। মাত্র তিন মাইল ঘুরে যেতে হবে।

তাছাড়া ডঃ লয়েন আর রাউরীকে লক্ষ্য ক'রে বক্রোক্তি ফলাও করা হচ্ছে

জুনের সতের তারিখ মাঝরাতের পরেই আমরা ডায়মণ্ডে দ্বীপ দেখতে পেলাম,—পনের মাইল দূরে। বড় ডায়মণ্ডে হ'ল রাশিয়ানদের অধিকৃত আর ছোট ডায়মণ্ডে আমেরিকানদের অধিকারভুক্ত—একটি এস্কিমোদের গ্রাম। এর পরেই সাইবেরিয়া আর আলাস্কার উপকূল—আবছা অস্পষ্টতা থেকে ভেসে উঠল। আমরা এই সীমাবদ্ধ গভীরতায় পেরিস্কোপ-গভীরতা বজায় রেখে চলতে লাগলাম। একমাত্র সাইবেরিয়ার উপকূলের কাছাকাছি কয়েকটা বরফের চাঁই পেলাম। এছাড়া বরফ নেই এধার-ওধারে। চার ফিট রজত শুভ্র মুকুট নিয়ে সমুদ্রের ঢেউ যেন আমাদের গোপন যাত্রাকে সহায়তা করবার ভরসা দিচ্ছে। অনুকূলতার ভরসায় মন খুশি হয়ে ওঠে। যদিও এপথ সঙ্কীর্ণ, যদিও রাডারের হিসাব ধরে ধরে এগোতে হবে এ পথে তবু মনে হচ্ছে এমন অনুকূলতা আশাতীত।

বস্তুতঃ প্রণালীর মধ্য দিয়ে যাত্রাটা আমাদের অকল্পনীয় সুগম মনে হল। ভোর সাড়ে পাঁচটায় আমরা চুকৃচী সাগরের জলে পোঁছে গেলাম। বেরিং সমুদ্রের মতোই, প্রণালীর দক্ষিণস্থ চুকৃচী সাগরের জল অগভীর এবং সমুদ্রতল সমতল—কোথাও বা ১০৫ ফিট গভীর, কোথাও ১৭০ ফিট। চুকৃচী সাগর ধরে চার শ মাইল গেলে গভীর মেরু-অববাহিকা মিলবে। এর মধ্যে যদি বরফের বড ভারী চাঁইয়ের প্রতিরোধ আমাদের আটকে না দেয় তাহলে আর চিন্তার কিছু নেই। কাজ হাসিল হয়ে যাবে।

আমরা উত্তরের অভিযাত্রী। মোটামুটি ১৩৫ ফিট গভীরতা দিয়ে চলবার চেষ্টা করছি। চুকৃচী সাগরে পড়বার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা বরফের দেখা পেলাম। একেবারে সম্মুখে। পাঁচ মাইলের মামলা। এটার সঙ্গী দোসর কেউ নেই। মাপটা হল ত্রিশ ফিট চওড়া, পঞ্চাশ ফিট লম্বা, জলের মধ্যে দশ ফিট নেমে এসেছে! চাঁইটার এবড়ো-খেবড়ো গড়ন যেন ভাসমান জলযানের মতো। এর ভেতর দিয়ে সূর্যের নীল আর সবুজ কিরণ বিচ্ছুরিত করছে। এ দৃশ্যে মনকে মোহিত ক'রে দেয়। অবিশ্যি গত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জেনে গেছি যে, এই মনোহারী বরফ

আদৌ কোমল-প্রকৃতি নয়, কংক্রীটের মতোই এর চরিত্র কঠিন। অতএব আমরা তাকে সমীহ ক'রে পথ ছেড়ে দিলাম। এর পরেই আমাদের পথে আরও ভাসমান বরফ এল। আমরা এঁকে বেঁকে নিজেদের বাঁচিয়ে সওয়া ন'টা পর্যন্ত একনাগাড়ে চল্‌লাম—মনে হচ্ছে এই বরফের আর শেষ নেই। দিগন্তকে আচ্ছন্ন ক'রে বরফ ছড়িয়ে রয়েছে! এখন আর ডুবে চলা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। একশ দশ ফিট দিয়ে চলার নির্দেশ দিলাম।

চলেছি মধ্যগতিতে, মাঝে মাঝে বরফের টাই পাচ্ছি। ১৬৮° ডিগ্রি দ্রাঘিমায় আমরা সুমেরু বৃত্ত অতিক্রম করলাম। আবার আমরা হিমাঙ্কের রাজ্যে এসে পড়েছি। অবিশ্যি জাহাজের খোলে ৭২ ডিগ্রি তাপে সে খবর টের পাচ্ছি না।

এই তাৎপর্যময় অবস্থায় পৌঁছনোর আত্মসন্তোষ বেশিক্ষণ উপভোগ করা আমাদের ভাগ্যে টিকল না। এদিকে জলের গভীরতা বিপদজনক ভাবে কমতে শুরু ক'রে দিয়েছে। বরফের ভাগটা এখন তেমন নেই, তাই বরফ-সন্ধানী গীয়ারটা দিয়ে চারদিক দেখেশুনে আমি ওপরে ওঠার হুকুম দিলাম। যাতে বরফের খবর পেলেই আবার চট্ করে নামতে পারি সেদিকটাও হিসেব ক'রে সেই-মতো রেডিও ব্যবস্থা রেখে এগোতে লাগলাম।

আস্তে আস্তে, অত্যন্ত সাবধানে ওপরে উঠে দেখলাম, ভাগ্য সুপ্রসন্ন—আমাদের চতুর্দিকে তুষারমুক্ত জলরাশি। জাহাজকে জলের ওপরে রেখে চালাবার আদেশ দিলাম। তীরভূমি এখান থেকে অনেক দূর। কাজেই আমাদের ধরা পড়বার আশঙ্কা খুব কম। আর, চুকৃচী সাগরের মতো অগভীর জলে, ভেসে চললে জোরে এগোনো যায়। পশ্চিম দরজার পিছনে সময়ের যে বৃথা অপব্যয় হয়েছে এই সুযোগে সেটা উসুল করে নিতে চাই।

দু-এক জায়গায় জলে-ভাসা বরফকে পাশ কাটাতে হচ্ছে। এমনি ক'রে আমরা সাত ঘণ্টায় নব্বই মাইল পথ এগোলাম। আমরা ৬৮ ডিগ্রি অক্ষাংশে, ৩০ কলায় পৌঁছবার সময় পরিচালন অফিসার খবর দিল যে, আমাদের সম্মুখে দিগন্ত আচ্ছন্ন করে বরফ জমে রয়েছে। ওই বিরাট তুষার মণ্ডলকে যত্নসহকারে অবেক্ষণ করলাম, পরিশেষে আমাদের সিদ্ধান্ত হ'ল যে ওটাই আমাদের আকাঙ্খার লক্ষ্য মেরু-তুষার। আবেগের

উত্তেজনায় নটিলাসের সর্বসত্তা শিহরিত হ'ল। এবার আমরা ডুব দেবো। ওই বরফের বুকের মধ্য দিয়ে নটিলাস ভেদ ক'রে এগিয়ে যাবে। এখন থেকে আর আমরা দিনের আলোর মুখ দেখবো না। তুষারের ওপারে ভেসে উঠে, আমরা আবার আকাশ দেখবো—সেই গ্রীনল্যাণ্ডের কাছে।

প্রথমে কোনো ঝামেলা হ'ল না, সবই বেশ স্বচ্ছন্দে চলছে। এখানে বরফের অনুপাত শতকরা পাঁচ ভাগ মাত্র—আমাদের অতিসুবেদী সোনার সেগুলো নির্ভুলভাবেই ধরতে পারছে। এক-এক জায়গায় বড় বড় চাঁই পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো জলের নিচে বিশ ফিট পর্যন্ত ঝুলে নেমে এসেছে, তবে আমাদের মাস্তুলের সঙ্গে তার দূরত্ব পঞ্চাশ ফিট। ওদিকে সমুদ্রতল থেকে আমাদের জাহাজের তলা প্রায় চল্লিশ ফিট ওপর দিয়ে চলছে। সাধারণ নাবিকদের কাছে এই ফারাক্তুটা কম এবং বিপদজনক মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বরফের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকার দরুণ আমরা আদৌ শঙ্কিত নই। বস্তুতঃ নিজেদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে, গতিবেগ বারো মাইলে চড়িয়ে দিলাম—অবশ্য, প্রতিটি জাহাজীর চোখে ঈগলের সতর্ক দৃষ্টি জাগ্রত। প্রত্যেকে আপন দায়িত্বে হুঁশিয়ার।

ঘণ্টাখানেক চলবার পর আমাদের সোনারের বাহুর সঙ্কেতে জানা গেল যে, আমরা এখন উপকূলবর্তী অনিশ্চিত বরফের হাত এড়িয়ে এসেছি এবার খাস মেরুতুষারের এলাকা পেয়ে গেছি। গত বছরে এই ধরনের বরফের মধ্যে প্রায় চৌদ্দ-শ' মাইল চলা-ফেরা করেছি, ভালো করেই চিনি। চালককে জাহাজের গতিবেগ বাড়িয়ে পনের মাইলে তুলতে বললাম।

কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে জাহাজীদের আস্তানায় ছবি দেখতে গেলাম, অদৃষ্টের পরিহাসেই হয়তো সেদিনের বইখানার নাম ছিল "হট্ ব্লাড"।

কিন্তু বেশিক্ষণ বসতে পারলাম না। দীর্ঘ দিনের পুঞ্জীভূত উদ্বেগ-অবিশ্রাম জনিত ক্লান্তিভারাক্রান্ত দেহটা ভেঙেচুরে আসছে যেন! কেবিনে ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম।

সতেরই জুন রাত এগারোটা। আমরা সিয়াট্ল ছেড়েছি আজ আট দিন হ'ল।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, কেবিন স্পীকারে লেঃ বিল লালরের বাজখাঁই আওয়াজ কানে গেল—"ক্যাপ্টেন ! এক্ষুণি একবার আসবেন ?"

ছুটলাম কণ্ট্রোল রুমে।

আমি ঘরে ঢুকতেই বিল লালর খোশ গল্পের মতো হাল্কা ভাবে বলল সবেমাত্র যে বরফের চাঁইখানা আমরা ডিঙিয়েছি সেটা তেষট্টি ফিট পুরু, তার সঙ্গে নটিলাসের মাস্তুলের ব্যবধান ছিল, মাত্র আট ফিট। তৎক্ষণাৎ বললাম, জাহাজকে বাঁ দিক দিয়ে চালাও, আরও তলায় চলে যাও, অন্ততঃ একশ চল্লিশ ফিট গভীরতা বজায় রেখে চলো। তার মানে সমুদ্রের মেঝে থেকে আমরা মাত্র বিশ ফিট ওপর দিয়ে চলবো। আমরা যখন বাঁক নিচ্ছি তখন প্রথম শ্রেণীর সোনারম্যান আল্‌ফ্রেড শারেট অত্যন্ত শান্ত ভাবে জানাল যে, বড় বড় দুটো বরফের টিলা আমাদের সামনাসামনি খাড়া মোতায়েন। নটিলাস এখন বরফ পাহাড়ের প্রথম স্তরের নিচে এসে পড়েছে !

দাঁড়াও, একেবারে ধীরে ধীরে চলো, ভাখো, দেখে, সমঝে চলো !

আমাদের সোনারের ওজন-পাল্লার হিসেবে পাওয়া গেল, এই অতিকায় তুষারশিলা যার নিচ দিয়ে আমরা যাচ্ছি সেটা চওড়ায় এক মাইলের চেয়েও বেশি। সাবমেরিণে ত অনেক বছর কেটেছে আমার, কিন্তু এরকম চরম অশান্ত আর কখনও ভোগ করি নি। এই দানবীয় তুষারের নিচ থেকে অবিলম্বে অব্যাহতি পেতে হবে। উঃ !

কিন্তু আমার কণ্ঠে উদ্বেগের ছিটেফোঁটা ফুটে উঠলে ত চলবে না। অরিত্রকে শক্ত ক'রে চালাতে বললাম—হাল ঠিক থাকে যেন।

আমরা যখন এই অতিকায় বরফের তলায় ঢুকলাম তখন আমাদের বরফ-নির্দেশকটি একেবারে নেমে ঝুলে পড়ল। রেক্স রাউব্রী যন্ত্রটি পরিচালনা করছিলেন। বিল লালর জাহাজের গতিপথ গতিবেগ এবং গভীরতার পরিমাপ নিয়ন্ত্রণ করছিল সেই সঙ্গে সোনারের বিবরণে নজর রাখছিল। সে এবং আমি নিজে—আমরা সকলেই স্থির দৃষ্টিতে যন্ত্রের দিকে চোখ রেখে রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছিলাম। আস্তে আস্তে যন্ত্রের কাঁটাটা সরতে লাগল। আবার আমাদের স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল। দানবাকৃতি বরফ ডিঙিয়ে আমরা পঁচিশ ফিট চলে এসেছি।

না, আমাদের বিপদ কাটে নি। যন্ত্রের সংকেতে দেখা যাচ্ছে আরও বড় বাধা সম্মুখে রয়েছে। একেবারে মুখোমুখি! সোনারের দিকে তাকিয়ে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। এতকাল যতো পুঁথিপত্র পড়েছি তাতে কোথাও এমন কথা লেখে নি তো!

আমরা ধীরে অতি সাবধানে একটু একটু ক'রে এগোচ্ছি। আমার চোখদুটো আবার নির্দেশক কাঁটার সঙ্গে সেঁটে গেল। কাঁটাটা আবার নামল, নিচে, আরও নিচে। নামতে নামতে তলায় ঝুলে এল। ঘাড়ের ওপর মাথাটা যেন আমার ঠিক থাকতে চাচ্ছে না। এ কী নটিলাস কি শেষে আটকে যাবে! একটা ছোট ছেলের মতো গুঁড়ি মেরে বেড়া ডিঙোতে গিয়ে জালে আটকে পড়বে? এর অনিবার্য পরিণাম, জাহাজের ক্ষতি—জাহাজ যদি জখম হয়, তাহলে আমাদের জাহাজের লোকেরা তিলে তিলে মরবে, শেষ হয়ে যাবে সব!

প্রতীক্ষা করছি, অবধারিত সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত ক'রে নিয়েছি। কখন শব্দটা শুনবো! ইস্পাতের সঙ্গে কঠিন বরফের ধাক্কা লাগার প্রত্যাশিত আওয়াজটা শোনবার জন্যে আমি উৎকর্ণ। যন্ত্রের কাঁটাটা এক জায়গায় একভাবে যেন যুগ যুগ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্থির হয়ে! আমাদের মাস্তুলের ঠিক ওপরেই বরফ ঝুলছে!

আমি এবং আর যারা প্রতিরোধের ঘাঁটিতে মোতায়েন তারা সকলে সেই একমাত্র পুরুষোত্তমের দিকে সহায়তার আশা নিয়ে তাকিয়ে আছি—এই মনে হ'ল আমার।

অবিমিশ্র কাতর হৃদয়ে আমরা সকলে আপন আপন কাজের জায়গায় নিজেকে আটকে রেখেছি। কেউ কোনো কথা বলছে না। নড়ছে না। হঠাৎ নড়েচড়ে উঠল কাঁটাটা। তারপর আস্তে আস্তে ওপরের দিকে উঠতে লাগল। নটিলাসের সঙ্গে বরফের দূরত্ব ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। তা হলে, এটাও পার হলাম আমরা! বরফটাকে ছাড়িয়ে পাঁচ ফিট চলে এসেছি। কতটা বরফ হবে? তা, যুক্তরাষ্ট্রের আবাল বৃদ্ধবণিতা প্রত্যেকের ভাগে অন্ততঃ একশ' পাউণ্ড ক'রে বেঁটে দেওয়া যাবে এত বরফ ওই একটা চাঁইতে ছিল।

আমাদের 'শুভদিনের যাত্রা' যে ষোলআনাই ব্যর্থ হয়ে যাবে, এই

অবধারিত দশাটুকু উপলব্ধি করতে আমার মাত্র কয়েক সেকেণ্ড লাগল। নটিলাসের মতো সাবমেরিণের পক্ষেও এই ধরণের বরফের সঙ্গে যুঝে, জয়লাভ সম্ভবপর নয়। আমাদের উত্তরে আরও মাইলের পর মাইল অগভীর জল পড়ে রয়েছে, তার গভীরতা হয় ত আরও কম, হয়তো বরফের চাপ আরও বেশি! বরফ আরও গভীর হবে তাতে সন্দেহ নেই।

এ অবস্থায় একমাত্র পথ রয়েছে দাক্ষণে। নিরুপায় হয়ে, অনিচ্ছাসত্বেও আমার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলাম। জাহাজীদের বললাম, আমরা বরফের মহল্লা থেকে চলে যাবো, সেখান থেকে বেতার বর্তায় সমস্ত অবস্থাটা জানিয়ে নৌসেনাধ্যক্ষ এ্যাডমিরাল বার্কের নির্দেশ চাইব। জবাবের জন্য প্রতীক্ষা করব।

অনেকক্ষণ সময় লাগল বেতারবার্তার খসড়া মুসাবিদা করতে। এতদিন ধরে মাসের পর মাস উদ্যোগ আয়োজন ক'রে, কতো উদ্বেগ আর দুর্ভোগ সয়েও শেষে পরাভূত হলাম—এই খবরটা কি ক'রে দিই? কি করে জানাই যে, আমরা ঢোকার প্রথম মুখেই প্রতিহত হয়েছি! এটা সুনিশ্চিত যে, আমাদের এখন তফাতে গিয়ে সব দিক ভালো ক'রে খতিয়ে দেখতে হবে। মুসাবিদাটা এইভাবে খাড়া করতে চেষ্টা করলাম যে, যখন বরফরাজি গভীরতর জলের দিকে সরে যাবে তখনই অভিযান সফল হতে পারে। আর, তাছাড়া আমাদের হাতে আরও অনেক তথ্যপত্র থাকা দরকার। আমাদের এই বরফের নিচের রহস্যলোক যেন চাঁদের অনাবিষ্কৃত অঞ্চলের মতো অন্ধকার, অপরিজ্ঞাত।

মাঝরাতে রেক্স রাউরি ওয়ার্ডরুমে এলেন এক পাত্র কফির তৃষ্ণা নিয়ে। হাল্কা হাসির তারল্যে তিনি বললেন, ওই সাংঘাতিক বরফের নিচ হিসেব রাখবার মারাত্মক কয়েকটি মুহূর্তে তাঁর বয়েস কয়েক বছর বেড়ে গেছে! আমিও নিজের আকস্মিক বার্ধক্যানুভূতির কথা স্বীকার করলাম। সত্যিই ত, আজ আমার জন্মদিন। আমি সাঁইত্রিশে পা দিলাম।

॥ সতেরো ॥

আমরা দক্ষিণ দিকে চলেছি, ফিরে চলেছি বেরিং প্রণালী অভিমুখে। বেদনাদায়ক প্রত্যাবর্তন, যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতিতে জাহাজের সর্বসত্তা জর্জর। বরফের আচ্ছাদনও ক্রমশঃ লঘুতর হয়ে আসছে। মাঝে মাঝে বিশ-ত্রিশ ফিট গভীরে নেমে আসার বরফের দেখা পাচ্ছি। মেরু অববাহিকার পথ রোধ ক'রে যে তুষার দানব বাধা দিয়েছে, ব্যর্থ করেছে আমাদের, সে ধরণের বরফ আর পেলাম না।

বুধবার আঠারই জুন সকালে আমরা মাথার ওপর পরিষ্কার জল পেলাম। তুষারমুক্ত জল পেয়ে আমরা পেরিস্কোপ-গভীরতায় উঠে এলাম। আজ ন'দিন হ'ল আমরা সিয়াটল থেকে রওনা হয়েছি। আস্তে আস্তে ভু'নম্বর পেরিস্কোপটা তুলে দিলাম। স্কোপটা চতুর্দিকে ঘুরিয়ে উত্তাল তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্রের কালো জলের দিকে তাকিয়ে বললাম—"একেবারে পরিষ্কার। বরফ নেই। 'পোর্ট হুইপ'কে ওঠাও, বেতারে সি, এন, ও, কে আমাদের খবর পাঠাও।"

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই পার্লহারবারে অবস্থিত নৌ-বেতার সাঙ্কেতিক ভাষায় সাড়া দিল, 'তোমাদের কথা স্পষ্ট শুনছি, শব্দ বেশ জোরালো। বলো, তোমাদের খবর বলো।"

মেরু অঞ্চলের আবহাওয়া সাধারণতঃ বেতারের প্রতিকূলতা করে, খবরাখবর মোটে বোঝাই যায় না! তাই আমাদের রেডিওম্যান হ্যারি টমাস খুব অবাক হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি ডান হাতে টেলিগ্রাফের চাবীতে রেখে 'টকা-টক' কাজ শুরু ক'রে দিল। ভারাক্রান্ত মনে না ভেবে পারলাম না যে, আর ক' মিনিটের মধ্যেই পেণ্টাগনে আমার রিপোর্ট পৌঁছে যাবে।

আজকের আবহাওয়া পরিষ্কার, দৃষ্টি বিঘ্নিত হচ্ছে না। ঢেউ এর ফণা

চার ফিট অবধি উঠছে, কিন্তু ত্রিশ মাইল বেগের বাতাস ঢেউ-এর চূড়ায় ঘা মেরে সাদা ফেণা ছিট্‌কে তচ্‌নচ্‌ ক'রে দিচ্ছে! আকাশ পরিষ্কার, জল তুষারমুক্ত, কাজেই আমরা এখন পেরিস্কোপ গভীরতা দিয়ে চলতে থাকবো, রেডিওর শুঁড় বাগিয়ে রাখতে হবে—ওদিক থেকে সি, এন, ও'র কি খবর আসে, দেখি! অক্সিজেনের ট্যাঙ্কগুলো বন্ধ রেখে সাশ্রয় করতে বললাম। মূল্যবান আনবিক শক্তি বাঁচাবার জন্য, পল আর্লিকে একটা শ্যাফ্‌ট টারবাইনে চালাবার অনুমতি দিলাম। এতে আমাদের জ্বালানী খরচ করে, গতিবেগেরও বিশেষ কম্‌তি হয় না।

বেশিক্ষণ কাটল না আরামে, আবার শুরু হল বরফ। যতদূর চোখ যায় বরফ ছাড়া আর কিছুই নেই, এ কি হল? আমরা বেশ ধোঁকায় পড়লাম। যখন উত্তরে চুক্‌চী সাগরের এই পথ দিয়ে গিয়েছিলাম তখন ত কিছুই ছিল না। হয়তো দমকা দক্ষিণ-পশ্চিমের কোনো ঝোড়ো হাওয়া বরফের দলকে আমাদের যাত্রাপথের পূর্বে ডেকে এনে মোতায়েন করে দিয়েছে। তাড়াতাড়ি পেরিস্কোপের নল, রেডিওর দণ্ড সব নামিয়ে নেওয়া হ'ল। ডুব দাও! হুকুম দিলাম ডুবে চলতে। সাধারণ ক্ষেত্রে গভীর জল দিয়ে ডুবে চলাটাই আমাদের রীতি—তাড়াতাড়ি চলা যায়। কিন্তু এইসব অগভীর জলে পদে পদে ওপর আর নীচের দূরত্ব-সাম্য হিসেব কষে এগোতে হয়, এই ধীর মন্থর বিঘ্নিত গতি বিরক্তিকর। কোথায় কি ধরণের বরফের বাধা অপেক্ষা করছে বলা ত যায় না।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যের কাছ বরাবর আমরা একটা অল্প জলের স্তরে এসে পৌঁছলাম, এই অগভীর জলের মধ্য দিয়ে একনাগাড়ে চল্লিশ মাইল চলতে হবে। উত্তরের যাত্রায় এই পথ পরিষ্কারই ছিল, এখন তার উপর সাইবেরিয়ার উপকূল থেকে ভাসা বরফের আমদানী হয়েছে,—চাঁই-চাঁই বরফের স্তূপ। একটা জায়গা ফাঁকা পেয়ে জাহাজটা ওপরে তুললাম—পরিবেশটা ভালো ক'রে দেখে নেবার জন্য। যা অনুমান করেছিলাম তাই মিলে গেল—জলের নীচ দিয়ে চলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমরা তিন দিক থেকে ঘেরাও হয়ে পড়েছি। এখন যা অবস্থা তাতে হয়তো কয়েক-দিনের মধ্যে আমাদের আর উপরে ওঠার উপায় থাকবে না, এমন কি পেরিস্কোপ-গভীরতায়ও চলতে পারবো না।

ডেকের অফিসার পল্ আর্লিকে হুকুম দিলাম, জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে উত্তরে খোলা জলের দিকে চলো। আস্তে আস্তে আমরা তলায় ডুব দিলাম তারপর আবার দক্ষিণে ফিরে চলতে লাগলাম—একেবারে সমুদ্র-তলের ওপর দিয়ে। অল্পক্ষণের মধ্যেই বরফের রাজ্যভার মাথায় রেখে, প্রায় কাদার ওপর দিয়ে চলা শুরু হ'ল—সমুদ্রতল থেকে মাত্র কয়েক ফিট ওপর দিয়ে যাচ্ছি আমরা। সোনারের খবর হচ্ছে, মাথার ওপর বরফের চাপ বেড়ে চলেছে, গভীরে নেমে এসেছে বরফের চাঁই। পরিচালন অফিসার লেঃ লালির এবং কার হরদম এপাশ-ওপাশ দিয়ে গভীর বরফের হাত এড়িয়ে চলছে। এখন আমরা এক-ইঞ্চি দু-ইঞ্চির সুযোগও হাতছাড়া করছি না—নিচে নামবার লক্ষ্য সর্বক্ষণ। নীলামের হাঁকের মতোই ঘন ঘন ফ্যাদোমিটারে গভীরতার রিপোর্ট ঘোষণা করা হচ্ছে। আমাদের এই চল্লিশ মাইল পথ যেন দুরারোহ পার্বত্য যাত্রা—এঁকে-বেঁকে, উঁচুনিচু পথে মোড় ঘুরে ঘুরে চলা। এই হল আমাদের ঐতিহাসিক, স্মরণীয় সমুদ্র যাত্রা।

কয়েক ঘণ্টা এইভাবে চলার পর জলের গভীরতা একটু একটু ক'রে বাড়তে লাগল। এক সময়ে আমাদের ফ্যাদোমিটারে দেখা গেল, জল এখানে একশ কুড়ি ফিট গভীর। এই সময়ে নেভিগেটর কোপ্ জেঙ্কস বলল—"ক্যাপ্টেন! এবার আমরা জেঙ্কস-এর গভীরতায় পৌঁছেছি!" আমিও রসিকতা করে বললাম—"অবিশ্যি! আমি নৌ-বিভাগের জলশাখার কাছে দরখাস্ত করব, তোমার নামে গভীরতম অঞ্চলের নাম ক'রে তোমায় সম্মানিত করা হোক।"

মাঝরাতে খোলা জল পেয়ে আমরা ওপরে উঠলাম। জলের ওপর বেতারের যন্ত্রটা তুলে দিলাম। সিপ্রন-ও'র তরফ থেকে কোনো খোঁজ খবর আছে কি না জেনে নেওয়া যাক। আমার আন্দাজই ঠিক। বেতার তরঙ্গে আমাদের কাছে বার্তা পাঠানো হচ্ছে। ইলেকট্রিশিয়ানের সাকরেদ মর্লি রেডিয়োম্যানের ঘাড়ের উপর ঝুঁকে পড়ে দেখে আর একজন জাহাজীকে বলল—"এটা কোনো সাঙ্কেতিক ভাষা নাকি? কিম্বা আমাদের বিদ্যের দৌড়ে কুলোচ্ছে না। এক বর্ণও পড়তে পারছি না হে!"

খবরটা সাঙ্কেতিক ভাষাতেই ছিল—চরম গোপন বার্তা। তাতে মোটের উপর এই কথাই বলা হয়েছেঃ বরফ ঢাকা এলাকা থেকে পিছু হঠে এসে তুমি যথার্থ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছ, আমি তোমার এ কাজ ষোল আনা সমর্থন করছি। বেশ বুঝতে পারছি যে, সর্বতোভাবে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছ তুমি। পার্ল হারবারে ফিরে এসে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্তও আমি সমর্থন করছি। যতক্ষণ পর্যন্ত উপযুক্ত সুযোগ না আসে ততক্ষণ প্রতীক্ষা করাই আপাততঃ আমারও মত। ফিরে এস। এর পর কি করতে হবে তার নির্দেশ পরে দেওয়া হবে। গোপনতা রক্ষা করে চলো।" স্বাক্ষরকারী "আর্লেই বার্ক।"

চুকৃচী সাগরের বরফ ছাওয়া একশ মাইল পথ পেরিয়ে দক্ষিণ মুখ ধরে চলে এলাম। বেরিং প্রণালীর ওপর দিয়ে এগিয়ে এসে বেরিং সাগরের অগভীর জলে প্রবেশ করলাম আমরা। জুনের বিশ তারিখে আমরা খোলা জলে পড়লাম। এখান থেকে পার্ল হারবার যাওয়া ত এমন কিছু সমস্যা নয়—অবিশ্যি, একান্ত গোপনতা রক্ষার ব্যাপার নিয়ে মাথা খাটাতে হবে শুভ দিনের যাত্রা'র নিরাপত্তা বজায় রাখা দরকার।

এ সব ব্যাপারে ছোটখাট কিছুই উপেক্ষা করা চলে না। সব দিকে কড়া নজর রাখতে হয়। জাহাজীদের উপদেশ নির্দেশ দেবার সময় আমি আমার জীবনের সর্বপ্রথম 'একান্ত গোপনীয়' পরোয়ানা জারি করলাম। এই পরোয়ানায়, শুভদিনের যাত্রা সম্পর্কে জাহাজের মধ্যে বা বাইরে কোনও লিখিত বা মৌখিক আলোচনা বা উল্লেখ নিষিদ্ধ ব'লে ঘোষণা করা হ'ল। জাহাজের ওপর এ সম্পর্কে আপোষ আলোচনা কেবলমাত্র কার্য-নির্বাহক অফিসার বা ওপরওয়ালার সঙ্গে চলতে পারে।

জাহাজের ওপর যারা রয়েছে তাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ ব্যক্তিগত জিনিসপত্র তল্লাসী ক'রে শুভদিনের যাত্রা সম্পর্কিত কাগজ, চিঠিপত্র বা নক্সা বা অন্য কিছু পাওয়া মাত্র সেগুলো খামে এঁটে তাতে 'একান্ত গোপন' শীলমোহর লাগিয়ে জাহাজের কর্তার হেফাজতে জমা রাখতে বলা হল। এগুলো অনির্দিষ্ট কালের জন্য আটক রাখা হবে। এই নির্দেশ সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য—জাহাজের সরকারী কাগজপত্র, নক্সা, বিবরণী, নথি, এমন কি আলাস্কার গাঁয়ে আমার তিন বছরের ছেলে বিলের জন্যে যে

শৌখীন স্লিপার কিনেছি সেটি পর্যন্ত বাদ গেল না। এই সব জিনিষে কাগজে আমাদের তিন-তলার সিন্দুকটা বোঝাই হয়ে উপছে উঠল।

আমাদের এই কট্টর নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে কেন্দ্র ক'রে অনেক হাসি তামাশার খোরাকও জুটল। মেরু তুষারের সঙ্গে সংগ্রামে অবসন্ন জাহাজীদের পক্ষে একটু হাসি-রঙ্গ খুব দরকারও ছিল বই কি। জাহাজের ব্যঙ্গচিত্রশিল্পীকে দিয়ে এক জাহাজী তার শার্টের গায়ে আমাদের মেরু-স্মারক ছাপ আঁকিয়ে নিয়েছিল। তার দুটো শার্টেই নিরাপত্তার আওতায় পড়ে যাওয়ায় সে মন্তব্য করল—"পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম শার্ট একান্ত-গোপনতার মর্যাদা পেল!" যেহেতু ঠাণ্ডা অঞ্চলে সফরে সবাই দাড়ি রাখে। অতএব দাড়িও ত সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে, তাই হুকুম দিলাম সবাইকে দাড়িকামিয়ে ফেলতে হবে। জাহাজীদের মধ্যে থেকে একজন তার ওপরওয়ালা চীফ টর্পেডোম্যান লার্চের কাছে জিজ্ঞাসা করল, কামানোর পর দাড়িগুলো একটা খামে ভর্তি ক'রে তার ওপর 'একান্ত গোপন' ছাপ লাগিয়ে রাখতে হবে ত!

মেরু অভিযানের যাবতীয় হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি এমন কি শীতের পোশাকপত্তর পর্যন্ত লুকিয়ে ফেলা হ'ল। পার্ল হারবারের পথে চলতে চলতে আমি একটা গল্প খাড়া করলাম। আমরা যে পানামায় গেলাম না কেন এবং কোথায় কি ভাবে কাটালাম তার ত একটা বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ মজুত রাখতে হবে! আমরা দক্ষিণে সফর করে এলাম বিষুবরেখার কাছাকাছি গিয়েছিলাম। তার প্রমাণ, ওই ত নক্সা লট্‌কানো আছে আমাদের সফরের। এই সফরে কবে কি ঘটেছিল, আর কেনই বা গিয়েছিলাম সে কৈফিয়ৎটা যাতে সকলের মুখ থেকে একধরণের হয় সেই সঙ্গতির জন্য আমি একটা ছোট রচনা লিখে ফেললাম, তার উপসংহারে সিদ্ধান্ত এই: আমাদের এই সফর মামুলি ব্যাপার—উল্লেখযোগ্য কোনো বাস্তব সমস্যা দেখা দেয় নি। পরিবেশ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখার দখলে আমাদের যন্ত্রপাতি আশ্চর্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছে। আণবিক সাবমেরিন নিয়ে বিষুবরেখা অতিক্রমের পরিকল্পনাই করা হয়েছিল; কিন্তু, জুনের বিশ তারিখে, যখন নটিলাস বিষুবরেখা থেকে অনেকটা উত্তরে, তখন হঠাৎ নৌ-দপ্তর থেকে নির্দেশ পৌঁছলো সেই অনুযায়ী আমরা

সফর বদলে পার্লহার্বারে চলে আসতে হ'ল। আপাততঃ বিষুবরেখা পার হওয়ার সুযোগ হারানো এবং আমাদের ঘরে পৌঁছতে না পারাতে মন ত খারাপ হবেই—হয়েছে বই কি। তবে, আমাদের এই ভবঘুরে জাহাজটায় চড়ে হাওয়াই বেড়িয়ে যাওয়াটা বেশ মজাদার ব্যাপার হল।...

পার্লহারবারের থেকে একদিনের পথ দূরে রয়েছি, এমন সময়ে রেডিও-যোগে সি-এন-ওর দপ্তর আমাকে ওয়াশিংটন পৌঁছবার নির্দেশ দিল। ওয়াশিংটন এবং নিউ লণ্ডনে গিয়ে আমি যেন সি এন ও এবং আটলান্টিক সাবমেরিনের প্রধান সেনাপতি এ্যাডমিরাল ওয়ার্ডারকে আমাদের ব্যর্থ অভিযান সম্পর্কে আনুপূর্বিক অভিহিত করি—এই নির্দেশ। আমার জন্য নৌ-বিভাগের একটি এরোপ্লেনও ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে।

যেহেতু আমার এরোপ্লেনে আরও কয়েকজন যাত্রী নেবার মতো জায়গা থাকছে, আমি দপ্তরের কাছে কয়েকজন জাহাজীকে এই প্লেনে নেবার অনুমতি চেয়ে পাঠালাম। যে ক'জন বিবাহিত জাহাজীকে পারি সঙ্গে নিতে চাই। অনুমতি মিলল। মোটমাট ছাব্বিশ জন অফিসার আর নাবিককে নেওয়ার ব্যবস্থা হল। এদের মধ্যে একজন বলেছিল—"আমার জীবনে এই প্রথম একটা অদ্ভুত সুযোগ মিলল—বাহাত্তর ঘণ্টা স্বাধীনতার জন্য এগার হাজার মাইল উড়ো সফর, এ যেন ভাবাই যায় না।"

আমরা তখনো পার্লহারবার থেকে দুশো মাইল দূরে রয়েছি—একবার ওপরে উঠতে বললাম।—এবার বেতারে খোলা-গলায় সামুদ্রিক বাণিজ্য বিভাগীয় অপারেটরকে ডাকলাম। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি সাড়া দিল। তার দুমিনিটের মধ্যেই তার সহায়তায় আমি কানটিকাটের 'মিষ্টিকে'র সঙ্গে আমার সংযোগ ঘটল। এবং এক মিনিট। পেরুবার আগেই আমি বনির কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম!

ওকে বললাম—"হ্যালো! শোনো, আমরা এখন পার্লহারবার থেকে একদিনের দূর-পথে! আচ্ছা! আমরা যে এখানে আসছি সে খবর কেউ দিয়েছে নাকি তোমাকে?"

"হ্যাঁ!" ওর গলায় অস্থির উন্মাদনার আভাষ পাচ্ছি।" এই একটু আগে এ্যাডমিরাল ওয়ার্ডার ফোন করেছিলেন।" তারপর হাসি-উছল সুরে বলল—"আমি ত বাঁধা-ছাঁদা শুরু ক'রে দিয়েছি।"

ওয়াহু জাহাজে যে আমলে কর্তা ছিলাম সেই সময় পার্লহারবারে বনির সঙ্গে অনেক দিন কেটেছে। সেই পুরনো দিনে আজ আমাদের দুজনের জীবনকে ঘিরে কতো ঘটনার নুড়ি আজ স্মৃতির হীরে-মুক্তো হয়ে দ্যুতি দিচ্ছে।

আমি বললাম—" তিষ্ঠ! অতো অধীর হয়ো না। আমি এখন ওয়াশিংটন যাচ্ছি। সেখান থেকে নিউ লণ্ডন। তা বলছিলাম কি, তুমি যদি ওয়াশিংটনে চলে আসো, তাহলে দু'জনে একসঙ্গে নিউলণ্ডনে যাবো। তারপর আমার সঙ্গে তুমি এখানে এসে পড়তে পারো।

আমার কথাটা ওর মনে ধরল। ও রাজী হয়ে বলল যে, আর সব জাহাজীর বৌদের খবর দিয়ে দেবে নটিলাসের সবাই ভালো আছে।

কথা শেষ হবার পর আমার মনে হ'ল অনায়াসে বার্তা ব্যবস্থার দৌলতে পৃথিবীটা যেন গুটিয়ে ছোট হয়ে গেছে।

জুনের আটাশ তারিখ সকালে আমরা ডায়মণ্ড হেড পার হয়ে আমরা দক্ষিণ-পশ্চিমের দিকে এদিকে চললাম। আমরা যে বিষুবরেখার উত্তর দিক থেকে কল্পিত সফরশেষে পাল'হারবারে ঢুকছি, সেই ধারণাটা লোকের মনে জন্মে দেবার জন্যেই এইভাবে ঘুরো পথ ধরলাম। সকাল ছটার সময় উত্তর দিক থেকে পাল'হারবারে প্রবেশ করলাম। দক্ষিণের সফর থেকে ফেরার অনুকূল ভাবধারায় নিজেকে প্রস্তুত ক'রে নিলাম—আমার মতো জাহাজের আর সকলেও নিশ্চয় এই ভাবে নিজেকে গুছিয়ে নিল।

আমরা আস্তে আস্তে পেরিস্কোপ গভীরতায় উঠে এলাম। পেরিস্কোপের মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল ওয়াহুকে দেখতে পাচ্ছি। স্বস্তির আরাম। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই নটিলাস নিঃশব্দে জলের উপর ভেসে উঠল। লার্চের কতৃত্বে ডেকের দল চটপট জাহাজের উপরে চড়ে আমাদের পরিচিতির সাংস্কৃতিক সংখ্যাটা রং দিয়ে লিখে ফেলল। ওরা ফিরে এসে খবর দিল যে, জাহাজের অঙ্গসৌষ্ঠব এত সুন্দর রয়েছে যে দেখে মনেই হচ্ছে না যে আমাদের ওপর দিয়ে ছ-হাজার মাইলের সফরের ধকল গিয়েছে।

নির্দিষ্ট সময়েই আমরা পাল'হারবারে প্রবেশ করলাম। একটি ছোট বোটে করে এ্যাডমিরাল হপ্‌উড্‌ এবং এ্যাডমিরাল গ্রেনফেল এসে আমাদের জাহাজে উঠলেন। এঁরা দুজনে নটিলাসে হাজির হয়ে আমাদের

যে-ভাবে সমাদর আর অভিনন্দন জানালেন তাতে বড় কুণ্ঠিত হয়ে পড়লাম। এঁদের অভিনন্দনের আয়োজন খুব মনোজ্ঞ হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহই নেই।

জাহাজ যখন বন্দরের অন্দর মহলে ঢুকল তখনই ত্রিশ ফিট লম্বা বিরাট এক পুষ্পমেখলা পোতাগ্রে ভূষিত করা হ'ল। অনেকগুলো হেলিকোপ্টার ওপর থেকে উড়তে উড়তে নিচে নেমে অভিবাদন করতে লাগল আর সেই সঙ্গে সহস্র সহস্র অর্কিড আর পুষ্প বৃষ্টি ক'রে জাহাজের ওপর আর আশ-পাশের জল ছেয়ে দিল। বন্দরে যতো জাহাজ হাজির ছিল তারা লম্বা একটানা বাঁশী বাজিয়ে আমাদের স্বাগত জানালো। সমুদ্রের ধারে হাজারো লোক জড়ো হয়েছে প্রথম আণবিক সাবমেরিণ দেখবার জন্যে। সাবমেরিণ ঘাঁটিতে নৌ-বিভাগের ব্যাণ্ড বাজছে "auchor aweigh" সুরে আর সেই সঙ্গীত ছন্দে দ্বীপবাসিনী চারজন সুন্দরী হুলা নাচ নাচছে। নটিলাসের প্রতিটি প্রাণী এই সমারোহময় অভ্যর্থনায় বিমোহিত!

ঠিক বেলা দশটায় আমাদের কোয়ার্টার মাস্টার সীম্যান ইউইল্ তার বিবরণীপত্রে লিখল—"পাল'হারবার যুক্তরাষ্ট্রীয় সাবমেরিণ ঘাঁটিতে বন্দরের দিকে এক নম্বর পিয়েরাতে নোঙর ফেলা হয়েছে।" ডঃ লয়েন আর রাউরীকে আবার বন্দী দশায় রাখা হ'ল।

এখানে নোঙর করার চার ঘণ্টা পরে, নৌ-বিভাগের এক উড়ো জাহাজে নটিলাসের কজন জাহাজী ওয়াশিংটনের যাত্রী এবং আমি ওয়াশিংটনের পথে উড়লাম। সেখানে বনির সঙ্গে দেখা হ'ল। পেন্টাগণে অফিসারদের কাছে আমাদের সফরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ ক'রে আমরা দু'জনে নিউ লণ্ডনে হাজির হলাম।

অবশেষে বাড়ি পৌছলাম। কিছুক্ষণ হাত পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নিলাম।

মাইক আর বিল আমার দুটি ছেলেই কম ক'রে তিন ইঞ্চি ঢ্যাঙা হয়েছে। মিস্টিকের সমুদ্রবন্দর গ্রীষ্মকালীন যাত্রী সমাগমে জম-জম করছে। পিছনের টোম্যাটো চারাগুলো ঝাঁঝালো হয়ে উঠেছে। এই সব চেনাশোনা ঘরোয়া পরিবেশে এসে এখন অনাত্মীয়-জনোচিত বন্ধুর মেরু অঞ্চল যেন লক্ষ মাইল দূরের দুঃস্বপ্নময় কল্পনা মনে হচ্ছে।

॥ আঠারো ॥

পেণ্টাগণে মুষ্টিমেয় জন কয়েক জ্যেষ্ঠ অফিসারের সমক্ষে আমি শুভদিনের যাত্রা'র আদ্যন্ত বিবরণ দিলাম। সেই সঙ্গে জোর দিয়ে বললাম যে, আমার বিশ্বাস জুলাই-এর শেষ দিকে আর একবার চেষ্টা করা উচিত, তাতে ফল ভালো হবে।

এটা আমি বুঝেছি তুষার অঞ্চলের অবস্থা সম্পর্কে আমাদের আরও অনেক কিছু জানা বাকী রয়েছে। স্ফটিকাকৃতি গোলকের বার্তায় আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। অতএব আমি প্রস্তাব করলাম, চুকৃচী সাগরের ওপর বার বার আকাশ পরিক্রমা ক'রে ওখানকার বরফের অন্ধি-সন্ধি নাড়ি-নক্ষত্র সব পর্যবেক্ষণ করতে হবে। সে-বারের মতো এক-ইঞ্জিনের ক্ষুদে এরোপ্লেনে ক'রে চক্কর মেরে চলে আসা নয়, দস্তুর মতো দূরপাল্লার নৌ-বিভাগীয় এরোপ্লেনে ক'রে চলাফেরা করতে হবে। আমার ওপরওয়ালারাও তাতে রাজী। কিন্তু, সেই গোপনতা বজায় রাখার সমস্যাই আমাদের ভাবিয়ে তুলল। আমাদের আসল মতলবটা যাতে কেউ টের না পায় এমনভাবে যাতায়াত করতে হবে। কাজটা মোটেই সোজা নয়।

সমাধানের সম্পর্কে এটা-ওটা অনেক ভেবে শেষে কমাণ্ডার ডিউফ বেইন বললেন যে, নটিলাসের একজন অফিসারকে আলাস্কায় পাঠিয়ে দেওয়া হোক, সে ওখানে গিয়ে সব বন্দোবস্ত ক'রে ফেলুক। বেইন আমাদের 'শুভদিনের যাত্রা'র উদ্যোগ-আয়োজনের ব্যাপারে প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছেন। পদে পদে মাথা ঘামিয়েছেন। তাঁর এই প্রস্তাবটা এ্যাড্‌মিরাল কম্বস এবং ডাসপিট যেন লুফে নিলেন।

প্রথমে ভেবেছিলাম যে, আলাস্কায় আমিই যাবো। কিন্তু এতদিনের জন্যে জাহাজ ছেড়ে থাকলে ত চলবে না। পার্ল হারবারে থাকাকালীন নটিলাসের কতকগুলো ব্যাপার নিজে হাজির থেকে তদারক

না করলে চলবে না। কাজেই শেপ্ জেঙ্কসকে পাঠানোই স্থির করলাম— কাজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অবিশ্যি জেঙ্কসের ওপর আমার আস্থা রয়েছে। তা ছাড়া জেঙ্কস এখন নিউ লণ্ডনে ছুটিতে এসেছে, ওকে পাঠালে জাহাজের কেউ টেরও পাবে না। কিন্তু আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরতি প্লেনে চড়ে সে পার্লহারবারে চলে যাবে। তার আগেই ওকে ধরতে হয়। টেলিফোন তুলেই তাকে বললাম—"শোনো শেপ! বার্বারার কাছে আমি মাফ চাইছি, তোমাকে আটকে না রেখে আমার উপায় নেই, বুঝলে, নিউ লণ্ডনেই থাকতে হবে তোমায়। কেন? তা বলা যাচ্ছে না। কাল রাত্রে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।"

পরদিন সন্ধ্যেবেলা মিস্টিকের পিছনের বারান্দায় বসে জেঙ্কসের কাছে পরিকল্পনার আদ্যন্ত ফাঁস করলাম। বলা বাহুল্য যে, আমি হাঁ করতেই সে সবটা বুঝে ফেলল।

জেঙ্কসের পরিচয়পত্র গোপনের ব্যাপারটা সাজিয়ে ফেলা হল। অবিলম্বে সে ওয়াশিংটনে চলে যাবে। তারপর নটিলাসের অফিসার পদ থেকে তাকে পেন্টাগণের একজন অফিসার বানানো হবে। সি'এন'ও'র 'ওপিতত' শাখার বিশেষ প্রতিনিধি হয়ে পড়বে সে। সি'এন'ওর ভেতরে কাজকর্ম তদারকে তাকে বহাল করা হলেই, সাবমেরিনের সঙ্গে তার যোগচিহ্নটা ঘুচে যাবে। জেঙ্কস পেন্টাগণের সহকর্মীদের নাম-টাম জেনে নেবে, তাদের কাজকর্মের ধারা ধরণও সাময়িকভাবে রপ্ত করে নেবে। সুমেরু-কুমেরুর পরিকল্পনার কাজের মধ্যে তাকে জড়িয়ে ফেলা হবে এবং চুকৃচী সাগরের বরফের হালহকিকৎ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবার জন্য সেই পরিচয়েই সে আলাস্কায় যাবে।

নিউ লণ্ডনের রিয়ার এ্যাড্‌মিরাল ওয়ার্ডারের মাধ্যমে জেঙ্কসকে কতকগুলি নির্দেশ দেওয়া হ'ল, তাতে নটিলাসের নামগন্ধও রইল না, এমন কি কোনো সাবমেরিন সংস্থারও উল্লেখ রইল না। আমি হলফ ক'রে বলতে পারি যে, এই সব কাণ্ডকারখানা দেখে জেঙ্কসের স্ত্রী খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল। এর পর তিনটে দিন বেচারার খুব উদ্বেগেই কেটেছে। জেঙ্কস বাড়িতে আর কিছুই বলেনি, শুধু বলেছে যে, নটিলাস পার্লহারবার ছাড়ার আগে দিন কয়েকের জন্য জেঙ্কসকে ওয়াশিংটনে কাটাতে হবে।

এর ওপর রহস্যের রং চড়ল। যখন সে বলল যে, এর মধ্যে হয়তো তার পক্ষে চিঠিপত্র লেখা সম্ভব হবে না এবং বার্বারাও কোনো যোগাযোগ রাখতে পারবে না। অবিশ্যি বার্বারা কোনো প্রশ্ন করেনি এ প্রসঙ্গে।

জুলাই-এর সাত তারিখে জেঙ্কস পেন্টাগনে ডিলক বেইনের কাছে হাজির হ'ল ঝটিকাগতিতে পাঁচ ঘন্টার মধ্যে তাকে পেন্টাগনের সংগঠন সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়ার পালা চুকল এবং সে তার নতুন 'কর্তা' ওপিতত-এর প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন হারল্ড হ্যামলিনের সঙ্গে দেখা করল। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই 'উন্মুক্ত ভ্রমণে'র পরোয়ানা হাতে নিয়ে সে বিমান বন্দরে রওনা হ'ল। আরো অনেক কথার সঙ্গে সেই পরোয়ানাতে স্পষ্ট লেখা ছিল।" "আপনি উপরোক্ত জায়গাগুলির মধ্যে যে কোনও জায়গা বাদ দিতে পারেন। বা আপনার বিবেচনা অনুযায়ী প্রয়োজনবোধে আপনার ভ্রমণের ছক বদলে অন্য পথে চলাফেরা করতে পারেন।" যে লোকটা মোটর চালিয়ে জেঙ্কসকে বিমান বন্দরে নিয়ে যাচ্ছিল তাকে জেঙ্কস চেনে, ওর নাম হচ্ছে ইঞ্জিনম্যান প্যাকেট। লোকটি সাবমেরিণ বিভাগেরই কর্মচারী, এখন উপকূলের কাজে নিযুক্ত রয়েছে। জেঙ্কস পরে বলেছিল।" "প্যাকেট যদি টের পায় যে সে শুভদিনের যাত্রার কাজ করছে, তাহলেই কেলেঙ্কারী! আমার খুব ভয় হয়েছিল, ফেঁসে না যাই।"

চার হাজার মাইল দৌড়দারী ক'রে সাঁইত্রিশ ঘণ্টা পরে জেঙ্কস আলাস্কায় পৌঁছেছিল। জেঙ্কসের পকেটে এ্যাডমিরাল কম্বসের দেওয়া পরিচয় পত্র রয়েছে। কম্বস এই চিঠি দিয়েছেন আলাস্কা সমুদ্র সীমান্তের সেনাধ্যক্ষ রিয়ার এ্যাডমিরাল ম্যাককেচ্নির কাছে। এবং 'শুভদিনের যাত্রা' সম্পর্কে সব কথা ম্যাকৃকেচ্নিকে জানাবার অধিকারও জেঙ্কসকে দেওয়া হয়েছে।...এ্যাডমিরালের দপ্তরে পৌঁছবার অনেক আগেই জেঙ্কসের সাজ-পোশাক থেকে হাবভাব সবকিছুই সাবমেরিন বিভাগের ছায়াযুক্ত হয়ে গেছে। এমন কি, আহার-বিহার-সিগারেট কেনার কড়িটুকুও সে তার ব্যক্তিগত সঞ্চয় ভাণ্ডার থেকে সংগ্রহ করেছে।

এ্যাডমিরালের ঘরে যখন সে তার উদ্দেশ্য জ্ঞাপনের জন্য বসল তখন সেখানে এ্যাডমিরালের প্রধান সহকারী ক্যাপ্টেন রোলার্ড উপস্থিত ছিলেন। একটু কুণ্ঠিত, বিব্রত দৃষ্টিতে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে সে বলল—"দেখুন

মশাই, কিছু যদি না মনে করেন ত বলি! আমার ওপর হুকুম আছে যে,—শুধু এ্যাডমিরাল সাহেবকেই আমার বক্তব্য জানাতে হবে।" এরপর ক্যাপ্টেন রোলার্ড ত্রুটী স্বীকার ক'রে বিদায় নিলেন।

শুভদিনের যাত্রা সম্পর্কে সব কথা শেষ ক'রে জেঙ্কস তার আকাশ পথে তুষার পর্যবেক্ষণের জন্য যা-যা দরকার তা জানাল।

এ্যাডমিরাল তাঁর কয়েকজন কর্মচারীকে ডেকে খুঁটিনাটি বন্দোবস্তের ফর্দ তৈরী করে ফেললেন। তারা শুধু এইটুকু জানল যে, 'ওপিন্তত' থেকে জেঙ্কস আলাস্কায় এসেছে, বিশেষ কাজের ভার দিয়ে তাকে এ্যাডমিরাল ম্যাককিচ্‌নের কাছে এ্যাডমিরাল কম্বস পাঠিয়েছেন। কাজেই সর্বতোভাবে জেঙ্কসকে সাহায্য করতে হবে। এরপর জেঙ্কস আমাদের বলেছিল—"এ্যাডমিরাল ম্যাকৃস্কিচ্‌নের সহযোগিতার তুলনা হয় না। নটিলাসকে চুকৃচী সাগরের অগভীর আর তুষার-ঢাকা জলে পাড়ি দিতে হ'লে কি কি করা দরকার সে সম্বন্ধে তাবৎ তথ্য সংগ্রহ একমাত্র তাঁর সহযোগিতাতেই সম্ভবপর হয়েছিল।"

এইসব উদ্যোগ-আয়োজন সামান্য ব্যাপার নয়। ম্যাক্‌কিচানের কর্মচারীরা জেঙ্কসের এক-একটা বেমক্কা ফরমাসের গূঢ়ার্থ অনুধাবন করতে পারছে না, আর এও তারা বুঝতে পারছে না যে সিত্রনএ চিঠি লিখে তথ্যাদি চেয়ে না পাঠিয়ে এরকম এক উদ্ভট প্রতিনিধিই বা পাঠালো কেন। অবিশ্যি জেঙ্কস যা-যা জানতে চাইছে, বা যে-ভাবে যা করতে বলছে তারা তা-ই ক'রে দিচ্ছে! এদিকে জেঙ্কসও সরলতার ভাণ ক'রে মাঝে মাঝে নামতা পড়ছে "আচ্ছা ফ্যাসাদ! আমি বুঝছি না, খামোখা এ্যাডমিরাল কম্বস এটা এইভাবে করতে বললেন কেন! আর মশাই, আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বলে দিলেন যেটি যেমন তাঁর দরকার সেটি যেন ঠিক সেই ভাবেই ব্যবস্থা করা হয়। ব্যস, এই বলে, সব বুঝিয়ে ঠেলে পাঠিয়ে দিলেন। বলুন তো, আমি এখন কি করি!"

ম্যাকৃকিচ্‌নের লোকেরা জেঙ্কসের সব কথাই রাখল, সব কাজ করে দিল তার মনোমত ভাবে—কৌতূহলে তাদের বুকে হাঁপ ধরলেও উপায় নেই। মোট কথা পরদিন সকালে যাতে সে উড়োজাহাজে নিজের পরিকল্পনাযায়ী যাত্রা করতে পারে তার উনকোটি চৌষট্টী ব্যবস্থা হয়ে গেল।

সেদিন মস্কোতে টহলদারী সেনাবিভাগ '৯'-এর কমাণ্ডারের অধীনে কর্মে নিযুক্ত হ'ল। জুলাই-এর দশ তারিখে সে আলাস্কার আইল্সন বিমানবাহিনীর ঘাঁটিতে পৌঁছলো। সেটাই নৌবিভাগের টহলদারী উড়োজাহাজের আস্তানা। অবিশ্যি এই প্লেনগুলো সাবমেরিন-প্রতিরোধ সংগ্রামের কাজেই ব্যবহৃত হয়।

জেঙ্কস সেইদিনই নটিলাসের ভবিষ্যৎ যাত্রাপথের উপর দিয়ে এরোপ্লেনে প্রথম চক্কর দিল। বরফের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচবার জন্য পোশাক-পত্তর সে সঙ্গে এনেছিল, তা ছাড়া নয় নম্বর সেনাবিভাগ থেকে কতকগুলো বাড়তি তোড়জোড় জুড়ে দিয়েছিল। তার মধ্যে একটা হ'ল ভাসবার পোশাক—হঠাৎ যদি জল জমে' বরফ হয়ে যাওয়া সমুদ্রের ওপর তাদের নামতে হয় তখন এই পোশাকই দরকার—এই পোশাকের পকেটে 'সাব্‌ভাইভ্যাল গীয়ার' ও সে নিয়ে নিয়েছে। প্যারাসুট থেকে আরম্ভ ক'রে সাজ-সরঞ্জামের বহরে জেঙ্কসকে নাকি অদ্ভুত বেমানান দেখাচ্ছিল। জেঙ্কস বলে,—"সে যা-ই হোক, ডাঙার মাছের মতো সাবমেরিনারের পক্ষে এগুলোই ত সহায় সম্বল, বুকের বল! আমার তখন নটিলাসে লট্‌কানো সেই বিজ্ঞাপনের কথা মনে পড়ছিল, সেই যে 'মহাপাপ, আকাশে ওড়া অকল্যাণকর। ওড়ার জন্যে ত তার জন্ম হয় নি।"

অথচ জেঙ্কসকে উড়তেই হ'ল—দিন নেই, রাত নেই, জেঙ্কস উড়ছে। ন'নম্বর বাহিনীর পাইলটেরা জেঙ্কসের হুকুম মতো কেবল উড়ছে, এখানে-সেখানে, বিরামবিহীন বিমানবিহারে তারা রীতিমত বিভ্রান্ত। তারা জেঙ্কসের রকমসকম দেখে মন্তব্য করে—'এই মক্কেলের দেখছি এ অঞ্চলটা এ্যাড্‌মিরালের চেয়েও হাতের মুঠোয়!' নিয়মিতভাবে প্রত্যেক পরিক্রমার শেষেই সে বিবরণ লিখে পার্লহারবারে পাঠিয়ে দিত। তারপর এ্যাডমিরাল হপ্‌উডের দপ্তর থেকে সেটা লোক মারফৎ এ্যাডমিরাল গ্রেন্‌ফেলের দপ্তরে চলে আসতো। এবং সেখান থেকেও লোকের মারফতে আমার কাছে বিবরণটা পৌঁছতো। জেঙ্কসের রিপোর্টে দেখছি, বরফ একটু একটু করে সরে যাচ্ছে—তবে তার তলা দিয়ে আমাদের যাবার মতো অবস্থা আসতে এখনো দেরি আছে।

হঠাৎ একদিন ন'নম্বর স্কোয়াড্রনের সেনাপতি পেটারসনের সঙ্গে জেঙ্কসের দেখা হয়ে গেল। পেটারসন এতদিন কাজের জন্য বাইরে ছিলেন। জেঙ্কস সফরের খবরাখবর সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে তিনি অনেক ক্ষণের আলোচনা ফেঁদে বসলেন। তিনি সম্প্রতি পেণ্টাগণের 'ও পি৪৪' শাখার কাজকর্ম দেখে শুনে এসেছেন সে গল্পও করলেন। জেঙ্কস্ পরে আমাদের বলেছিলেন—"উনি যখন পেণ্টাগণের বিশেষ বিশেষ শাখা সম্বন্ধে খুটিনাটি খোঁজখবর জিগ্যেস করলেন তখন আমায় স্বীকার করতেই হ'ল যে, আমি ওসব কিছু জানিনে, মাত্তর দু'মাস আমি পেণ্টাগণে কাজ করেছি।...লোকটা নির্ঘাত আমাকে বিল্‌কুল বুদ্ধু ঠাউরে নিল। তা নিক গে। এরপর থেকে ওঁকে যতটা পারি এড়িয়ে চলতাম।"

বরফের ওপর দিয়ে চলতে চলতে একদিন হ'ল কি, খুব নিচে কুয়াশা নেমে আসার ফলে জেঙ্কস ভালো ক'রে তুষার অঞ্চলের সীমারেখা দেখতে পাচ্ছিল না। সেই জন্যে সে পাইলটকে আরো নীচে বরফের কাছাকাছি নামতে অনুরোধ করল। সেদিনের কথা পরে তার মুখে শুনেছি—"এভাবে তাকে আমার বলাটা খুব ভুল হয়েছিল। জুড়ি-পাইলট বিল্-বেল হুড-হুড় ক'রে একেবারে পঞ্চাশ ফিটে নেমে গেল। আমি ত ধরেই নিলাম এ যাত্রা তাকে আর ওপরে উঠতে হবে না। হয়ে গেল। ঘণ্টায় দু'শো মাইল গতিতে বরফের অতো কাছাকাছি যাওয়া—উঃ। সেদিনই টের পেলাম, আসলে আমি হচ্ছি হদ্দো ডুবো-জাহাজী।"

সারাদিনের পর সন্ধ্যের আসরে জমাটি আড্ডা বস্‌তো। আর সেখানে এ্যান্টি-সাবমেরিণ বিভাগের পাইলটেরা ফলাও ক'রে নিজেদের কেরামতীর কাহিনী ফলাও করে শোনাতো—যুদ্ধের সময় এই এ্যাণ্টিসাবমেরিণ শাখা কি ভাবে সাবমেরিণের ওপরে টেক্কা দিয়েছে তারই সাত-কাহিনী। জেঙ্কস্-এর কাছে অপর তরফের কথাও বিস্তর মজুত তবু তার হাঁ করার উপায় নেই—এ অবস্থায় মুখ বুজে থাকা খুবই কঠিন কিন্তু তাকে সবই হজম করতে হত।

একদিন সন্ধ্যেবেলা পেটারসন বললেন—"বরফের খোঁজখবর খুটিনাটি জানাটা অবিশ্যি ভালো কিন্তু এ্যাণ্টিসাবমেরিণের চর্চাটাই হ'ল আমাদের যথার্থ কাজ।" এই কথাটা হজম করতে জেঙ্কসের খুব কষ্ট হয়েছিল, আর

সেই সময়ে মনে মনে হেসে সে ভেবেছিল—'আচ্ছা, ওই লোকটা যদি টের পায় যে আসলে সে এখন সাবমেরিণের কাজে সহায়তাই করছে—তাহলে কি দশা দাঁড়াবে!

বরফের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তর তথ্যপত্র সংগ্রহ ক'রে এবং আমাদের দরকার মাফিক বরফের উপর নজর রাখার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা ক'রে জেঙ্কস ওয়াশিংটনে খবর পাঠালো যে সে এবার পার্লহারবারে নটিলাসে ফিরতে চায়। অনুমতি মিলে গেল। আলাস্কা ছাড়বার সময় জেঙ্কস তার দু'বছরের কন্যা ডেবোরার জন্যে এক এস্কিমো পুতুল কিনল।

নটিলাসে সে যখন ফিরল তখন তার চৌদ্দহাজার মাইল চক্কর দেওয়া হয়ে গেছে—এগারো দিনে চৌদ্দহাজার মাইল। আর, এস্কিমো পুতুলটাকে 'চরম গোপনীয়' শ্রেণীর আওতায় পড়ে গেল অতএব সেটা আমাদের তিন-দফা তালার মধ্যে সিন্ধুকে আটক পড়ল।

আমি এবং নটিলাসের অন্যান্য জাহাজীরা স্টেট্সের চক্কর সেরে অনেক আগেই জাহাজে হাজির হয়েছি। আর বনিও পার্লহারবার বেড়ানোর মওকা হাত-ছাড়া করতে নারাজ, তাই বাণিজ্যিক প্লেনে চড়ে চলে এসেছে এখানে। এ্যাডমিরাল গ্রেন্‌ফেল তাঁর কোয়ার্টারে আমাকে আর বণিকে থাকার বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছেন—আরামেই আছি। প্রায়ই সন্ধ্যেবেলা আমরা পুরনো স্মৃতিবিজড়িত জায়গায় বেড়াতে যাই, পুরনো সেই সব দিনের কথায় মুখর হয়ে উঠি। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, বনিকে যে ভাবে পেতে ইচ্ছে ততটা পাই না। নটিলাসে আমাদের অনেক কাজ—প্রথমতঃ এখানকার হাওয়াইবাসীর আতিথ্যের প্রতিদানের আয়োজন করতে হয়, সামরিক এবং নাগরিকদের আনুকূল্যে জাহাজে বেড়ানোর ব্যবস্থা করতে হয়। তাদের সংখ্যা কম ক'রে হাজার তিনেক। আর নৌবিভাগের দু'শো কর্মীর জন্যও সমুদ্র ভ্রমণের নিয়মিত বন্দোবস্ত করতে হচ্ছে। এরই ফাঁকে ফাঁকে উত্তরাঞ্চলে পাড়ির উদ্যোগ আয়োজনের কাজ এগিয়ে রাখতে হচ্ছে।

এবার আমাকে যেমন ক'রে হোক জাহাজের সব ক'টি প্রাণীর জন্য বিশেষ শ্বাস-গ্রহণ যন্ত্রের ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে। যদি হঠাৎ জাহাজে আগুন লাগে তাহলে কেবলমাত্র জাহাজ বাঁচানোটাই ত একমাত্র সমস্যা

নয়, জাহাজীদেরও রক্ষার উপায় থাকা চাই। সেই জরুরী অবস্থার জন্ত আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। এ্যাডমিরাল গ্রেন্‌ফেলের কাছে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলামাত্র তিনি উঠে পড়ে লেগে গেলেন। আর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই, প্রত্যেকটি অফিসার এবং জাহাজীর জন্য মুখোশ এবং বাতাস-সরবরাহের বন্দোবস্ত করে ফেললেন। একটা ছোটখাট সমুদ্র সফরে আমরা কয়েকটা মহড়ার ব্যবস্থা করলাম, তাতে মুখোশ পরার প্রয়োজন হয়। জাহাজীদের মনে মুখোশ পরার কি প্রতিক্রিয়া হয় সেটা জানবার জন্য জাহাজীদের জিজ্ঞাসা করাতে একজন বলে উঠল—"মুখোশগুলো ভারি সুন্দর, বুঝলেন ক্যাপ্টেন সাহেব। তবে একটা কথা, ওই মুখোশ পরে' এক কাপ কফি খাওয়া, বুঝলেন খুব কঠিন, হ্যাঁ!

আমাকে জানানো হ'ল যে এর পর থেকে এই জরুরী অবস্থার মুখোশ যন্ত্রের ব্যবস্থা প্রত্যেক আণবিক শক্তি চালিত সাবমেরিণেই করা হবে।

পার্লহারবারে থাকার সময়ে আমাদের জাহাজে আর একটি সুবন্দোবস্ত করা হয়েছিল—এমন ভাবে একটা টেলিভিসন লাগানো হল, তার লেন্‌স বা ট্রান্‌স্মিটারের মুখ ওপর দিকে রাখা হ'ল। যাতে করে আমরা সব সময়েই বরফের অবস্থাটা প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাই। পেরিস্কোপের চেয়ে অনেক ভালো কাজ হবে তাতে। এতে আমরা সহজেই তুষার অঞ্চলের খোলা জল বা বরফ-ছাড়া ঘেরা জলের খবর চট্ ক'রে পেতে পারবো, ওপরে ওঠার দরকার হ'লে এই যন্ত্র খুব কাজে আসবে।

যন্ত্রটা লাগানো হওয়ার পর একজন এ্যাড্‌মিরাল সোৎসাহে বল্লেন—জানো এ্যাণ্ডারসন, "এই যন্ত্রটার দৌলতে আমাদের নৌ-বিভাগের কয়েক লক্ষ ডলার বছরে বেঁচে যাবে।"

তাঁর কথাটা ধরতে না পেরে বেকুবের মতো জিগ্যেস করলাম—"কেমন করে?"

"আরে এটা বুঝছো না! জাহাজের তলার অবস্থা খুঁটিয়ে দেখার জন্যে আমাদের ত এখনও এ্যাসা বড় বড় জাহাজকে ফি দফা ড্রাই-ডকে ঠেলে তুলতে হয়। এর পর তার দরকারই হবে না, স্রেফ তোমার ওই টেলিভিসন সেট সঙ্গে দিয়ে তোমার জাহাজের তলায় নামিয়ে দিলেই পরিদর্শনটা দিব্যি চুকে যাবে!"

এদিকে এ্যাড্‌মিরাল ম্যাক্‌কিচ্‌নের নিয়মিত রিপোর্ট দৃষ্টে আমরা বুঝতে পারছি যে, মেরু অববাহিকায় পৌঁছবার মতো অনুকূল অবস্থায় এসে পড়েছে। বরফের অবস্থা বেশ ভালো।

অতএব আমাদের যাত্রার দিন ঠিক করে ফেললাম—একুশে জুলাই। আবার একটা লোক-দেখানো অজুহাত তৈরী করতে হ'ল। আমাদের এই দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির কারণ কী? এ্যাড্‌মিরাল গ্রেণফেল ঘোষণা ক'রে দিলেন, পুরোণো গল্প, পার্লহারবার থেকে নটিলাস একটানা পানামায় দৌড়দারী পাড়ি দিচ্ছে।

পার্লহারবার থাকার সময়ে আমাদের লোকেরা এবং সাবমেরিণ ঘাঁটির মেরামতী কারখানার লোকেরা অহর্নিশ 'মার্ক ১৯' জাইরো কম্পাস সারাই-এর কাজ নিয়ে হিম্‌সিম খাচ্ছিল—এই কম্পাসটা বেরিং প্রণালীর কাছে প্রথম প্রবেশের আমলে বিগ্‌ড়েছে। প্রথমে আমাদের ধারণা হয়েছিল যে, দোষটা শুধ্‌রে ফেলা গেছে, কিন্তু পার্লহারবার এবং তার কাছাকাছি সফরের সময়ে পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল এর পাগ্‌লামী যেন ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। অথচ বরফের তলায় 'মার্ক ১৯' কম্পাসটা খুব দরকারী হাতিয়ার!

মনে মনে সংকল্প করলাম, পরবর্তী মেরু-পাড়িতে নামবার পূর্বাহ্ণে এই কম্পাসকে নিখুঁত ক'রে নিতেই হবে।

যাত্রার দিন যত কাছে আসছে আমার উদ্বেগ ততোই বেড়ে যাচ্ছে। আমার এখানকার কম্পাস-বিশেষজ্ঞরা বিশেষ সুবিধে করতে পারছে না দেখে, আমি ওয়াশিংটনে খবর পাঠালাম। খবর পাওয়া মাত্র যেন একজন 'Sperry' কম্পাস বিশ্বকর্মাকে দ্রুততম যানবাহনে ক'রে পাল'হারবারে পাঠিয়ে দেওয়া। তার পৌঁছনোর ভরসায় আমরা যাত্রা একদিন পিছিয়ে দিচ্ছি। পাল'হারবারের সাবমেরিণ কর্মচারীরা ত আমাদের আসল মতলব জানে না। অযথা একটা পাগ্‌লা কম্পাসের জন্যে এত তালবাহানা করছি কেন, তারা বুঝতে পারছে না। একজন বললে—"আরে মশাই, আপনাদের ত আরও তিন প্রস্থ কম্পাস রয়েছে। অযথা এত কেন চিন্তা করছেন?"

তার জবাবে আমি বললাম—"তা ঠিক। তবে কি জানেন, নটিলাসের সব কিছু একেবারে নিখুঁত না হওয়া পর্যন্ত আমরা ডুব দিই না।"

এরপর থেকে ওখানকার ডুবো জাহাজীরা নটিলাসের নতুন নাম দিল—"নারাজ ড্রাগন!"

স্পেরি'র এঞ্জিনিয়ারটি খুব এলেমদার বিশেষজ্ঞ। আমরা যে 'মার্ক ১৯' নিয়ে এতদিন ভুগ্ছেছি, সে এসেই এক নজরে তার আসল রোগটা ধরে' ফেলে, চটপট মেরামত ক'রে দিল! তার দক্ষতায় আমি খুব বিস্মিত হয়ে গেলাম,—অভিভূতও বলা যায়। তাকে আমাদের সফরে সঙ্গী হওয়ার জন্যে অনেক অনুরোধ করলাম। এরকম একটা নিপুণ কারিগর সহায় থাকলে জলের নিচে নির্ভাবনায় চলাফেরা করা যায়! সে মাফ চেয়ে বলল যে, তার স্ত্রী এবং সে দু'জনে মিলে একটা ছোট বাচ্ছাকে পালনের ভার নেবে স্থির করেছে কি না, তাকে জলদি বাড়ি ফিরতেই হবে।

আমরা আবার উত্তরে পাড়ি জমাবার জন্যে তৈরী! বনির কাছে বিদায় নিলাম,—না তার চেয়ে বলি, বনি ফিরে গেল আমি ওকে বিদায় দিলাম। পার্লহারবারে যে এ্যাডমিরাল গ্রেনফেল আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন তাঁকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানালাম। সেই সময়ে তিনি আমাদের নটিলাসকে এই বলে আন্তরিক শুভেচ্ছা প্রকাশ করলেন; "আমি যদি কখনও আণবিক শক্তি পরিচালিত ডুবো জাহাজের অধিনায়ক হতে পারি ত গৌরব বোধ করব।"

আমাদের নোঙর তোলার সময় ঘনিয়ে এল। দরিয়ার তলায় ডুব দেবার আগের পর্ব চুকিয়ে ফেলা হচ্ছে। সবাই ব্যস্ত।

এখন আমার একটা কথা মনে পড়ছে। আমরা পার্লহারবারে চার সপ্তাহ কাটালাম। একশ' ষোল জন নাবিক আমাদের নটিলাসের, দু'চার জন যারা অল্পদিনের ছুটীতে চলে গেছে, তারা ছাড়া প্রায় সবাই সব সময়ের জন্য পার্লহারবারেই কাটিয়েছে। কিন্তু আমাদের 'শুভদিনের যাত্রা' সম্পর্কে একটি কথাও কেউ আলোচনা করে নি। যদিও আমরা মেরু পরিক্রমায় দু-বার ব্যর্থ হয়েছি, তবু এই পাড়ি অনন্যসাধারণ রোমাঞ্চে বিচিত্র। সে অভিজ্ঞতার কাহিনী দিয়ে আসর মাৎ করার লোভ সামলে চলা প্রায় অসম্ভব। এই দুর্লভ সংযম ও সততায় আমার নটিলাসের জাহাজীরা দুনিয়ার সেরা মানুষ একথা আমি জোর গলায় বলব।

আবার আমরা ডঃ লয়েন আর তাঁর নূতন সহকারী মিঃ আর্চি ওয়াকারকে লুকিয়ে তুলে নিলাম।

আমাদের এই চার সপ্তাহে গোপনতার নিরাপত্তাকে কেন্দ্র ক'রে অনেক মজাদার উদ্ভট কাণ্ড-তামাশা ঘটে গেছে। সে সব বলতে বসলে আর শেষ হবে না। মাঝে মাঝে এক-একটা মনে পড়ে আর হাসি পায়! তবে, তার মধ্যে সবচেয়ে মজাদার ফ্যাসাদে পড়েছিল এক চীফ পেটী অফিসার। ছুটীতে সে নিউ ইংলণ্ডে বাড়ি গিয়েছিল।...এর আগের বারে পাড়ির সময় সে জানতো না যে আমরা ইংলণ্ডে গিয়ে হাজির হবো, তাই সঙ্গে কেবল খাকী পোশাক নিয়েছিল। এবার ছুটী থেকে ফেরার মুখে তার খেয়াল হ'ল, যদি শেষ পর্য্যন্ত আমাদের পাড়ি সফল হয় তবে ত ইংলণ্ডে পৌঁছচ্ছি—তখন ত নীল পোশাক চাই।

তার স্ত্রীকে বলল—"দ্যাখো, আমার নীল পোশাক দরকার হতে পারে, কোথায় আছে বার ক'রে দাও।"

—"সে ত তুলে রাখা হয়েছে। বার করা এখন অনেক হাঙ্গামা। তা ছাড়া তুমি ত যাচ্ছ পানামায়। সেখানে নীল সাজ কোন্ কর্মে লাগবে শুনি!"

আমতা-আমতা ক'রে শেষে সে বলল—"মানে, বলা ত যায় না, কখন কোন্ উৎসবে হয়তো হঠাৎ নীল সাজ দরকার হয়ে পড়ে। মানে, যদি দরকার হয়, এই ব'লেই সঙ্গে নেওয়া ভালো! বুঝলে না—"

নৌবিভাগের কেতা-কায়দা তার বৌ-এর জানতে কিছু বাকী নেই। তাই হাত নেড়ে সে অফিসারকে উড়িয়ে দিল—"খামোখা তোমার আর নীল পোশাক নিয়ে কাজ নেই। রেখে দাও দেখি—"

এরপর আর কোনো কথা বলতে গেলে হয়তো স্ত্রীর কাছে ধরা পড়ে যেতে হবে, অগত্যা অফিসারটি নীল পোশাক না নিয়েই নটিলাসে ফিরে এসেছে।

যখন পার্ল হারবার ছাড়ছি তখন আমার মনে সংশয় জেগে উঠল—"কে জানে শেষ পর্যন্ত নীল পোশাকের সত্যিই কোনো দরকার হবে কি না।"

॥ উনিশ ॥

পার্লহারবারের শান্ত মৌন জলরাশির বুকের ওপর দিয়ে নটিলাস ধীরে ধীরে ভেসে চলল। অন্ধকার নামছে। ডেকের-দল আমাদের পরিচয়-স্মারক সংখ্যার ওপর রং বুলিয়ে ঢেকে দিল। যে বিরাট ডুবো জাহাজীর দল আমাদের বিদায় অভিবাদন জানাতে এসেছিল তারা যে-যার ঘরে ফিরে গেছে। সেই দলের মধ্যে এ্যাডমিরাল গ্রেনফেলও ছিলেন, তিনি আমাদের উৎসাহবাণী শুনিয়ে গেছেন।

সাগরের মহারাণী তার তৃতীয় মেরু-সফরে পাড়ি জমালো, জলের গভীরে ডুব দিল নটিলাস।

দুই সফরের মধ্যবর্তী কালে ডকে থাকার সময় আণবিক শক্তির সাবমেরিণে যে নিঃশব্দ নিয়মিত কাজ চলে, তা কতকটা মধুচক্রের মৌমাছিদের কাজের মতো ব্যস্ততায় ছন্দোবদ্ধ। বস্তাবন্দী হয়ে ডাক আসে। সরকারী চিঠিপত্র এবং বিবরণীও গাদা-গাদা পাঠানো হয়! যন্ত্রপাতি সাফসুতরো করা, মেরামত করা আর নতুন আসবাবপত্র যন্ত্রপাতি বসানো হয়। তাছাড়া টর্পেডো, অক্সিজেন, যন্ত্রের প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, চিকিৎসাপত্রের সাজসরঞ্জাম, ওষুধপত্র, সবকিছু বোঝাই চলে নিরন্তর। আর কফি, খাদ্যদ্রব্য, মশলাপাতি, কম্বল, ট্রান্সিস্টার, হাইড্রোজেন, এ্যাসিটিলীন, নাইট্রোজেন, ফ্রেঅন, কার্বন ডায়ক্সাইড, বল-বীয়ারিং, সাবান, এ্যাল্‌কোহল, নানারকমের তেল, ফিল্ম, কাগজপত্র, টাইপরাইটার, কতো আর ফিরিস্তি দেওয়া যায়—মোট কথা নাগাড়ে রসদপত্র আমদানী হয়ে জাহাজের খোলে এসে ঢোকে। কত লোক বদলী হয়, তার জায়গায় নতুন সব মুখ হাজির হয়।

পার্লহারবারেও তার অন্যথা হয় নি। লেঃ টন্‌সেথ বদলী হয়ে চলে গেল নিউ লণ্ডনের আনবিক শক্তির বিদ্যালয়ে, লেঃ ফিয়ারকে পাঠানো

হ'ল নতুন আনবিক শক্তির সাবমেরিন ট্রাইটনে। চীফ ম্যাকুলের পদোন্নতি হয়েছে, সে গেছে নিউপোর্টে নৌ-অফিসারের শিক্ষানবিশীতে। জেম্‌স নিউ লণ্ডনে ফিরে গেছে আমাদের প্রথম অধিনায়ক ক্যাপ্টেন উইল্‌কিন্‌-সনের জায়গায় কাজ করবার জন্য। আনবিক শিক্ষাসূচীতে উত্তীর্ণ দুই তাজা স্নাতক হল আর ক্যাসেল এসেছে নটিলাসে নিযুক্ত হয়ে, এসেছে ফোক্‌স, কিং, ওর্টেগা।

দরিয়ার বুকে ভেসে পড়ার স্ফূর্তিই আলাদা।

বন্দরের মুখ পেরিয়ে, প্রণালীর প্রবেশ পথ ছাড়িয়ে, আমি হুকুম দিলাম পুরোদমে চলো।

জাহাজ যখন আপন ধাতে চলতে শুরু করল, তখন মনে হ'ল আমাদের এই যাত্রায় উজ্জ্বল উত্তেজনার ব্যাপকতা নেই, সেবার সিয়াট্‌ল ছাড়ার সময়ে যে বৈদ্যুতিক চঞ্চলতা ছেয়ে ছিল জাহাজে, এবারের যাত্রায় তা আদৌ নেই—তার জায়গায় অত্যন্ত স্বাভাবিক আত্মপ্রত্যয়ী সংকল্পের অটলতায় আমাদের জাহাজ ধ্রুবপদে চলেছে এগিয়ে। এবারে আমাদের অভিজ্ঞতার পুঁজি বেড়েছে, জ্ঞানের রসি অনেক মজবুত হয়েছে, সম্মুখের তুষারময় লোকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নিবিড়তর হয়েছে। আমরা অভীর। ভগবান সহায় হলে আমরা এবার নিশ্চয় উত্তরে যাবো।

জুলাই-এর তেইশ তারিখ রাত বারোটা বেজে তিন মিনিটে (এবার আমরা সিয়াট্‌লের সময় ধরেই চলছি ; সেবারের মতো আগে থেকে ইংলণ্ডের সময় হিসেব ক'রে কাঁটা ঘুরোই নি) আমরা ওয়াহু'র দক্ষিণে গভীর জলের মুখোমুখী হলাম, জলের তলায় নেমে পড়লাম। যন্ত্রপাতি সবই ঠিক মতো চলছে, কম্পাসগুলোও পোষা পাখীর মতো কাঁটা দেখাচ্ছে, এমনকি সেই জটিল ইনার্সিয়াল নেভিগেটরও সদাচরণে বসম্বদ। আর এবারে সুলক্ষণের বাহন জলশূকরদের দেখা পেলাম, তারা এসেছে, খেলা করছে আমাদের হালের আশেপাশে। এই ত পাকা খবর মিলে গেল—এবার আমাদের সফর সফল হবেই হবে।

আমরা ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে চলেছি—আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই কাউ আই চ্যানেরণ দিয়ে ওয়াহু ঘুরে ইউনাস্কার রাস্তা ধরলাম। এবার

আমরা পশ্চিম-দরজা দিয়ে বেরিং প্রণালী ভেদ করব—এখন সেখানে মোটেই বরফ নেই, আমরা তা জানি। এতে আমাদের পথ অনেক কমে যাবে, আমরা ডুবপথে দ্রুত চলতে পারবো। আমাদের শক্তিশালী রিয়্যাক্টর সব সময়ই সর্বাধিক পরিমাণ শক্তি সৃষ্টি ক'রে জোগান দিয়ে যাবে। কাজেই আমাদের ধীরমন্থরে চলার প্রশ্নই উঠবে না। শুধু যখন জলের ওপর উঠে বেতারবার্তা সংগ্রহের প্রয়োজন হবে তখনই যা দৌড়দারি কমিয়ে দিতে হবে। স্বয়ংক্রিয় পাইলট আমাদের উত্তরের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে—যেন তীরের ফলার মতো আমরা চলেছি ডুব দিয়ে, এতটুকু বাঁকাচোরা বিঘ্ন নেই।

আটটা বাইশে নটিলাসের আনবিক শক্তিতে ১২০,০০০ মাইল পাড়ি দেওয়া হয়ে গেল। জুলে ভার্ণের স্বপ্নের দ্বিগুণ পথ আমাদের সফর করা হয়ে গেল তবু সেই ঐতিহাসিক পথ পরিক্রমার গৌরবমুকুট আমাদের লুব্ধ করল না। জাহাজের সবকটি প্রাণীর লক্ষ্য বৃহত্তর, মহত্তর সাফল্যের চূড়ার দিকে। সামনে পড়ে রয়েছে সেই অজিত পথ।

নটিলাসের ওপরে পুরনো নিয়মে জীবনধারা প্রবাহিত হচ্ছে—কাজে মোতায়েন থাকা, ঘুমোনো, খাওয়া-দাওয়া, অবসর বিনোদন, সবই আগের মতো। ডঃ লয়েন আর আর্চি ওয়াকার বরফসন্ধানী যন্ত্র নিয়ে ব্যাপৃত। আমেরিকান বৈমানিক বিভাগের টম কার্টিস আর জর্জ ব্রিস্টভ আমাদের কারিগর রকৃফেলার আর লেরিচ্‌কে নিয়ে ইনার্সিয়াল নেভিগেটরের তদারকীতে ব্যস্ত। সারা জাহাজে সবাই খুব তৎপর। সবদিকে কড়া হুঁশিয়ারী—কোনো যন্ত্র বিগ্‌ড়ে গিয়ে যেন আমাদের অভিযানকে বিপন্ন বা বিলম্বিত ক'রে না দেয়।

সেদিন আবার আমাদের সংবাদপত্রের প্রথম সংস্করণ আত্মপ্রকাশ করল; "পানামা-মেরু-পার্ল যাত্রী-পোতের খবর।" খেলার প্রতিযোগিতা পুরোদমে চলেছে, জুক্‌-বক্সের আবহ সঙ্গীত বাতাসে অবিশ্রাম সুর ভাসিয়ে দিচ্ছে। এবারে সব নতুন রেকর্ড, হাওয়াই দ্বীপের হাওয়া যেন এর মধ্যে ঢুকে পড়েছে। চলচ্চিত্র বাছাই-এ পার্ল হারবারের বন্ধুরা সাহায্য করেছিল, কাজেই এবারের ছবিগুলো সুন্দর।

হনোলুলু থেকে চব্বিশ ঘণ্টার দূরে পৌঁছে আমরা প্রথম বরফের সংক্ষিপ্ত

সংবাদ পেলাম। পার্লহারবার থেকে বিশেষ বন্দোবস্তের দৌলতে এই সুবিধেটা পেয়েছি। খবরে জানা গেল যে, চুকচী সাগরের অগভীর অঞ্চল এবং পয়েণ্ট ব্যারোর সমীপবর্তী আলাস্কা উপকূল উভয় দিকেরই আবহাওয়া ভালো।

পরদিন আবার আমরা গতি মন্থর ক'রে খবর ধরবার চেষ্টা করলাম—নটিলাসের জন্যে যদি কোনো সংবাদ থাকে। দেখা যাক। ছিল। ফার্স্ট ক্লাস এঞ্জিনম্যান হ্যারি হেচিনের কাছে এটা মস্ত বড় সংবাদ। সে তৃতীয় বার পিতৃত্ব লাভ করছে—আট পাউণ্ড ওজনের ক্লারা নাম্নী কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়েছে প্রসূতি ও কন্যা ভালো আছে। সবাই হেডিন্‌কে তারিফ দিতে লাগল। আমি ভাবছিলাম, আচ্ছা ক্লারার যদি বোঝবার মতো বয়স থাকতো আর ও জানতে পারতো তাহলে ও কি মনে করত।

হাওয়াই-এর উপকূল কতো পিছনে পড়ে রয়েছে, ক্রমশঃ আমরা তা থেকে দূরে আরও দূরে সরে যাচ্ছি।

চার সপ্তাহ আগে এই পথ দিয়েই গেছি, কিন্তু সে যেন অন্য পৃথিবীর কথা! আজকের এই জলের সঙ্গে, এই আবহাওয়ার সঙ্গে তার কোনো মিল নেই।

আমাদের রিয়্যাক্টর অমিত শক্তির আকর—সে আমাদের কাজের জন্য যে অজস্র শক্তি সৃষ্টি করে, তা-ই আমাদের পোতকে চালায়, আলো দেয়, রান্না হয় তা দিয়ে, তা দিয়ে আমাদের সব কাজ হয়। রিয়্যাক্টর কাজ করে নিঃশব্দে, সে এক অমিতবৈভবময় মহিমায় বিরাজ করে। যারা তদারকে মোতায়েন তারা বিচিত্র সব যন্ত্রের ক্রিয়াকলাপের দিকে লক্ষ্য রাখবে—প্রতিটি যন্ত্রের আপন-আপন ভাষা আছে, কথা আছে, সেই ভাষায় বার্তা পাওয়া যায় আমাদের জাহাজ ভালো চলছে না মন্দ! আমাদের এ রাজ্য চরম বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল—এ বিশ্বাস যন্ত্রের প্রতি, এ আস্থা পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মের প্রতি, প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের ভরসা আর সর্বোপরি সেই অপরিজ্ঞেয় সত্তার প্রতি যিনি অলক্ষ্যে থেকে আমাদের অজ্ঞাত দরিয়ার পথের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছেন।

পার্লহারবার থেকে এ্যালুসিয় দ্বীপমালা অতিক্রমের ডুব পথটা আমরা শনিবার ২৬শে জুলাই খতম করলাম। সতর্কভাবে, আস্তে আস্তে আমরা

পেরিস্কোপ-গভীরতায় উঠে এলাম। আমাদের রাডারকে উনাস্কা দ্বীপের দিকে স্থাপন করলাম। এখান থেকে কুড়ি মাইল দূরে ডাঙা, তবু মাত্র মুহূর্তের জন্য মাস্তলটা ওপরে তুলেই আমাদের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিলাম! এরপর গভীরে ডুব দিলাম। উনাস্কা এবং হার্বার্ট দ্বীপের মধ্যবর্তী প্রণালীটা সরাসরি ডুব মেরে পেরিয়ে যাবার মতলব এঁটে নিয়েছি। মাঝ পথে এসে আর একবার পেরিস্কোপ রাডারে আমাদের অবস্থান পরখ করে নিলাম।

ওপরে ঘন কুয়াশা, মেঘ জমে আছে। এরই মধ্যে এক নম্বর পেরিস্কোপের কোণাকুণি ফাঁক দিয়ে, কুয়াশা ভেদ ক'রে পরিচালন অফিসার উনাস্কা দ্বীপটা কখনও বা দেখতে পাচ্ছে।

আমরা আবার ওপরের ঘোলাটে দুনিয়া ছেড়ে দরিয়ার অতলে ডুব দিলাম—এখনও কিছুটা পথ গভীর জল পাবো—কাজেই জোর কদমে দৌড়চ্ছি আমরা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা আবার বেরিং সমুদ্রে হাজির হলাম।

পেরিস্কোপের ভেতর দিয়ে স্পষ্টই দেখা গেছে যে এখানকার সমুদ্র মধ্য-প্রশান্ত মহাসাগরের মতো নয়, অনেক তফাৎ। ক্রমশঃ উষ্ণমণ্ডলের স্বচ্ছ গাঢ় নীল থেকে জলের রং হিমমণ্ডলের ঠাণ্ডা অস্বচ্ছ সবুজে রূপান্তরিত হচ্ছে! এখন আর নীলের ওপর সাদা ফেণার ফণী নর্তনশীল নয়। এখানে ফেণার রং ধোঁয়াটে-সাদা, ঢেউগুলো খাড়াই, তার ওপর ফেণাগুলো যেন হোঁচট খেয়ে আছড়ে পড়ছে, এখানকার গভীর দরিয়ার ঢেউ হাওয়ার চেয়ে দ্রুত গতিতে চলে। কমলা রং-এর পাফিন পাখিগুলো আমাদের পেরিস্কোপের ধাক্কা এড়াবার জন্যে জলের মধ্যে মাথা ডুবিয়ে দিচ্ছে, কেউ বা উড়ে পালাচ্ছে।

রবিবার শুরু হ'ল। এখনো আমরা গভীর জল দিয়ে উপর মুখে সঙ্কীর্ণ প্রণালীর দিকে বেয়ে চলেছি। আমাদের সোনারে নিযুক্ত দল মিকাউড, নরিস, সারেৎ আর গেইন্‌স সারা সকালটা সামনের কড়া সফরের জন্যে যন্ত্রপাতি সাজিয়ে-গুছিয়ে নিতে লাগল।

দুপুরের একটু পরেই আমরা আবার আমাদের পশ্চিমের পথে প্রিবিলফ দ্বীপ পেলাম। পশ্চিম থেকে আবার উত্তরে সেণ্ট ম্যাথুদ্বীপকে

পাশ কাটিয়ে চললাম। বিকেলে আমাদের সফরের আরাম খতম হ'ল। গতিবেগ কমিয়ে সাতাশ মাইলে আনা হ'ল, এদিকে দেড়শ ফিট গভীরতা দিয়ে চলতে শুরু হ'ল। হয়তো এই পর্যন্ত অন্য জাহাজ, দ্রুত গতিতেই আসতে পারে কিন্তু এতদূরে পৌঁছবার অনেক আগেই তাদের ইন্ধন ফুরিয়ে যাবে। আর, আমরা এর পরে যে বন্দরে নোঙ্গর ফেলব সেটা এখান থেকে পাঁচ হাজার মাইল দূরে রয়েছে। আমাদের ইন্ধন যা মজুত রয়েছে তাতে আরও অনেক অনেক হাজার মাইল পাড়ি দিতে পারি।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা আবার বৈঠক বসল, উত্তরমেরু সফর উৎসব সমিতির গোপন বৈঠক। ওরা যে কি মতলব ভাঁজছে জানি না, তবে এটা নির্ঘাত যে, ওদের মগজে একেবারে সময়োচিত এবং অকল্পনীয় মৌলিক কিছু খেলবেই। এই সমিতির সভাপতি হচ্ছে একধারে ব্যঙ্গচিত্র শিল্পী, জাদুকর সম্মোহনবিদ্যাবিশারদ ম্যাক্‌নালি। উৎসবের সম্মান-স্মারক পতাকার রূপরেখা পরিকল্পনার প্রতিযোগিতা এবং উত্তর মেরুর ডুবো পরিদর্শকদের সম্মানসূচক খেতাব দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তর পাল্লাপাল্লি চলেছে। তার অবশ্য একটা বড় আকর্ষণ—পুরস্কার। পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে, ইওরোপে বাহাত্তর ঘণ্টা স্বাধীনভাবে চলাফেরার সুযোগ। যা খুশি তাই—এর মতো বড় আকর্ষণ আর কি থাকতে পারে।

সাইবেরিয়ার স্রোতে পড়বামাত্র দরিয়ার তাপমাত্রা দ্রুত কমতে লাগল। এর পরেই দেড়শ ফিটের বাঁক পেরিয়ে আমরা পনের মাইল বেগে মন্থর গতিতে চলা শুরু করলাম। নেভিগেটরের ধ্রুব হ'ল সেন্ট লরেন্স দ্বীপ। সাইবেরিয়া স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সমুদ্র নিস্তরঙ্গ, শান্ত। সন্ধ্যের দিকে আমরা পেরিস্কোপ-গভীরতায় উঠে এলাম বরফের খবরাখবর যাচাই করতে।

আমরা এখন যেখান দিয়ে চলেছি, এর আগেরবার এখান থেকেই পশ্চিম দরজার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে ফিরতে হয়েছিল। এখানেই মাটি-শেকড় জড়ানো বরফের চাঙড আমাদের পথ রোধ করেছিল। এবার বরফের কোনো চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

হঠাৎ আমাদের দূরপাল্লার সোনারে দেখা গেল দক্ষিণ-পশ্চিমে কয়েক মাইল দূরে একটা জাহাজ চলেছে। গতি মন্থর ক'রে দিলাম। তারপর

পেরিস্কোপ ঘুরিয়ে দিলাম। না, ওটা ত মার্কিনী জাহাজ নয়। সোনারের খবরটার ওপর দুমিনিট বেশ ভালোভাবে নজর রেখে ওই জাহাজের ধরণ, পথ, এবং গতিবেগ মিলিয়ে দেখে—সটান গভীর দরিয়ার তলে নেমে পড়লাম। আমাদের পেরিস্কোপটা ওদের নজরে পড়তে দেওয়া চলবে না।

উনত্রিশে জুলাই সকাল দশটার সময় পরিচালন অফিসার লেঃ বিল লালর নটিলাসকে পেরিস্কোপ গভীরতায় তুলে আনল। ফেয়ারওয়ে রক এবং ডায়মণ্ডে দ্বীপের মধ্যবর্তী রেখায় শেপ জেঙ্কস দিক লক্ষ্য স্থির ক'রে নিল। আমরা এখন প্রণালীর মুখের কাছে এসে পড়েছি। আমরা সংকীর্ণ গহ্বরের লক্ষ্য স্থির ক'রে নিয়ে, পুরোদমে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেতে হুকুম দিলাম।

যথাসময়ে, নির্বিঘ্নে আমরা প্রণালীর মধ্যে প্রবেশ করলাম। সাই-বেরিয়ার রুক্ষ তীরভূমির দিকে তাকিয়ে আমার মনে পড়ল হাওয়াই উপকূলের শ্যামল স্নিগ্ধ অঞ্চলের ছবি। ছদিন হ'ল সেই সুন্দর শোভাময় ভূমিশ্রী থেকে চলে এসেছি। আমি চট্ ক'রে নেভিগেটরের দিকে ফিরে বললাম—এখান থেকে পার্ল হারবারের দূরত্ব, আমাদের গতিবেগ আর সময়ের হিসেবটা দ্যাখোতো!' বলবার আগেই তার অংক তৈরী! সে বলল—ছদিন চার ঘণ্টায় ২৯০১ মাইল পথ চলেছে। তার মধ্যে ৪৮৩ মাইল অল্প জলে। মন্দগতিতে চলেছি। আমাদের গতিবেগ গড়ে উনত্রিশ মাইল। আরও কোনও সাবমেরিনের এতখানি এইভাবে আসা সম্ভব হ'ত না। আর সাধারণ জাহাজের কথা না তোলাই ভালো—খুব কম জাহাজই আছে যা এতদূর পাল্লা এই বেগে চলতে পারে।

আমরা আবার চুকচী সাগরে পড়লাম। এর আগে এখানেই গভীর তুষারে আমরা আটকে পড়েছিলাম। এখন সব পরিষ্কার! এর আগে এখান থেকে চল্লিশ মাইল পথ আমাদের এঁকেবেঁকে অনেক কসরৎ ক'রে চলতে হয়েছিল—আর এখন একজন বললে—'আমরা যেন কেক্ খাচ্ছি!

সেদিন সন্ধ্যের পর এঞ্জিনিয়ারিং অফিসার স্টেভ্ হোয়াইট খবর দিলে জাহাজের বৈদ্যুতিক শাখায় শর্ট সার্কিট হয়েছে। অনেক সময় এ থেকে আগুন লেগে যায়। কাজেই শর্ট সার্কিটের মূল ক্ষেত্রটা অবিলম্বে বার ক'রে মেরামত হওয়া দরকার। অমনি ইলেকট্রিশিয়ানরা উঠে পড়ে

খুঁজতে শুরু করল গলদের উৎস ক্ষেত্র। ঘণ্টা দুই চেষ্টার পর পাওয়া গেল তার যথাযোগ্য ব্যবস্থাও করা হ'ল। ব্যাপারটা বড় কিছুই নয়। তার পরে বড় হয়ে উঠতে পারতো বই কি।

রাত দুপুরে আমরা ৭০ ডিগ্রি অক্ষাংশ ৫ কলা উত্তরে পৌঁছলাম। আমরা এর আগে যেখান থেকে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম, তা ছাড়িয়ে আরও ষাট মাইল উত্তরে চলে এসেছি। পথে কয়েকটা বরফের চাঁই মিলেছে, সেগুলো পাশ কাটিয়ে আসতে তেমন অসুবিধে হয়নি। আমরা এখন আসল মেরু তুষারের খোঁজ করছি। আমি ঘণ্টাখানেক ধরে বরফের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলাম। খুব সতর্ক, সজাগ দৃষ্টিতে দেখছি।

সত্যি কথা বলতে কি এই বরফের চেহারায় সেই গৌরবময় শুভ্র আভিজাত্য নেই, ১৯৫৭-র সফরে অতলান্তিক সমুদ্রের দিকে যে সুমহান দৃশ্যময় তুষাররাজি দেখেছিলাম তার সঙ্গে আজকের এই হিমময় দরিয়ার কোনো তুলনাই হয় না। এর মধ্যে যেন কুটিল, নোংরা ইতরতা বিস্তার ক'রে রয়েছে। মনে মনে তথাকথিত মেরুতুষার 'বিশেষজ্ঞ'দের উদ্দেশ্যে অশ্লীল কতকগুলি বিশেষণ অনুচ্চারিত ভাবে স্মরণ করলাম। সব মিঞাই এই বরফের যথার্থ চরিত্র সম্পর্কে কোনো কিছু না জেনে ঝুড়ি ঝুড়ি রাবিশ লিখে পাণ্ডিত্য ফলিয়েছে। অবিশ্যি সে দল থেকে আমিও বাদ পড়ি না। মেরু অঞ্চল সম্পর্কে তথ্যগর্ভ বিবরণে যতো ভুষি মাল আছে বোধ করি ততো আর কোথাও মেলে না।

॥ কুড়ি ॥

আবার সেই পুরনো সমস্যা। চুক্‌চী সাগরের অপরিজ্ঞাত দরিয়ার মধ্যে গভীর জলের সন্ধান ক'রে হাতড়ে হাতড়ে মাথার ওপরের বরফের সংঘর্ষ বাঁচিয়ে চলতে হবে। এ সমস্যাটা আগের বারের মতোই রয়েছে। জাহাজের ঘাড় হেঁট ক'রে বরফের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলার মতো গভীরতা তো চাই।

আলাস্কার পয়েণ্ট ব্যারোর কাছাকাছি, সমুদ্রতলে একটা উপত্যকা রয়েছে, আমরা সে কথা জানি—সেটা অবশ্য আমাদের এখান থেকে পূবে অনেকটা দূরে। সেই 'ব্যারো সী ভ্যালি' উত্তরাভিমুখে বাহু বিস্তার ক'রে মেরু অববাহিকা পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে এসেছে। এখন যেহেতু মেরু তুষার আলাস্কার উপকূল থেকে বেশ কিছুদূর সরে গেছে, আমরা একটু চেষ্টা করলে সেই উপত্যকার সন্ধান পেতে পারি এবং সেটাকে আমাদের সমুদ্রপথ হিসেবে কাজেও লাগাতে পারি। অবিশ্যি সেটা আমাদের পথ থেকে একটু দূরে পড়ে, তাছাড়া সেই পথ ধরে চললে উপকূলের কাছ দিয়েই চলতে হবে, তাতে লোকের নজরে পড়ার আশঙ্কাও রয়েছে।

চুক্‌চী সমুদ্রের বুকে খাড়া উত্তরেই আমরা চলতে লাগলাম। মনে মনে এই আশা ছিল যে, হয়তো হঠাৎ কোনো অনাবিষ্কৃত উপত্যকার সন্ধান মিলেও যেতে পারে।

বুধবার ৩০শে জুলাই-এর সূচনাটা দেখে মনে হ'ল, দিনটা ভালোই যাবে। রাত দুপুর থেকে ভোর চারটের খবরদারী খুব হুঁশিয়ার ভাবে চলেছে। সোনার যন্ত্র আর ফ্যাদোমীটারের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখা হয়েছে। এদিকে নটিলাস এগিয়ে চলেছে আঠারো মাইল বেগে। আমরা তখন ৭০ ডিগ্রি ৪৫ কলা উত্তরে পৌঁছে গেছি। ডেকের অফিসার

পেরিস্কোপের ভেতর দিয়ে বরফের দিকে লক্ষ্য রাখছে। যদিও গভীর রাত হয়েছে, কিন্তু নটিলাসের ভেতরটা দিনের আলোর মতোই উজ্জ্বল। একটু পরেই আমরা বরফ পেলাম—তাকে কাটাবার জন্যে কখনও দক্ষিণে, কিম্বা পূবে বাঁক নিয়ে চলি। সোনারে দেখা গেল 'আমরা যে অঞ্চল দিয়ে চলেছি সেখানে ছোট ছোট বরফের চাঁই রয়েছে, সেগুলো জলের মধ্যে অনেকখানি নেমে এসেছে। লালর এগুলোর নাম দিল বরফের টুকরো। আমাদের প্রথম অভিযানে এইরকম ক্ষুদে বরফই পেরিস্কোপকে ঘায়েল করেছিল সে কথা স্মরণ আছে তাই জাহাজ থামাতে হুকুম দিলাম। তারপর ধীরে ধীরে জলের ওপর উঠে এলাম।

বরফের অবস্থাটা ভালো করে দেখবার জন্যে আমি ব্রিজের ওপর উঠে পড়লাম। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে আমরা স্তূপ-তুষারের মধ্যে এসে পড়েছি। অবিশ্যি এটা মেরুতুষারের জমাট বরফ এলাকা কিনা তা সুনিশ্চিত বলা যাচ্ছে না। আমার চোখে বড় চাঙড় একটাও পড়ছে না। এ অবস্থায় নিচে নেমে চলতেও খুব ভরসা পাচ্ছি না—জল এখানে মোটেই গভীর নয়। এই সফরে আমি ধীরে ধীরে স্বচ্ছন্দে চলতে চাই। যতক্ষণ পারা যায় এই ভাবেই চলবো—তারপর তুষারের হুমকী অথবা অন্য কোনো বিপদ যদি আসে, তখন তার ব্যবস্থা করা যাবে।

একটা ছোট বরফের টুকরো আমাদের ডেকের উপর এসে হাজির। ডেকের একদল লোককে বললাম, 'ওটা তুলে রাখো।' মনে হ'ল মেরুতুষারের স্মারক হিসেবে টুকরোটা সংগ্রহ ক'রে রাখা মন্দ নয়। বরফটাকে আমাদের 'ঠাণ্ডা ঘরে' মজুত রাখা হ'ল। অনেক দিন পরে, নিউইয়র্কে পৌঁছে ওটা এ্যাডমিরাল রিকোভারকে মেরু-স্মারক রূপে উপহার দিয়েছিলাম। রিকোভারকে যারা হৃদয়হীন, নিরস মনে করে তারা যদি এসেই সময়ে শিশুসুলভহাসিটুকু দেখতো তাহলে নিশ্চয় তাদের ধারণা বদলে যেত। বরফের টুকরোটা হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে তন্ময় হয়ে দেখতে লাগলেন তিনি। আমার ত মনে হ'ল যে, তাঁকে যে পদ গৌরবে ভূষিত করা হয়েছে, তাঁর নামের যে মহিমা প্রচার করা হয়েছে, আজ পর্যন্ত তাঁকে যে সম্মান দেওয়া হয়েছে—সেগুলো সব একত্রিত করলেও এই বরফ হাতে পাওয়ার খুশির সময় ধারে কাছে পৌঁছয় না।

আমরা ওপরে উঠেছি অতএব আমাদের কতকগুলো কাজও সেরে নেওয়ার সুযোগ মিলল। কয়েকটা বরফসন্ধানী যন্ত্রে জল ঢুকে বিগড়ে গিয়েছিল সেগুলো মেরামত ক'রে নেওয়া হ'ল, জাহাজে তাজা হাওয়া নেওয়া হ'ল। আর জাহাজীরা অনেকে ওপরে উঠে এল এই বিচিত্র অঞ্চলটা চাক্ষুষ করার কৌতুহল নিয়ে। এখানে আমাদের কেউ দেখে ফেলার আশঙ্কা কম। আমরা বরফের কাছাকাছি রয়েছি ; কুয়াশার পর্দাও খুব পুরু। এর চেয়ে মানব বর্জিত পরিবেশ কল্পনা করা যায় না।

কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা নিচে নেমে এলাম, তবে গভীর জল এখানে নেই, গভীর জল খুঁজছি। পশ্চিম দিকটা বরফে চাপা, কাজেই পূব দিক ধরে মাইল দশেক চলে এসে উত্তরে বাঁক নিলাম। আমার জানা আছে ৭৩ ডিগ্রি উত্তরে অক্ষাংশের কাছে গভীর জল পাবো। বেশ কয়েক ঘণ্টা জাহাজ চালাতে হ'ল আট থেকে কুড়ি মাইল বেগে, তারপর আমরা ডিগ্রি ৪৫ কলা উত্তরে পৌঁছলাম। কিন্তু এখানেও ডুব দিয়ে চলার মতো গভীরতা নেই। আবার বরফের অবস্থা বিচার করতে লাগলাম—কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে ঘন কুয়াসা নেমে এসে আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে দিল।

কতকটা হতাশ হয়েই নটিলাসের গতি বিপরীত মুখে ফেরাতে বললাম। আমরা প্রথমে দক্ষিণে তারপর পূবে এবং তারও পরে উত্তরে চলতে লাগলাম—আবার দেখি পথ বন্ধ। কুয়াশা কেটে যেতে দেখলাম, পশ্চিম দিকটা কঠিন বরফের স্তূপে রুদ্ধ। উত্তর আর পূবের জল পরিষ্কার। এবার আমরা উত্তর-পূর্ব দিকে মুখ করে কুড়ি মাইল বেগে চলতে শুরু করলাম। চলতে চলতে আমি পশ্চিম দিকের বরফের অবস্থাটা লক্ষ্য করতে লাগলাম।

এর মধ্যে কতকাংশের রং একেবারে কয়লার মতো কালো। এই বরফ জমেছে সমুদ্রতীরে, সেখানকার ময়লা এতে জমে রয়েছে। এবড়ো-খেবড়ো গড়নের এক-একটা চাঙড় চল্লিশ ফিট আন্দাজ উঁচু, অর্থাৎ এর নীচের অংশটা অন্তত: ১২০ ফিট জলের তলায় রয়েছে। বলাই বাহুল্য যে আমি ওই মারাত্মক বরফের নীচে নটিলাসকে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা করবার জন্যে নিয়ে যেতে নারাজ। প্রথম সফরে তো সে স্বাদ পেয়েছি!

আমাদের রেডিওর লোকেরা খবর সন্ধান করছে—যদি নটিলাসের উদ্দেশে কোনো বার্তা পাঠানো হয়ে থাকে! অনেক চেষ্টা ক'রে শেষে পাল'হারবার থেকে পাঠানো তুষারবার্তা পেল তারা। সুসংবাদ তো নয়—কোনো সংবাদই তারা দিতে পারছে না। বৈজ্ঞানিকেরা অনেক চেষ্টা করেও বরফের কোনো খবর আনতে পারেনি—সেখানে কুয়াশায় সব ঢেকে রয়েছে। অতএব, আমাদের আপন অনুসন্ধানের উপরই নির্ভর ক'রে চলতে হবে।

জমাট বরফের কোল ঘেঁসে ঘেঁসে আমরা গভীর জলের সন্ধানে চক্কর খেতে লাগলাম। একের পর একটা ঠোকর খাচ্ছি। আমার এই অবস্থা দেখে এক জাহাজী তো গানই বেঁধে ফেলল: 'পথ খুঁজে না পেলে পাগল—সব দরজায় বন্ধ আগল।'

শেষে আমি অধীরভাবে শেপ্ জেঙ্কসকে বললাম—"না, এ-অসম্ভব! চলো পূবে যাই ব্যারো সী ভ্যালি দিয়ে চেষ্টা করি।" আমি পরাভূত হয়েছি। এখানে পথ না পেলেও, অন্য কোনো পথ দিয়ে আমাদের যেতে হবে—সেই পথটা খুঁজে বার করতে হবে। এদিকে সময় বয়ে যাচ্ছে—ওয়াশিংটনের উচ্চতম মহলের দৃষ্টি এখন এই উত্তর মেরুতে পড়ে রয়েছে। আমরা যে সফল হবো, শুধুমাত্র এই আশাই তাঁরা করেন না, তাঁদের আশা আমাদের এই মেরু-পরিক্রমা দ্রুতিময় হবে।

অতএব আমরা মন্থর বেগে সাবধানে পূব-দক্ষিণে জমাট-বরফের সীমানার ধার দিয়ে 'পয়েণ্ট ব্যারোর দিকে যাত্রা করলাম। যেহেতু এখন আমরা ডাঙার কাছ দিয়ে চলেছি, আমাদের গতিবিধির উপর অন্যের দৃষ্টি পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এখান দিয়ে সামরিক বিমান চলাচল করে, আমাদের বরফ সন্ধানী বিশেষ বিমানটিরও এখানে এসে পড়া বিচিত্র নয়। কাজেই আমাদের খুব সাবধানে সব দিকে চোখ-কান খোলা রেখেই চলতে হবে। এই বলে অজ্ঞাত পরিচয় কোনো সাবমেরিনকে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেলে যে প্রচণ্ড উত্তেজনার সঞ্চার হবে তাতে আমাদের অভিযাত্রার গোপনতার নিরাপত্তা বজায় থাকবে না। অতএব, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার!

কয়েক ঘণ্টা পরে ডেকের অফিসার কেন্ কার এবং কনিষ্ঠ অফিসার বব্ ক্যাসেল ব্রিজ থেকে ভিজে চুপ্‌সে নেমে এল।

কার বলল—"ওপরে প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছে। ক্যাপ্টেন সাহেব!"

ডঃ লয়েন ওয়ার্ডরুমে বসে এক পেয়ালা কফি দিয়ে ক্লান্তি ধুয়ে ফেলছিলেন। কারের কথায় কান খাড়া ক'রে তিনি বল্‌লেন—"আরে বলো কী! মেরু অঞ্চলে ত বড় একটা বৃষ্টি হয় না। তোমাদের সৌভাগ্য কি কম। ধরো তামাম দুনিয়ার মানুষের ইতিহাসে যে মুষ্টিমেয় লোক মেরু-বর্ষণের ছোঁয়া পেয়েছে, তোমরা দুজনে তাদেরই দলে পড়লে।"

কার আর ক্যাসেল গা থেকে ভিজে পোষাক খুলছে। তাদের ব্যাজার মুখ চোখের চেহারা দেখে আমার মনে হ'ল এই সন্দেহজনক সম্মানের ওপর তাদের যেন কোনো টানই নেই। তাদের মেজাজ যেন শরীফ নয়।

এই বর্ষণে একটা কথা মনে এল আমার। নটিলাসকে প্রথম জলযাত্রায় নামানো হয় যেদিন, সেদিন এই বাণী উচ্চারিত হয়েছিল "নটিলাসের মাথায় সবসময় সূর্যের হাসি।" সেদিনও টেম্‌সের আকাশটা মেঘে-কুয়াশায় ছেয়ে ছিল। কিন্তু যে-মুহূর্তে শ্রীযুক্তা ডুইট্ আইজেন্‌হাওয়ার নটিলাসকে আশীর্বাদ করবার জন্যে এগিয়ে এলেন, কুয়াশা ভেদ ক'রে সূর্য কিরণ ছড়িয়ে পড়ল। ঘটনাটা এমনই আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত-ভাবে ঘটেছিল যে, সেখানে যারা উপস্থিত ছিল তারা এটা দৈব ব'লেই মনে করেছিল।··· আর আজকের এই মেরুসীমার দুর্লভ-বর্ষণটা, তবে কি দুর্দৈব? এটা কি অশুভ সূচিত করছে?

দুপুরে আমাদের রাডারে এরোপ্লেনের শব্দ ধরা পড়ল, আমরা নিচে ডুব দিলাম। যে-ই আমরা তলায় নেমেছি অমনি আমাদের সোনারে একটা বিদ্‌ঘুটে শব্দ আসতে লাগল। এক পাল সিন্ধুঘোটক আমাদের সঙ্গ নিয়েছে। তারা হয়তো এই নতুন দানবটিকে দেখার কৌতূহল নিয়েই এসে জুটেছে। তাদের এই নিশ্চিন্ত নিজস্ব সম্পত্তির ওপর কে আবার হামলা করতে এল!

আমাদের অগ্রগতি বিঘ্নিত, মন্থর। প্রখর উত্তুরে হাওয়াতে জমাট বরফের লম্বা হাত যেন জলের নিচে নেমে এসে আমাদের পথ রোধ

করে রয়েছে—এইসব বাধাকে এধার-ওধার দিয়ে পাশ কাটিয়ে আমাদের চলতে হচ্ছে। একবার ত এইরকম দুই দ্বীপকল্পের মধ্যে আমরা আটকেই পড়লাম—শেষে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমাদের অনেকখানি উত্তরে ঘুরে মরতে হ'ল। সেদিন সন্ধ্যের পরে আমরা টুকরো বরফের রাজ্যে গিয়ে পড়লাম। আর সেই সঙ্গে দলবেঁধে কুয়াশার পুঞ্জ হামাগুড়ি দিয়ে আমাদের ঘিরে ফেলল। আমি হুকুম দিলাম, জাহাজ ওপরে তোলো। তাতে আমাদের গতি মন্থর করতে হবে বটে—কিন্তু পেরিস্কোপ নষ্ট হওয়ার হাত থেকে বাঁচবো।

ওদিকে যন্ত্রপাতির খুচ্‌খাচ গণ্ডগোলের খবর ত আসছেই। তাতে অসুবিধেও কিছু হচ্ছে। কিন্তু এর মধ্যে মারাত্মক হাঙ্গামা বাধলো, ময়লা পরিষ্কারের নলটা বন্ধ হয়ে। আমাদের জাহাজের মানুষগুলির স্বাস্থ্য এর ওপর নির্ভর করছে। এই নলটা জাহাজের তলা দিয়ে একেবারে সমুদ্রের মুখে গিয়ে পড়েছে। এর যান্ত্রিক কৌশল কারিগরী খুব জটিল। জাহাজ থেকে সমুদ্রের জলে ময়লাগুলো পড়বে অথচ সমুদ্রের জল জাহাজে ঢুকবে না—এমন ভাবে একে গড়তে হয়েছে। কেন না এই দশ ইঞ্চি নল দিয়ে একবার জল ঢুকতে শুরু করলে ত জাহাজ বোঝাই হয়ে যাবে! এই ময়লা-পরিষ্কার-করা নল দিয়েই আমাদের গোটা জাহাজের যাবৎ বাতিল মাল বাইরে যায়। প্রথম সফরে এই নল খারাপ হয়ে আমাদের অনেক অসুবিধে সৃষ্টি করেছিল। জাহাজে মোট ১১৬ জন রয়েছি আমরা। প্রত্যেকে দৈনিক তিনবার খাই,—৩৪৮টি খানার অনুপাতে পুরিষাদির পরিমাণ ত নেহাত উপেক্ষার বস্তু নয়। অতএব নল আটকে গেলে খুব মুস্কিল। আমি ক্ষতিনিয়ন্ত্রণ অফিসার লেঃ স্টিভ হোয়াইটকে নির্দেশ দিলাম—অবিলম্বে এর বিহিত করো।

অনেক রকম কায়দা কানুন ক'রে হোয়াইটের মেরামতী দল নলের মুখ পরিষ্কার ক'রে ফেলল। জঞ্জালের দুটো বস্তা নলের মুখ আটকে রেখেছিল—সেগুলো সাফ করে দিতেই আবার সব ঠিক হয়ে গেল। এরপর জঞ্জাল সাফ করার জন্য একটা বিশেষ দল তৈরী করা হল—তারা মেরু-পরিক্রমাকালে জঞ্জাল ফেলার কাজ তদারক করবে।

সে রাতের বাকী সময়টা আমাদের মন্থর গতিতে পয়েণ্ট ব্যারোর

দিকে এগোতে এগোতেই কাটল—আমরা সতর্ক পদক্ষেপে চলেছি পথের সন্ধানে। সমুদ্র এমনিতে শান্ত, কিন্তু ছোট ছোট ভাসা বরফের টুকরো জলে অসংখ্য। আর ওই থোকা থোকা কুয়াসা আমাদের গতিকে ব্যাহত করছে। মাঝে মাঝে থেমে যাবার উপক্রমও হচ্ছে। আসলে যতোটা দক্ষিণে আমাদের যাবার কথা, বাধাবিঘ্ন এড়াতে গিয়ে, তার চেয়ে অনেক বেশি দক্ষিণে চলে এসেছি।

আলাস্কার পয়েন্ট ফ্র্যাঙ্কলিনের ঠিক উত্তরে পৌঁছে রাডারের সাহায্যে আমাদের অবস্থান নির্ণয় করে নিলাম। তাতে দেখা গেল আমরা জমাট বরফের কোণটা ঘুরে এসেছি। অর্থাৎ এখান থেকে আমরা সরাসরি ব্যারো সামুদ্রিক উপত্যকা ধরে চলে যেতে পারবো—এটাই হল মেরু অববাহিকার পশ্চিমাঞ্চলে প্রবেশের দরজা।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা আবার বরফ দেখতে পেলাম। একেবারে চোখ তুললেই দৃষ্টি বরফের উপর পড়ছে। আমরা এখন গভীর জল পেয়েছি। এ জলের গভীরতায় সংশয় নেই—যতই বড় বরফের চাঁই সামনে পড়ুক না কেন আমরা তার তলা দিয়ে ডুবে বেরিয়ে যেতে পারবো।

আমরা এবার তলায় নামবো। শেষ বারের মতো খোলা আকাশটা দেখে নিলাম। মনে মনে বললাম, এই ত পেয়ে গেছি। চলো, এগিয়ে চলো। আকাশ পরিষ্কার, ভোর হয়েছে, পূর্ণিমার চাঁদ তখনো দিগন্ত শোভায় আঁকা রয়েছে। ওদিকে সূর্য উঠছে। দক্ষিণে-হাওয়া মৃদুমন্দ বয়ে চলেছে। আমরা সমুদ্রের বুকে ডুব দিচ্ছি, পরিস্কোপ দিয়ে ওপরের পৃথিবীকে দেখে নিলাম।

আমরা উত্তরপূর্বে সামুদ্রিক উপত্যকা ধরে গভীর জলের দিকে চলেছি। সব ক'টা সোনার যন্ত্র চালু করা হয়েছে, অপারেটররা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গভীর জলে নেমে-আসা বরফের সন্ধানে সজাগ। আমি একভাবে ফ্যাদোমীটারে নজর রেখেছি—জলের গভীরতা ক্রমেই বাড়ছে, আর প্রশস্ততর হচ্ছে সমুদ্রের গভীরাঞ্চল। এবার আমার প্রতীতি হচ্ছে যে, অবশেষে আমরা সফলতার পথে সত্যিই এসে পড়েছি।

উপত্যকা ধরে এগিয়ে আমরা নটিলাসকে গভীর দরিয়া দিয়ে নিয়ে চলেছি—জাহাজের গতিবেগ এখন সাতাশ মাইল। মনে হচ্ছে যেন কোনো

জনাকীর্ণ নাগরিক বর্ত্ম ছেড়ে আমরা ফাঁকা পথে জোর কদমে এগিয়ে চলেছি।

অল্পক্ষণের মধ্যেই যথার্থ-মেরু তুষারের তলায় পৌঁছে গেলাম। কতো চেষ্টার পর, শত কষ্টের পর, বহু তপস্যালব্ধ এই গভীর জলটুকু পেয়েছি—এই হ'ল আমাদের আসল পথ, এখানে আমাদের সব কলকব্জাই পোষা-পাখির মতো কাজ করছে।

পয়লা অগাস্ট সকাল আটটা বাহান্নতে ডেভিড্ গ্রীনহিলকে নির্দেশ দিলাম—"বাঁয়ে উত্তরে চলো। সরাসরি সামনে ১০৯৪ মাইল এগিয়ে গেলেই উত্তর মেরু ; তার ওপারে আটশ মাইল দূরে রয়েছে গ্রীণল্যাণ্ড স্পিটস্‌বার্জেন—সেখানে এই তুষারলোকের সীমা শেষ। আমরা যদি নির্বিঘ্নে চলতে পারি, তাহলে ওখান দিয়ে আবার পৃথিবীর মুখ দেখবো, বরফের রাজ্য পেরিয়ে যাবো।

॥ **একুশ** ॥

উত্তরমেরুর সমীপবর্তী তুষাররাশির বর্ণনায় পিয়েরা বলছেন: পথচিহ্নহীন, বর্ণবৈচিত্র্যবর্জিত এই অঞ্চলে স্তূপীকৃত বরফ ছাড়া আর কিছুই নেই।" আর সার জন রস্ তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন: "কিন্তু একথা যেন মনে থাকে যে, এখানকার সমুদ্রে ভাসমান শক্ত বরফ পাথরের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। আর যেখানে তলা পর্যন্ত গেছে সেখানে ত বরফের দ্বীপ রচিত হয়েছে। তাকে স্বচ্ছন্দে গ্র্যানাইট (স্ফটিক) পাথর বলা যায়।" তাঁরা ঠিকই বলেছেন। কিন্তু তাঁদের যুগের কল্পনায় ১৯৫৮-র নটিলাস ছিল না;

শনিবার, অগাস্টের দু' তারিখ চারশ' ফিটের ওপর দিয়ে নটিলাসের একশ' ষোল জন মানুষ জাহাজের স্বাভাবিক গতিবেগে দৌড়চ্ছে, এখনো আমাদের যাত্রার চুয়াল্লিশ ঘণ্টা বাকী রয়েছে। এর আগে এবম্বিধ দুঃসাধ্য রোমহর্ষক অভিযানে কোনও নাবিক পা বাড়ায় না—অভূতপূর্ব। মাথার ওপরে কঠিন বরফের ভার, সমুদ্রগর্ভে পঁয়ষট্টি ফিট নিচে নেমে এসেছে, বরফের এবড়ো-খেবড়ো তলদেশ আমাদের গোচরীভূত হচ্ছে।

যদি বলি যে, এই বরফের তলা দিয়ে স্বচ্ছন্দে ডুবে পার হওয়া যায়, তাহলে সত্যের ডাহা অপলাপ হবে।

প্রথমে আমি আর ফ্র্যাঙ্ক এ্যাডাম্‌স দু'জনে "নজর রাখার" কাজে মোতায়েন ছিলাম। দু'জনের মধ্যে একজনকে সব সময়ই সতর্ক থাকতে হচ্ছে। যখন এ্যাডামস্ ভার নিল তখন আমি একটু ঘুমোবার ছুটি পেলাম। অবিশ্যি এখন জাহাজীরা এই অঞ্চলের রকম-সকমে অনেকটা রপ্তো হয়ে নিয়েছে।

যতোই গভীরতর সমুদ্রগহ্বরে নামছি, বরফের নীচে ডুবছি ততোই আমার মনে হচ্ছে: আচ্ছা, সেই বিন্দুটা কোথায়?—যেখানে পৌঁছনো

যায় না, যেখানে পৌঁছলে আর ফেরা যায় না! সেটা কোথায়? এখানে? না কি এখান থেকে আরও একশ মাইল সম্মুখে? কিম্বা এখনো এক দিনের যাত্রা? অথবা সেই উত্তর-মেরু অবধি তার সীমা প্রসারিত? সত্যি, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে, আমার মনের তলায় সেটা "অভেদ্য, অপ্রবেশ্য মেরু" ব'লেই বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে। জমাট বরফের ভৌগোলিক মধ্যস্থল (আনুমানিক) আসল উত্তর মেরুর চারশ মাইল নীচে। তা সে যেখানই হোক, আমাদের তাতে কী? সমুদ্রের নীচে এই আরামের গরম ঘরে বেশ ত রয়েছি আমরা।

জাহাজের সবারই মেজাজ খুব চাঙ্গা, সবাই কাজ করছে মহা উদ্যমে। আমরা যেখানে আবার গভীর দরিয়ায় পড়েছি, সেখান থেকেই ওদের প্রত্যয়ের প্রত্যাবর্তন ঘটেছে—ওরা ধরে' নিয়েছে যে আমাদের এটা ঘরের পানে ফিরে যাওয়ার পাড়ি। আমাদের জাহাজ এখন চলেছে সাতাশ মাইল বেগে। খতিয়ানে সেটা পড়ে নিয়ে প্রধান মেশিনিস্ট স্টুআর্ট নোল্‌সন (ওকে এখন সবাই ছেঁদা সারাইওয়ালা বলে) ইঞ্জিন ঘর থেকে প্রায় দৌড়ে এসে বলল—"আচ্ছা, এঞ্জিনিয়াররা আর মাইল তিনেক বেগ বাড়িয়ে দিলে ত জলদি বাড়ি পৌঁছানো যায়।" আমি ত্রিশ মাইলে চালাবার হুকুম দিলাম। গোটা জাহাজে গতির শিহরণ গর্‌-গরিয়ে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠল। বেড়াল যেমন খুশিতে গর্‌র্‌ শব্দ ক'রে নটিলাসও এখন তেমনি।

হাতে তামাকের পাইপ পাশে ধূমায়িত কফির পেয়ালা রয়েছে, আবহাওয়া বিশ্লেষণের ফাঁকে, হস্‌পিট্যাল্‌ম্যান জার্‌ভিস গম্ভীর ভাবে কা'কে যেন বল্‌ল—" "আরে বাচ্চু, এই হ'ল অভিযানের যথার্থ পদ্ধতি! সারা দিনরাত সোঁ সোঁ শব্দে ত্রিশ মাইল বেগে পায়চারী করো, জাহাজ গরম রাখো, উমদা তোফা খানা খাও। ব্যস, দেখবে কপাল তোমার হাতের তলায় লুটোপুটি খাচ্ছে। বাউণ্ডুলের মতো এই নোংরা, বিদঘুটে, বে আক্কেলে বরফের ওপর দিয়ে এ্যাডমিরাল পিয়ে র যেমন হেঁটেছিল সেইভাবে আমি হাঁটতে রাজী নই—ছোঃ, ওই কি অভিযান নাকি!"

আমাদের মধ্যে প্রায় সকলের কাছে উত্তরমেরু অভিযানই প্রিয় বটে, তবে আমাদের অভিযাত্রার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে

আটলান্টিক সাগরে যাওয়া—উত্তর পশ্চিমে এক নূতন পথের সূচনা করা। দিগদর্শনের দিক দিয়ে যদি ৮ উত্তর মেরু এড়িয়ে নিম্ন অক্ষাংশ ধরে' চলাই সুবিধাজনক, তবু আমরা উত্তর মেরু ডিঙিয়ে যাচ্ছি তার প্রধান কারণ এই পথটা দূরত্বে অনেক কম আর সময়ও লাগে খুব কম। এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত পথ আর হয় না। তা ছাড়া উত্তর মেরুর এত কাছে এসে তা ডিঙোবার লোভ কি সংবরণ করা যায়।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক নাগাড়ে ডঃ লয়েন তাঁর সোনার যন্ত্রের উপর চোখ সেঁটে বসে রয়েছেন—সোনারের কাঁটায় আভাসিত বরফের তলার রাজ্যের খুঁটিনাটি খোঁজ খবর লক্ষ্য করছেন। তাঁর এই নতুন যন্ত্রটা ১৯৫৭-র যন্ত্রের চেয়ে অনেক বেশি নিখুঁত আর খুঁটিনাটি খবর ধরবার ক্ষমতা রাখে। এখানে আমরা জানতে পারলাম যে, এখন বরফের দুটো বিরাট টিলা জলের নিচে ১০০ ফিট আর ১২০ ফিট নেমে এসেছে। আমরা যতো এগিয়ে যাচ্ছি ডঃ লয়েনের যন্ত্র বরফের চরিত্র, প্রকৃতি, আকার সম্পর্কে ততোই অধিক বিবরণ সংগ্রহ করছে। আর মেরু অববাহিকার তলদেশ সম্পর্কে আজ অবধি ইতিহাসে যে সংবাদ উদ্ঘাটিত হয় নি সে সবও সংগ্রহ করে দিচ্ছে। পরে ডঃ লয়েন যখন জাহাজ ছেড়ে গেলেন তখন তাঁর সঞ্চয়ে দুটি ট্রাঙ্ক বোঝাই বিবরণী মজুত হয়ে গেছে।

তা ছাড়া এই এতাবৎ অজ্ঞাতপরিচয় সমুদ্রতলের রহস্যভেদ সম্পর্কেও নতুন অভিজ্ঞতা আমাদের কম হ'ল না। আমাদের এই সন্ধানী যন্ত্রের দৃষ্টি বড় সজাগ এবং তীক্ষ্ণ। তার পরিচয় আমরা অনেক পেয়েছি। ৭৬ ডিগ্রি ২২ কলা উত্তরের সমুদ্রতল সম্পর্কে প্রাক্তন কোনো মাপ আমাদের জানা ছিল না। আমাদের ফ্যাদোমীটারে মোটামুটি সাড়ে বা[illegible] হাজার ফিট গভীরতা দৃষ্ট হচ্ছে। হঠাৎ সেটা ন' হাজার ফিটে এবং তারপর ঝপ্ ক'রে তিন হাজার ফিটে চলে এল। আমার খুবই দুর্ভাবনা হ'ল।

কয়েক ঘণ্টা ফ্যাদোমীটারের পাশে খুঁটিগেড়েই বসে রইলাম। আমাদের জাহাজের তলায় যে রুক্ষ উচ্চাবচ ভূ-খণ্ড অবস্থিত তারই বিচিত্র সংবাদ আমার গোচরীভূত হচ্ছে—দুরারোহ খাড়াই পাহাড়, সমুদ্রগর্ভস্থ পর্বত-মালা, সমুদ্রতল থেকে হাজার হাজার ফিট উঁচু হয়ে উপরে উঠে এসেছে। মাঝে মাঝে এই পাহাড়ের চড়াই উৎরাই দেখে দেখে আমি জাহাজের

গতিকে কমাতে বাড়াতে বলছি। সমুদ্রতলের এই পাহাড়গুলি চাঁদের গহ্বরের মতো বন্ধুর এবং ভয়াবহ মনে হয়।

আমি যখন যন্ত্রের পর যন্ত্রের উপর চোখ বুলিয়ে লক্ষ্য রাখতে ব্যস্ত তখন আমাদের হাসপাতাল বিভাগের খোদ কর্তা এ্যাবার্লে এসে জানাল জাহাজের ভেতরের আবহাওয়া রীতিমত স্বাস্থ্যকরই রয়েছে।

আমরা ৮৩ ডিগ্রি ২০ কলা উত্তরে জমাট বরফের ভৌগোলিক কেন্দ্র-বিন্দু অতিক্রম করলাম,—একেই 'তুষার মেরু' বা 'অনধিগম্য মেরু' বলা হয়। যতকাল আণবিক-শক্তি পরিচালিত ডুবো জাহাজ ছিল না ততকাল এই নামটা সার্থক ছিল বটে, কিন্তু এখন এর নামটা পাল্টে রাখাই সমীচীন হবে।

আপন নাবিকদের দৌলতে নটিলাস 'সময় এবং সীমার উপর স্থির হয়ে রয়েছে' এই প্রবাদটা মিথ্যে নয়। জাহাজের প্রতিটি প্রাণী আমাদের উত্তর অভিমুখে গতি সম্পর্কে দস্তুরমতো সচেতন। সময় বয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি বিভাগের কর্মরত দল আমাদের অকল্পনীয় অগ্রগতির বহর দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছে। ইলেকট্রনিক্সের যন্ত্রের লোকেরা হাঁ ক'রে মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে মাইলের পর মাইল পেরিয়ে যাওয়া দেখছে, কেউ বা টেলিভিসনের সামনে খাড়া হয়ে পুঞ্জ পুঞ্জ উড়ো মেঘের মতো বরফ সরে যাওয়া দেখছে অবাক চোখে। আশা আর আশঙ্কায় দোলা-চলচিত্ততায় গোটা জাহাজটা টলমল করচে। কারুর চোখে ঘুমের লেশমাত্র নেই। মনে মনে আমরা অনেকেই এই যাত্রার সাফল্য প্রার্থনা কর ছি। এ অভি-যাত্রা সার্থকতার নাগালে এসে গেছে।

আমাদের জাহাজের মনস্তত্ত্ববিদ ডাক্তার কিন্‌জে নিত্য-কর্মপদ্ধতি মাফিক তাঁর রহস্যজনক ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন। রোজ একদল স্বেচ্ছাব্রতীকে একগাদা ছাপা প্রশ্ন সম্বলিত কার্ড বিলি করেন তিনি, তাতে জিজ্ঞাস্য থাকে—'তুমি কি সুখে আছো?' যে সুখী নয় সে একটা 'ব' লিখবে, যে স্বল্পসুখী তাকে 'ব-ব' লিখতে হবে, কেউ তিনটি 'ব' লিখলে বুঝতে হবে সে ব্যক্তি মহানন্দে রয়েছে, চারটে 'ব' হ'লো সম্মোহিতের লক্ষণ। ব্যক্তিগতভাবে এসব আমার কাছে বিশুদ্ধ গাঁজা ছাড়া অন্য কিছু নয়। কাজেই আমি স্বেচ্ছাব্রতীদের দলে নাম লেখাই নি।

ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো অবস্থা আমার নেই। সর্বদাই মনে

ভয়, যদি কলকব্জার কোনো গণ্ডগোল হয়, তবে সবই মাটি—১৯৫৭তে আমরা ব্যর্থ হয়েছি এই যান্ত্রিক বৈকল্যে। শুধু আমি কেন, জাহাজের অনেককে এ আশঙ্কা জপ-মালার মতো উদ্বিগ্ন করে রেখেছে। সবাই আপন এক্তিয়ারের যন্ত্রপাতিগুলো বার বার পরখ করছে—যদি কোনো গোলমাল দেখা দেয়, তাহলে প্রাথমিক পর্যায়েই যাতে সেটা শোধরানোর সুযোগ মেলে, যাতে বৃহত্তর বিপর্যয়ের হাত থেকে জাহাজকে বাঁচানো যায়। আমরা যেন ব্যর্থ অভিযানের অগৌরব ঘাড়ে নিয়ে না-ফিরি, আমরা যেন এই তুষার লোকের নিম্নদেশে আটক না-পড়ি। আমরা ডুবে মরতে নারাজ, আমরা সাফল্যের অভিপ্রেত যাত্রী হতে চাই।

আমি ঘুমোই না—ঘুম আমার আসে না। জাহাজের এধার থেকে ওধার পর্যন্ত অস্থির পদক্ষেপে দিন থেকে রাতে পৌঁছই, রাতকে পায়চারী ক'রে প্রভাতে পৌঁছে দিই—মাঝে মাঝে পেরিস্কোপে চোখ রাখি, অবাক হয়ে যাই এই জলের মধ্যে ফস্ফরাস-বিচ্ছুরিত আলো দেখে। প্রস্ফুরক তো উষ্ণ অঞ্চলের সাগর জলেই দেখা যায়। এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা জলেও স্ফুরক থাকে! এখানকার শৈত্য ত সামান্য নয়, আমাদের ইঞ্জিন ঘরের বাইরে জলের পাইপের গায়ে পুরু সরের মতো তুষার জমে থাকে।

আমি যখন জাহাজে পায়চারী করি তখন জাহাজীদের মধ্যে কতো রকমের খোশ গল্প হয়, তার দু-একটা কানে আসে, আর মনে হয়, এরা বেশ রয়েছে।

এক জাহাজী তার স্যাঙাত্‌দের বলছে, নটিলাস যখন নিউ অর্লিন্সে থেমেছিল সেই সময়ের কথা: "বুঝলে, তখন ভোর হয়ে আ ছে, আমি ত হন্তদন্ত হয়ে জাহাজ-ঘাটার দিকে ছুটছি—সন্ধ্যে থেকে ত 'মাঙ্কি বার' আর ফরাসী বেবুশ্যেদের 'আস্তানায় কেটেছে! রাস্তায় জনমনিষ্যি নেই, আমি একা! চলেছি, না ছুটছি—সকালের আগে হাজ্‌রি বজায় রাখা চাই। রাস্তা পেরিয়ে দেখি এক ব্যাটা সোমত্ত ভিখিরি আমার দিকে হন্‌হন্‌ ক'রে এগিয়ে আসছে, আমাকে থামিয়ে সে পয়সা চাইল, ভিক্ষে! এক নজরেই ঘুঘুটিকে চিনে নিয়ে বল্‌লাম, কেন ঘাঁটাচ্ছ বাচ্চু! রাস্তার এদিকটা আমার হদ্দো, এখানে হামলা ক'র না—তুমি তামার এলাকায় কারবার

চালিয়ে যাও।' ব্যস, বাছাধনের বদনখানা এ্যাসা বিগড়ে গেল! আহা সে যদি তোমরা দেখতে! শালা একেবারে কেঁচো!"...

আর এক কামরায় দুই জাহাজী কাজে মোতায়েন। তাদের দুজনের কথা:

বিল্ বলছে—'আচ্ছ জো! বলতো মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু কে?'

জোর জবাব—'জ্ঞান হয়ে অবধি শুনে আসছি, কুকুর!'

—'নাঃ—'

জো—'কুত্তা নয়! তবে?'

—'মাদী মেছো কুমীর! বুঝলে, বুদ্ধু!' তারপর বিল্ তার সপক্ষে যুক্তি দেখাল—'কেন জানো! ফি বছর এই মাদী কুমীররা ডাঙায় এসে এক হাজার ডিম পাড়ে! লোকে বলে, মাদী কুমীর ঘুরে ফিরে হাজার ডিমের নশো নিরানব্বইটা নিজেই সাঁটিয়ে দেয়!'

জো বলল—'বেশ ত! তাতে মাদী কুমীর বন্ধু হ'ল কি ক'রে?"

—"আরে, মাদী কুমীরে যদি নশো নিরানব্বইটা নিজের ডিম না খেয়ে ফেলতো তাহলে তামাম দুনিয়াটা মেছো কুমীরে ছেয়ে যেত! তাহলে, বন্ধু হ'ল না? তুমিই বলো।"

হাল্কা চালে কথাবার্তা কইলেও প্রত্যেকেই আপন কর্তব্যের ক্ষেত্রে হুঁশিয়ার—সকলেই জরুরী অবস্থার জন্যে তৈরী। এ অঞ্চলে বরফ ছাড়া জলরাশি কিম্বা প্রণালী সচরাচর মেলে না, তবে যে ক'টা রয়েছে তার হিসেব-ছক এঁদের নখদর্পণে—যাতে, দরকার পড়লেই আমরা জায়গা মাফিক, চট্ করে জলের ওপর ভেসে উঠতে পারি। ওদিকে টর্পেডো ঘরে জেম্স্ প্রেটার কাজ করছে—ভাণ্ডার থেকে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন জাহাজের খোলে ঢেলে দিচ্ছে। আর তার কাছেই রয়েছে রিচার্ড জ্যাকম্যান, হুকুম পেলেই নিমেষের মধ্যে সে টর্পেডো চালিয়ে বরফের বুক ফাটিয়ে জাহাজকে ওপরে তোলার পথ তৈরী ক'রে দেবে।

যে-কোনও প্রকার জরুরী অবস্থার জন্য আমরা হামেশা তৈরী—কিন্তু মনে হচ্ছে যেন বিপদের আশঙ্কা অমূলক। সত্যি বলছি, এরকম সুষ্ঠুভাবে জাহাজের সবগুলো যন্ত্রের কলকব্জা চলতে খুব কমই দেখেছি।

'অগাস্টের চার তারিখ মধ্যরাত্রের কিছু পরেই আমরা ৮৪ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ অতিক্রম করলাম। এখন আমরা দিগ্‌দর্শনযন্ত্র বিকলের হদ্দোয় পড়ে গেছি, কাজেই দ্রাঘিমাবিপত্তির হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। আমাদের বাড়তি জাইরোকে এখন উত্তরদিক দর্শনের দিকে চালিত না রেখে দিকানুসরণের পথে চালু করা হল। আমরা যখন পৃথিবীর উত্তরতম স্থলের কাছাকাছি পৌছবো তখন প্রধান জাইরো প্রায় অকেজোই হয়ে যাবে—সেই সময়ে আমরা গৌণ জাইরোর সাহায্যে পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধের চক্রবৃত্ত পরিক্রমার মাধ্যমে দিক নির্ণয় করতে পারবো। এতে দক্ষিণে অগ্রসর হওয়ার পথ-সূত্র পাবো।

আমাদের জাইরো কম্পাসগুলোকে যথাসাধ্য নির্ভুল ও সক্রিয় রাখার জন্য জাহাজের দিক বা গতিবেগ পরিবর্তন ধীরে ধীরে সম্পাদন করছি। যখন আমাদের ওপরের দিকে ওঠার দরকার হচ্ছে তখন হয়ত দু-এক ডিগ্রার কোণের পার্থক্য বজায় রেখে উঠছ—সাধারণতঃ এরকম ক্ষেত্রে বিশ ত্রিশ ডিগ্রি কোণের পার্থক্য ঘটে, আমরা বর্তমানে তা হতে দিচ্ছি না। মাত্র একবার বাইশ ডিগ্রি কোণে বাঁক নেওয়া দরকার হ'ল—তখন ছ মিনিট ধরে একটু একটু ক'রে ঘুরে তবে নতুন দিকে জাহাজের খোলটা পৌছলো।

আমরা উত্তরমেরুর কাছাকাছি এসে পড়েছি। পৌছতে আর দেরি নেই। টম কার্টিস ইনার্সিয়াল নেভিগেটরটা খুব সন্তর্পণে পরিচালনা করছে। বেলা দশটার সময় আমরা ৮৭ ডিগ্রি অক্ষাংশ অতিক্রম করলাম—অর্থাৎ গত বছরের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেল।

এখন আমরা চলেছি ঐতিহাসিক পথিকৃৎ হয়ে—এ পথে আমরাই প্রথম যাত্রী, প্রতিটি মাইলে আমরাই প্রথম মানুষের স্পর্শাঙ্ক স্থাপন করছি।

মেরু থেকে দু-ঘণ্টার দক্ষিণ পথে নটিলাসের মধ্যে অভূতপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি হ'ল। জাহাজের সবাই চনমন করছে—গর্বে তাদের বুক ফুলে উঠেছে। ফ্রাঙ্ক এ্যাডাম্স ইলেকট্রনিক গীয়ারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, মুহূর্তে মুহূর্তে উল্লাসধ্বনি ক'রে উঠছে। সাধারণ কোনো কথাই যেন তার মনঃপুত নয়, নটিলাসের বিজয় গৌরব ঘোষণার অদম্য উৎসাহে নতুন, অভিনব কিছু বলবার লোভে সে চেঁচিয়ে উঠল 'Fan-damn tastic.'

॥ বাইশ ॥

আমরা যখন উত্তরমেরু পার হবো তখন সেই স্মরণীয় লগ্নকে অভিনন্দিত করবার জন্যে কোনো ঘণ্টাধ্বনি হবে না জানি, আমাদের জাহাজে বা দেহে কোনো পৃথক শিহরণ জাগবে না তাও জানি। কেবলমাত্র আমাদের যন্ত্রগুলোর নৈকট্যের সংকেত সূচিত হবে, আমরা জানবো আমরা মেরুরেখায় প্রবেশ করলাম, আমরা চোখে দেখব, যন্ত্রের কাঁটায় পড়ে' জানবো যে আমরা মেরু অতিক্রম করেছি। যেহেতু আমাদের সংকল্প রয়েছে মেরু অতিক্রম করবো, সেহেতু মেরুর মর্মবিন্দুই আমরা ভেদ করতে বদ্ধ পরিকর। শেপ্ জেঙ্কস আর তার সহকারী লাইল রাইলের সঙ্গে আমিও আক্রমণ কেন্দ্রে যোগ দিলাম। যদিচ এই গ্রহের বাসিন্দার পক্ষে যতখানি উত্তরে পৌঁছনো সম্ভব, আমরা সেই রেখার কাছাকাছি হাজির হয়েছি, তবু ইলেকট্রনিক অবস্থান নির্ণায়ক যন্ত্রের সূক্ষতম আধডিগ্রি চুলচেরা আঙ্কিক হিসাবটুকু পর্যন্ত মিলিয়ে আমাদের জাহাজের হালকে চালাচ্ছি।

এখনও পর্যন্ত আমরা সিয়াট্লের ঘড়ি অনুসারে সময় ধরে চলেছি—এখন সন্ধ্যে সাতটা, নটিলাস আনবিক শক্তিতে ১২৪০০০ মাইল জলপথ অতিক্রম করেছে। বেশ বহাল তবিয়তেই নটিলাস চলছে। গতিবেগ এখন ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল! চারশ ফিট গভীর সমুদ্রতল দিয়ে চলেছি আমরা। অনন্ত মেরুতুষার আট থেকে আশি ফিট পর্যন্ত নীচে উঠছে নামছে।

কল্পনায় অনুমান করছি বরফের মাথার ওপরে তীক্ষ্ণ মেরুপবন প্রচণ্ড বেগে শূন্যলোককে তচ্নচ্ ক'রে দিচ্ছে।

বরফের তলায় আমাদের বাষট্টি ঘণ্টা কেটে গেছে। এখন আর

আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের সাহায্যে আমাদের অবস্থান নির্ণয় সম্ভবপর নয়। নক্সা আর মানচিত্রের সঙ্গে আমাদের গতিবেগ এবং নির্দেশক যন্ত্রের হিসাব মিলিয়ে অবস্থান নিরূপণ ছাড়া অন্য পথ আমাদের নেই—ঘণ্টায় দু'বার করে এইভাবে আমরা দিক্‌নির্ণয়ের অঙ্ক মেলাচ্ছি। পূর্ব-নির্ণীত উপরিতলের হিসেবের সঙ্গে আমাদের ফ্যাদোমীটারের হিসেবের পার্থক্য বিস্তর, কোথাও কোথাও আট হাজার ফিটের ও ইতরবিশেষ দেখা যাচ্ছে—কাজেই প্রাক্তন তথ্যবিবরণের ওপর ভরসা ক'রে পথ চলা অনর্থকর। এই সমুদ্র এতকাল অপরিজ্ঞাত বা এর কোনো জরীপ হয় নি, এখানে আমাদের একমাত্র ভরসা ইনার্সিয়াল নেভিগেটর। আমরা যে মুহূর্তে মেরু অতিক্রম করব অমনি নেভিগেটরে তার সঙ্কেত নির্দেশিত হবে। আমরা যতোই এগিয়ে যাচ্ছি টম কার্টিসের চোখ দুটো কাঁটার ওপর ততোই যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ছে।

আমরা যখন মেরু থেকে এক মাইল দক্ষিণে তখন জেঙ্কসকে বললাম, ইলেকট্রনিক বিবরণীতে মাইলের দূরত্ব ভেসে ওঠা মাত্র যেন সে আমাকে জানায়। মাইল প্রদর্শক কাঁটাটা খরবেগে এগিয়ে চলেছে। আর কয়েক সেকেণ্ডের ওয়াস্তা। নটিলাসের সব জাহাজী আক্রমণ কেন্দ্রে আর জাহাজী মেসে জমায়েৎ হয়েছে।

জেঙ্কসের সঙ্কেত পাওয়া মাত্র আমি জাহাজের সাধারণকে সম্বোধনের মাইকের সামনে গিয়ে ঘোষণা করলাম:

"জাহাজের যে যেখানে আছো শোনো! ক্যাপ্টেন কথা বলছে। আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই নটিলাস সেই জায়গায় পৌঁছবে, যা এতদিন মানুষের কাছে স্বপ্ন ছিল, কল্পনা মাত্র ছিল, যেখানে পৌঁছবার স্বপ্নই এতকাল দেখে এসেছে মানুষ সেই ভৌগোলিক উত্তর মেরুতে জাহাজ করে পৌঁছানো সত্যিই সম্ভব হতে চলেছে। ঈশ্বরের অভিপ্রেত অপ্রতিহত গতিতে আমরা আর মাত্র দুদিনের মধ্যেই এক বৃহত্তর ঐতিহাসিক নিদর্শন স্থাপন করবো—আমরা ক্ষিপ্র গতিতে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আটলান্টিক মহা-সমুদ্রে মেরুপরিক্রমার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অভিযান সম্পাদন করবো।

"মেরু-স্পর্শ করতে আমাদের আর এক মাইলের দশ চতুর্থাংশ মাত্র বাকী। এই সময়টুকু আমরা মৌন হয়ে পৃথিবীর সুদীর্ঘ শান্তি প্রার্থনা

করবো, আর যে আশীর্বাদের বলে এই দুঃসাধ্য অভিযান সফল হয়েছে সেই কল্যাণ বিধাতাকে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করবো, আর আমাদের পূর্বসূরীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবো—শান্ত মৌন একাগ্র অন্তঃকরণে।"

জুক্‌বক্সের গান বন্ধ হল। গোটা জাহাজটা যেন স্তব্ধ নীরবতায় থমকে গেল। একমাত্র সোনারের শব্দ ভেসে আসছে, সোনার তখনও সমুদ্র-জলের বিবরণ লিপিবদ্ধ করছে, বরফের তল্লাসী করছে, সামনের অন্ধকারাচ্ছন্ন জলের খবরদারী করছে। সোনারের সঙ্কেত ছাড়া আর কোনো শব্দই যেন বিশ্ব জগতে নেই!

আমি দূরত্বমাপক যন্ত্রের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছি—"স্থির হও! ১০....৮....৬....৪....৩....২....১ লক্ষ্য করো! আগষ্ট ৩, ১৯৫৮। সময় ১১-১৫। যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় নৌবিভাগের পক্ষে উত্তরমেরু।"

জাহাজীদের মেসে হর্ষোল্লাসধ্বনি হচ্ছে, আমি শুনতে পাচ্ছি।

উৎসুক আমি টম কার্টিসের দিকে তাকাই—সে হাসছে। ইনার্সিয়াল নেভিগেটর আমাদের আশানুযায়ী উত্তরমেরু অতিক্রমের সঙ্কেত ঘোষণা করেছে, গানের সুরে কার্টিস বলে উঠল—"সত্যি ক্যাপ্টেন! তুমি স্বচ্ছন্দে বলতে পারো যে আমরা উত্তর মেরুকে ফুঁড়ে ফেলেছি।"

স্তব্ধ হয়ে গেলাম। নটিলাস যে অসাধ্য সাধন করেছে সেটা স্থির হয়ে অনুভবের চেষ্টা করি। সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে উত্তর পশ্চিমে এক নূতন পথ আবিষ্কার ক'রে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি উন্মোচন করেছে—এই পথে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আটলান্টিকে পৌঁছনো যায়, কম সময়েই পৌঁছনো যায়, পানামার পথ যদি রুদ্ধ থাকে তাহলেও কোনো অসুবিধে নেই। যদি কখনও বাণিজ্যপোতে আনবিক শক্তি ব্যবহার করা হয়, এবং এই পথে ইউরোপ যাওয়া হয়, তবে এই ৪৯০০ মাইল রাস্তা তেরো দিনে অতিক্রম করা যাবে, জাপান ঘুরে যাওয়ারও দরকার হবে না। নটিলাস নবযুগের প্রবর্তন করল, বিস্তীর্ণ এবং বিঘ্নসঙ্কুল উত্তরমেরুকে জয় করেছে সে। আমাদের যন্ত্রপাতিগুলো এখন মেরু অববাহিকা এবং তার পথ পরিচয়ের নিখুঁত এবং পর্যাপ্ত সংবাদ ও নক্সা দিয়ে চলেছে। নটিলাসের এই বিজয়কেতন সত্যিই যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক উন্নতির এক নাটকীয় নিদর্শন একথা স্বীকার করতেই হবে, এবং আশা করা যায় যে, মার্কিনী বৈজ্ঞানিক চরমোৎকর্ষ

খুব শীগ্‌গিরই রুশীয় স্পুট্‌নিকের গৌরবের সমকক্ষতা অর্জন করবে, এমন কি তাকে অতিক্রম করাও বিচিত্র নয়! আর একথা ত ঠিক যে, এক বিশ্বইতিহাসে এই প্রথম জাহাজ উত্তর মেরু স্পর্শ করল, একশ' ষোল জন নাবিক সমেত এই জাহাজ এখানে এল!

নটিলাসের গৌরবে আমি গর্বিত, কিন্তু এর মধ্যে আমার ব্যক্তিগত অবদান বা কৃতিত্ব কিছু আছে এমনটি মনে ঠাঁই দিই নে। বহুজনের মিলিত চেষ্টার ফলেই এ ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে। আমার মনে স্বস্তি, প্রাণে শান্তি, সর্ব সত্তায় পরিতৃপ্তি এই যে, দু-দুটো ব্যর্থ প্রয়াসের পর আমরা এবার উত্তীর্ণ হয়েছি—এত লোকের কতো মেহনৎ উদ্বেগ, উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত সার্থক হয়েছে।

সঠিক মেরুবিন্দুতে আমি কতকগুলি তথ্য লিপিবদ্ধ করেছি, সেগুলো কাজে লাগুক বা না লাগুক আমি আমার কাজ করেছি; এখানে জলের উত্তাপ ৩২·৪ ফারেন্‌হাইট, সমুদ্রের গভীরতা ১৩,৪১০ ফিট, (আইভান পাপিনিনের বিবৃত গভীরতার চেয়ে ১৯২৭ ফিট গভীর। পাপিনিন্ নামক একজন রুশ বৈজ্ঞানিক, দাবি করা হয় যে, তিনি ১৯৩৭ খৃঃ অব্দে এরোপ্লেনে ক'রে এখানে নেমেছিলেন। ১৯০৯ খৃঃ অব্দে এ্যাড্‌মিরাল পিয়োর নির্ণয় করেছিলেন এখানকার সমুদ্রের গভীরতা ৯০০০ ফিটের অধিক)। আমাদের বরফ-মাপার যন্ত্রে মেরু বরফের গভীরতা জলের নিচে পঁচিশ ফিট।

মেরু অতিক্রমের পর আমি জাহাজীদের মেসের দিকে চললাম, সেখানে 'উত্তরমেরু পার্টিতে' যোগদান করতে হবে। সেখানে পৌঁছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম—আমাদের এ ঐতিহাসিক অভিযানের সাফল্যের মূলে তাঁর ঐকান্তিক অবদান কে অস্বীকার করবে।

কয়েক মিনিট হ'ল তাঁর উদ্দেশে আমি যে প্রতিবেদন রচনা করেছি, তার পরিশেষে লিখেছি: আপনি আমাদের এই অভিযানের সাফল্য-স্মারক পত্রখানিকে যুক্তরাষ্ট্রে এক তাৎপর্যময় অভিযানের চিহ্ন ব'লে গ্রহণ করুন এই আমাদের [illegible] জাহাজীদের মেসে বাহাত্তর জন নাবিকের সামনে আমি এটা পড়ে স্বাক্ষর করলাম। আরও একটি পত্র লেখা হ'ল শ্রীযুক্তা আইসেন্‌হাওয়ারকে [illegible] নটিলাসের অভিষেক করেছিলেন।

এর পরে বিস্তর বিস্তর অনুষ্ঠান হ'ল। বিশেষ করে এই উদ্দেশে জ্যাক্ বেয়ার্ড যে 'চতুর্থ পোল্' কেক্ বানিয়েছিল সেটা কেটে সবাইকে বিলোনো হ'ল, খাওয়া হ'ল : ইলেক্‌ট্রিশিয়ান শাখার মেট জেম্স সার্ভেন্টে সবার আগে ডান হাত তুলে উত্তর মেরুর প্রথম মানুষ ব'লে গণ্য এ তালিকাভুক্ত হ'ল। বিশেষ এক অভিনব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আরো এগারজন 'আনবিক সাবমেরিণে পারদর্শী' গণ্য হ'ল। আমাদের বিশেষ পুরস্কারের নাম হল 'প্যানোপো (Panopo)- অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত পুরস্কারের অনুরূপ এর মর্যাদা। উত্তর মেরু স্মারকচিহ্ন সম্বলিত পোষ্টকার্ড প্রত্যেকের হাতে একখানা করে দেওয়া হল। কার্ডের উল্টোপিঠে ম্যাকনালির আঁকা একটি ব্যঙ্গচিত্র : স্নানের পোশাক পরা এক নাবিক, বরফের ওপর উত্তর মেরু'র গায়ে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কার্ডে লেখা রয়েছে—'রৌদ্রোজ্জ্বল পানামার অভিনন্দন।' উৎসবের সময় সর্বদা চলচ্চিত্র গ্রহণ করা হচ্ছিল, তা ছাড়া এমনি ফোটো না কত তোলা হয়েছে তার হিসেব নেই।

এরপর সান্টা ক্লজের পোশাকে আমাদের বিশিষ্ট নাগরিক ম্যাকনালী হাজির হল। মুখময় লাল রং লেপ্টে মাখানো, ডাক্তারী তুলো দিয়ে দাড়ি বানিয়েছে, আর স্যুটের তলায় বালিশ পুরে—সে এক বিচিত্রদর্শন জীব।

সান্টা আমাদের ধম্‌কাতে লাগল—এই বিশ্রামের সময় তোমরা আমার রাজ্যে ঢুকে হামলা জুড়ে গর্হিত কাজ করেছ। তা ছাড়া আমার এখানকার আইন কানুন ভেঙেছ, ময়লা সাফ করার যন্ত্র ঠিকমত ব্যবহার করতে পারো নি ইত্যাদি। আমি সান্টাকে অনেক কাকুতিমিনতি করে বললাম, —'জাহাজের এইসব ছোক্‌রা কিছু না জেনেই আইন ভেঙে ফেলেছে। যা-ই হোক, এরপর যাতে আর কোনো বেআইনী বেয়াদপী না করে তার ভার আমি নিচ্ছি।'

হাঁপাতে হাঁপাতে সান্টা বলল—'যাক গে! ঠিক আছে, আমার দাঁড়াবার ফুরসুৎ নেই। এখুনি মেরুতে ফিরতে হবে! দেখি গিয়ে বেঁটে ভূতগুলো আবার ফাঁকিবাজী করছে কি না।' এই হল উৎসবের শেষ অনুষ্ঠান।

জুক্‌বক্স আবার চালু করা হল। জাহাজীরা যে-যার বাঙ্কে গেল একটু গড়িয়ে জিরিয়ে নিতে।

সেদিন আমাদের সংবাদপত্রের বিশেষ 'নটিলাস এক্সপ্রেস প্রবন্ধ—উত্তরমেরু সংস্করণ' প্রকাশিত হল। আজকের কাগজটায় তেমন রং-মশলা নেই, অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হওয়ার মতো একটি অক্ষরও লেখা খুঁজে পেলাম না। বুঝলাম, সকলেই নটিলাসের সাফল্যে অভিভূত। পত্রিকার সম্পাদক জন মিকাউডের লিখিত স্তম্ভে জাহাজের প্রতিটি প্রাণীর মানসিক অবস্থা প্রতিধ্বনিত হয়েছে :

নটিলাসের জীবনের মহত্তম মুহূর্ত!

এবার নটিলাসের নাবিকেরা যে মহৎ ব্রতে সিদ্ধিলাভ করেছে তা একমাত্র শান্তিপ্রিয় জাতির সমবেত নিষ্ঠার দ্বারাই সম্ভব। আমরা আজ যে বিন্দুতে পৌঁছেছি ইতিপূর্বে সেখানে কোনও মানুষই আসতে পারে নি। অবশ্য দুঃসাহসী মানুষ একাধিকবার এই চেষ্টায় ব্যাপৃত ও ব্যর্থ হয়েছেন। যাঁরা এই পথে আমাদের অগ্রযাত্রী তাঁরা যেন আমাদের ক্ষমা করেন। তাঁদের যে সাহস ও অধ্যবসায় ছিল, হয়তো আমাদের তা নেই, সারা জীবন তপস্যা করলেও সেই ধৈর্য, সাহস, কষ্টসহিষ্ণুতা আমরা অর্জন করতে পারবো না। আমাদের এই যাত্রার সুকৃতি তাঁদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করছি। আমরা উত্তর মেরুতে পদার্পণ করেছি। একথা সত্য যে আমরা যে কৃত্রিম যন্ত্রের সহায়তা নিয়ে এখানে পৌঁছেছি সেটা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক বস্তু নয়। এই নতুন শক্তির সহায়তা ছাড়া কিছুতেই আমরা লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারতাম না, তা জানি। এই শক্তিই আবার আমাদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে—নিয়ে যাবে তাদেরই কাছে যারা প্রাণ দিয়ে আমাদের ভালোবাসে। যারা মুখ বুজে আমাদের এই ব্রতের জন্য বহু দুর্ভোগ ভুগেছে, কৃচ্ছ্র সাধন করেছে। তাদের সেই দুঃখকষ্টের কথা কোনদিনই উচ্চারণ করবে না। তারা আমাদের প্রিয়। তাদের অশ্রুসজল দৃষ্টি আমাদের যাত্রাপথের দিকে জিজ্ঞাসু ঔৎসুক্য নিয়ে আজও প্রতীক্ষা করে রয়েছে। ওরা জানে আমরা কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে যাত্রা করেছি—গত বছর আমরা ঘরে ফেরার পর থেকেই ওরা টের পেয়েছে, কিন্তু আমরা কোনো কথা তাদের বলতে পারি নি ত! অন্যযুগের অভিযাত্রীদের আত্মজনের মতে ওরা সোচ্চারে শুভকামনার বাণী প্রকাশ করতে পারে নি ত! ওদের সেই অহল্যা প্রতীক্ষাই ঈশ্বরের দরবারে আমাদের নিরাপত্তা মঞ্জুর করিয়েছে।

আমরা এবার ফিরব। কতো কথা, কতো আশার রঙীন স্বপ্ন জাল বুনছে তাদের ঘিরে আমাদের মনোলোকের মহাকাশে! এই অভিযাত্রা আমাদের সকল নাবিকের কাছেই বড় হৃদয়স্পর্শী হয়েছে, এই যাত্রার সুখস্মৃতি আমাদের জাহাজী জীবনের মহত্তম সঞ্চয়। পূর্বে যাঁরা অভিযাত্রা করেছেন তাঁদের উদ্দেশে সশ্রদ্ধ নমস্কার আর ভবিষ্যৎ অভিযাত্রীদের জন্য রইল আমাদের কল্যাণ কামনা। ঈশ্বরের কৃপায় তাদের যাত্রা যেন শুভ হয়, নির্বিঘ্ন এবং সফল হয়।

॥ তেইশ ॥

আমাদের একটি লক্ষ্য বিদ্ধ হয়েছে—উত্তরমেরু বিজয়পর্ব সমাধা হয়েছে, কিন্তু আমাদের অপর লক্ষ্য যার গুরুত্ব আরও তাৎপর্যময়, সেটা এখনও অসম্পূর্ণ রয়েছে, সেটা সাধিত হওয়া চাই : প্রশান্ত মহাসাগর থেকে মেরুপরিক্রমা ক'রে আটলান্টিক মহাসমুদ্রে অবতীর্ণ হওয়া এখনো বাকী।

এ পথের প্রথম সার্থক অভিযাত্রী হবো আমরা! অবশ্য সফরের লম্বা পাড়ি ত মেরেই দিয়েছি, এখন সুভালা-ভালি বাকীটুকু পার হলে আমরা আর দেড় দিনের মধ্যেই গ্রীনল্যাণ্ড স্পিট্‌স্‌বার্জেনের খোলা দরিয়ায় খেয়া দিতে পারবো।

একই পথ ধরে আমরা দক্ষিণাভিমুখে এগিয়ে চলেছি। আমাদের 'মাস্টার কম্পাস'কে আস্তে আস্তে নতুন নির্ণয়পথে স্থাপন করা হ'ল। আমাদের গৌণ জাইরো কম্পাস এখনো পৃথিবীর গতিবেগের সঙ্গে তাল রেখে উত্তরের নিশানা দেখিয়ে চলেছে—এতে হালের লোকেদের খুব আপত্তি, তারা বলে যে, কম্পাসে উত্তর দিকে নিশানা দিলে কি ক'রে দক্ষিণে চলা যায়!

সি এন ও আমাকে বলেছিলেন যে, উত্তর মেরু পৌঁছেই যেন একটা খবর তাঁকে দিই—কিন্তু একটা প্রণালী বা বরফ-ছাড়া জল না পেলে, ওপরে উঠতে না পারলে ত সেটা সম্ভব হচ্ছে না। যাই হোক। খবরের একটা খসড়া তৈরী করে রাখলাম। খুব ছোট্ট খবর! 'নটিলাস, উত্তরে ৯০ ডিগ্রি'। একটুখানি ফাঁকা জলের ব্যর্থ-সন্ধানে অনেকক্ষণ কাটলো। মাথার ওপরে বরফ, গভীর সমুদ্রজলে নেমে এসেছে। এই জমাট বরফের মধ্যে বিন্দুমাত্র ছেদ নেই। কাজেই, একান্ত গোপনীয় সংবাদটা আমার পকেটেই গোঁজা রইল।

আবার পুরনো নিয়মের ছকে নটিলাসের দৈনন্দিন জীবনছন্দ চলতে

শুরু করল। এখন আমরা গতিবেগ ত্রিশ মাইলের চেয়েও বাড়িয়ে দিয়েছি। আজ অগাস্টের চার তারিখ, সকাল সাতটা, উত্তরমেরু এখন আমাদের ২৪০ মাইল পিছনে—মাষ্টার জাইরো এখন তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে, আমাদের প্রধান হলধর ডানিয়েল ব্রিগ্ম্যান স্বাস্তর নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচল। এখন কম্পাস দক্ষিণ দিকের নিশানা দিচ্ছে, কাজেই তার আর দক্ষিণে চলতে অসুবিধে নেই।

মাষ্টার জাইরোর মাথা স্বাভাবিক হওয়ার পর আমিও ভরসা পেয়ে পথের বাঁক বদলের নির্দেশ দিলাম। নেভিগেটরকে স্পিট্স্‌বার্জেন আর গ্রান্‌ল্যাণ্ডের দিকে মুখ করে চলতে বললাম। এই অনুরোধ রক্ষা করা সহজ ব্যাপার নয়। আমরা হিসেব ক'রে দেখলাম যে, প্রতি বিশ মিনিট অন্তর একদফা পথের তো গতি এক ডিগ্রি বদল করতে হবে, এইরকম পরিবর্তন ছাব্বিশ বার প্রয়োজন! তাই করা হোক।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা, আমাদের নোভগেটরের হিসেবে দেখা গেল যে, ১৯৫৭-তে নটিলাস যেখানে এসেছিল সেই জলে আমরা পৌঁছলাম। আমাদের পুরনো নক্সানজীরের সঙ্গে ফ্যাদোমীটারের বিবরণে ফারাক হচ্ছে, আগের বারে যে-সব তথ্য সংগ্রহ করেছি তার সঙ্গেও মিলছে না এখনকার জলের অবস্থা—এতে অনেকেই উদ্বেগ বোধ করতে লাগল। আনুপূর্বিক পর্যবেক্ষণ ক'রে আমি বুঝলাম যে আমরা উত্তর-পশ্চিমে রয়েছি—পথের গতি দক্ষিণের পূর্বে স্পিট্স্‌বার্জেনের দিকে সরিয়ে নেওয়ার হুকুম দিলাম।

কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল। অগাস্টের পাঁচ তারিখ ভোর চারটে নাগাদ আমরা অল্প একটু খোলা জলের তলা দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। কিন্তু তারপরই আমাদের সোনারে খবর এল, বিরাট একটা বরফের স্তূপ—কম ক'রে বারো মাইল এর পরিধি।

সোনারের কাছে গিয়ে ব্যস্ত ভাবে বল্লাম—"গ্যাখো, ঠিক ক'রে গ্যাখো!" গত বছরে ত এই এলাকায় এ-ধরণের বরফ পাই নি! সে ত ছিল টুক্‌রো-টাক্‌রা ছাড়া-ছাড়া চাঙড়্! বারো মাইল একটানা বরফ ত দেখিনি এখানে!

এদিকে ফ্যাদোমীটারে সমুদ্রের গভীরতা ২৪০০ ফিট—আমাদের নথি-

পত্রের হিসেবের চেয়ে এখানকার গভীরতা অনেক বেশি। তাছাড়া গত বছরেও এত গভীর জল পাই নি। নক্সার ওপর নজর রেখে পরখ করলাম। নক্সাতে একমাত্র মেরুর কাছাকাছি ২৪০০ ফিট গভীরতার বিবরণ পাচ্ছি। ঘাবড়ে গেলাম। তবে কি যন্ত্র আমাদের বিগ্‌ড়েছে? আমরা কি চক্রাকারে ঘুরপাক খাচ্ছি? তা-ই বা কি ক'রে হয়! নানাভাবে আমাদের যাত্রাপথের হিসেব নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। দুশ্চিন্তা ঝেড়ে মুছে ফেললাম, ভাবতে লাগলাম, হয়তো একটা উটকো বরফের সঙ্গে হঠাৎ মুলাকাত হয়েছে আমাদের।

কিন্তু এর কিছুক্ষণ পরেই সমুদ্র জলের উত্তাপ-পরিমাপক যন্ত্রে মারাত্মক সংবাদ মিলল—সমুদ্র-জলের তাপমাত্রা কমছে। অথচ দক্ষিণের জলে স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী জলের তাপমাত্রা বাড়বার কথা। আমরা কিছুতেই উত্তর গ্রীণল্যাণ্ডের কাছে আসতে পারি না। কি করে তা সম্ভব?

কিন্তু মনের মধ্যে দুশ্চিন্তা জট পাকাতে লাগল: আমরা কি দ্রাঘিমা-বিভ্রান্তির চক্রে পড়েছি? নাকি কোনো অজানা সাগরের দিকে এগিয়ে চলেছি আমরা? তাহলে কি আমরা পূর্ব সাইবেরিয়ার সাগর অভিমুখে চলেছি?

আমার মন যখন এইসব ভাবনার উত্তাল তরঙ্গে বিক্ষুব্ধ তখন হঠাৎ কনিং অফিসার খবর দিল যে, এক ঝলক নীল জলের তলা দিয়ে আমাদের জাহাজ চলে এসেছে। আমি পেরিস্কোপের দিকে দৌড়লাম। কাচের ভেতর দিয়ে দেখলাম ঘন নীলসবুজে মাখামাখি জল। তন্ময় হয়ে সেই জল দেখতে লাগলাম। ভালো করে লক্ষ্য করলাম—এক মিনিট কেটে গেল—পাঁচ মিনিট—দশ মিনিটও পেরিয়ে গেল। এদিকে ততক্ষণে আমাদের সন্ধানী-যন্ত্র খবর দিল-মাথার ওপরটা একেবারে পরিষ্কার—মুক্ত জল!

জাহাজের গতিবেগ কমাতে বললাম।

তারপর আস্তে আস্তে পেরিস্কোপ-গভীরতায় উঠে এলাম-পাছে কোনো পাত্‌লা বরফের পাত আমাদের ঠেকায় এই ভয়ে খুব সাবধানে উঠছি। জাহাজ থামিয়ে আবার নামলাম, আমাদের বরফসন্ধানী যন্ত্রটা বাগিয়ে ওপরটা ভালোভাবে পরখ করে নিলাম। একটু একটু করে সমুদ্রের মাথার দিকে উঠতে লাগলাম। স্কোপের ভেতর দিয়ে ওপরের ঢেউ-এর

খেলা দেখতে পাচ্ছি। তারপর জলের বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে পেরিস্কোপ ওপরে উঠে পড়ল। এক ঝলক চকচকে রোদ ঠিকরে পড়ল কাচের গায়ে।

হঠাৎ রৌদ্রকিরণে চোখ দুটো ধাঁধিঁয়ে গেল, আমি পিছু হঠে এলাম। লেঃ কেন্ কার বলে উঠল 'ক্যাপ্টেন! সূর্যের আলো চিরকাল নটিলাসকে উদ্ভাসিত করে!'

জলের উপরিভাগটা খুব খুঁটিয়ে দেখছি, ছোট ছোট বরফের টুকরো ভাসছে। তবে ভরসা এই যে, বড় চাঁই নেই। জাহাজের পেরিস্কোপ জখম করার বেয়াড়া শখ আমার নেই। আবার রেডিওর লোকদের দিয়ে কাজ করাতে হবে, জাহাজকে আরও ওপরে ওঠাও যতটা পারা যায় রেডিওর যন্ত্রকে উঁচুতে ওঠাও।

এখানকার তরঙ্গভঙ্গের ছন্দ দেখে বোঝাই যাচ্ছে যে আমরা এখন খোলা জলের স্রোত পেয়ে গেছি। ১৯৫৭তে যে গ্রীন্‌ল্যাণ্ড দারিয়ায় যে জল আমরা পেয়েছিলাম এ যেন সেই জল মনে হচ্ছে। পশ্চিম আর দক্ষিণ থেকে যে বরফের স্তূপ আমাদের পানে ঝুঁকে ঘিরে রয়েছে সেই দিকে তাকিয়ে আমাদের ধারণা হ'ল যে, জমাট বরফের এলাকা শেষ হয়ে গেছে। আমাদের অবস্থান সম্পর্কে বিশেষ কোনো সংশয় নেই। তবু এটুকু জানি সে মেরুপথে মিজোরী দিয়ে যাওয়াই সুবিধে।

সূর্যের অবস্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্য মিলিয়ে আমাদের নেভিগেটরে নির্ণয়-সঙ্গতি ঠিক করে নেওয়ার জন্য আমি উদ্‌গ্রীব।

আমরা দক্ষিণে এগিয়ে চললাম—পথে একটা বড় বরফের বিচ্ছিন্ন স্তূপকে পাশ কাটাতে হ'ল। এটা ওই মূল জমাট বরফের দেহ থেকে ছিট্‌কে চলে এসেছে। ওপারে যে ময়লা নোংরা বরফ দেখেছি এখানকার বরফ মোটেই সেরকম নয়—একেবারে উজ্জ্বল রজতশুভ্র এর কান্তি। একটা সীল মাছ বরফের ওপর রোদ পোহাচ্ছে। আমাদের দেখে তার ভাবগতিকে তেমন কোনো ইতরবিশেষ বদল হ'ল না! তার হাবভাবে মনে হল যেন, ওই জমাটবরফের ওপর থেকে সে হামেশাই ডুবোজাহাজ যাতায়াত করতে দেখছে।

জলের ওপর দিয়ে, ঘণ্টাখানেক সফরের পর জেঙ্কস আমাদের সঠিক অবস্থান সম্পর্কে পাকা খবর দিল। আমাদের অনুমান ভুল নয়, আমরা

গ্রীনল্যাণ্ডের উত্তরপূর্বে রয়েছি। আমরা ১৮৩০ মাইল চলে এসেছি। ছিয়ানব্বই ঘণ্টা বরফের নিচে কাটিয়েছি। আমরা যেখান থেকে সেবার ফিরে গিয়েছিলাম আর দশমাইলের মধ্যেই সেটা পাবো। সত্যি, এই জাহাজটার জুড়ি নেই, এ এক আশ্চর্য জীব। আনন্দে অধীর হয়ে আমি মাথা নেড়ে বলে উঠলাম "ফ্যান্‌ড্যাম্‌টাস্টিক!" জাহাজের সাধারণকে সম্বোধনের মাইকে খবরটা দিয়ে, চলে গেলাম রেডিও ঘরে খোঁজ নিতে—আমাদের বেতারবার্তাটা পাঠানো হ'ল কিনা দেখি!

এর আগেও দেখেছি মেরু অঞ্চলে বেতার সংযোগ এক ঝকমারী ব্যাপার। হ্যারি টমাস আর টেরেন্স প্রোভোস্ট অনেক চেষ্টা করেছে, এখনও হাল ছাড়েনি সমানে লেগে রয়েছে। বার বার টেলিগ্রাফের চাবিতে ঠুকে জানাচ্ছে "যুক্তরাষ্ট্রের যে কোনও নৌ-বেতার কেন্দ্র, শোনো আমরা অজানা কেন্দ্র থেকে কথা বলছি। দুটো খবর আছে, শোনো।" কোনও সাড়া নেই,—কেউ ধরছে না,—আমরা কারুর সঙ্গে যোগ স্থাপন করতে পারছি না।

এ এক দুঃসহ অবস্থা! আমাদের হাতে বিরাট চাঞ্চল্যকর সংবাদ মজুত, অথচ কেউ কান দিচ্ছে না!

একজন বলল "ক্যাপ্টেন আমাদের সঙ্গে কয়েকটা পায়রা আনা উচিত ছিল, তারা খবর বয়ে নিয়ে যেত।"

মনে মনে সংকল্প করলাম, আমরা ডুব দিয়ে তাড়াতাড়ি আরও দক্ষিণে চলে যাই, সেখানে অনুকূল আবহাওয়া মিললে তখন দেখা যাবে। হুকুম দিতে যাচ্ছি, এমন সময়ে একটা ক্ষীণ জবাব এল-'যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বেতার, জাপান কথা বলছি। বলো, তোমাদের খবর, পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

আমরা অনেক কষ্ট ক'রে, কয়েক মিনিটের চেষ্টায় আমাদের ঐতিহাসিক বার্তা "নটিলাস ৯০ ডিগ্রি উত্তরে" এই ক'টি কথা জাপান ঘুরিয়ে ওয়াশিংটনে পাঠাতে পারলাম।

আমাদের দ্বিতীয় সংবাদটা দেবার আগেই জাপানের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন হয়ে গেল। এবার অন্য একটা কেন্দ্র সাড়া দিল,—হনোলুলুর যুক্তরাষ্ট্রীয় নৌ-বেতার। তার মধ্যে রেডিও লণ্ডনডারি সাড়া দিল। হনোলুলুকে আমাদের খবরটা পাঠিয়ে দিয়েই আমরা জলের নীচে ডুব দিয়ে ডেনমার্ক-

প্রণালীর দিকে এগোতে লাগলাম। মানব সভ্যতার ইতিহাসে সম্ভবতঃ সবচেয়ে দুঃসাধ্য এবং চমকপ্রদ সমুদ্র যাত্রা "শুভদিনের যাত্রা" সম্পূর্ণ হ'ল!

এরপর নটিলাস দ্রুতবেগে ধেয়ে চলল— তারচেয়েও দ্রুততর গতিতে ঘটনার—ঘটনাস্রোত বয়ে চলল।

শুভদিনের যাত্রা পরিকল্পনার প্রথম আমলে প্রেসিডেন্টের নৌ-সহকারী ক্যাপ্টেন অরাগু আমাকে বলেছিলেন যে, যদি এই অভিযান সফল হয় তাহলে হোয়াইট হাউসের ইচ্ছে—সে সংবাদ ঝড়ের গতিতে দিকবিদিকে প্রচার করা হবে। সেই প্রচারের জন্য বিশেষ বন্দোবস্তও করা হয়েছে। জমাট বরফের এলাকা থেকে বেরিয়েই নটিলাস গোপনে চলে যাবে আইস্ল্যাণ্ডের রেক্জাভিকে। সেখানে তাকে লোকচক্ষুর দৃষ্টি এড়িয়ে অপেক্ষা করতে হবে—আকাশ, মাটি আর জলের ওপরে যারা চলাফেরা করছে তারা যেন নটিলাসের উপস্থিতি টের না পায়। এইখানে একটি হেলিকপ্টারের আসবার কথা রয়েছে। সেই হেলিকপ্টারকে আকাশে দেখতে পেলে পরে নটিলাস জলের উপর ভেসে উঠবে। তারপর আমি নটিলাস ছেড়ে হেলিকপ্টারে উঠে আইসল্যাণ্ডে পৌঁছবো। আইসল্যাণ্ডে এরোপ্লেন মোতায়েন থাকবে—ওয়াশিংটনে নিয়ে যাবার জন্য। সরাসরি প্রেসিডেন্টের সকাশে আমি অভিযানের সাফল্যের কথা জানাবো।

এই সম্ভাব্য কার্যসূচীর ভাবনা আমার মনকে খুব নাড়া দিয়েছে। আমি ভাবছি আর ভাবছি—জীবনে এত বড় সম্মানের অভিজ্ঞতা আমার ছিল না, কল্পনায়ও ছিল না, হয়তো এটাই হবে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় গৌরব।

এই সুযোগে আমি বনিকে দেখতে পাবো, কনেটিকাটের মিস্টিকে বনি রয়েছে, আমার আশাপথ চেয়ে প্রতীক্ষা করছে। আর এদিকে ডুবো-জাহাজের নিপুণতম এক্জিকিউটিভ অফিসার ফ্র্যাঙ্ক এ্যাডাম্স সাময়িক-ভাবে নটিলাসের কর্তৃত্বভার পাবে—এটাও আনন্দের কথা। আমার পক্ষে সে সব চেয়ে উদ্বেগের কথা এই যে, নটিলাসে আমার অনুপস্থিতে জাহাজের প্রত্যেক অফিসার আর নাবিক অনুভব করবে যে, আমাকে ছাড়াই তাদের বেশ স্বচ্ছন্দে চলে!

অগাস্টের সাত তারিখ সকালে আমাদের পেরিস্কোপে দেখা গেল একটা

হেলিকপ্টার আসছে। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিলাম তিনটে কামান দাগতে। আমাদের ওপরে ওঠার সতর্কতাসূচক ধ্বনি! তারপর পোশাকের ওপর একটা সর্বাবয়ব ঢাকা আচ্ছাদনে আমার পরিচয় গোপন ক'রে নিলাম। ফ্রাঙ্ক এ্যাডামস জাহাজের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করল। হেলিকপ্টারটা নেমে এল, সিঁড়ি আর জাহাজীদের সাহায্যে আমি তাতে উঠলাম।

হেলিকপ্টারে আমার পুরনো বন্ধু ক্যাপ্টেন অরাও বসে রয়েছেন। তিনি আমায় সাদর অভিবাদন ক'রে আমার হাতে প্রেসিডেণ্টের প্রেরিত বাণী দিলেন। তাতে লেখা রয়েছে:

'নটিলাসের অফিসার এবং নাবিকদের সমীপে: গৌরবময় সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

স্বাক্ষর করেছেন ডুইট্ ডি. আইজেনহাওয়ার।

আমরা নটিলাসের নাবিকদের হাতে এই বাণী অর্পণ করলাম।

এর পনেরো মিনিট পরেই হেলিকপ্টার এসে নামল কেপ্‌লার্ভিকে—একেবারে নৌ-বিভাগের বিমানের পাশে, এরোপ্লেনের ইঞ্জিন চালু রয়েছে। এক মিনিটের মধ্যেই প্লেনটা রাণওয়েতে দৌড় দিয়ে আকাশে উড়তে শুরু করল। আমরা দক্ষিণে চলেছি, মিনিটে চার মাইল বেগে—ক্রমে সকালের আলোটা মিলিয়ে গেল। আমার মন তখন নটিলাসে ফিরে গেছে। নটিলাস এখন আটলান্টিকের গভীর দরিয়ার নিচ দিয়ে পূবে যাত্রা করেছে; পোর্টল্যাণ্ড হয়ে ইংলণ্ডে যাচ্ছে। আমার চোখের সামনে নটিলাসের মসৃন চিক্কন দেহাবয়ব ভাসছে। তার হাঙরের মতো আকৃতির গহ্বরে আশ্চর্য আরামের অন্তরঙ্গতা। দেখতে পাচ্ছি, বরফ সন্ধানী যন্ত্রের মাধ্যমে সংগৃহীত বিবরণগুলো। তারপর—পয়েণ্ট ব্যারো ছাড়বার ছ'দিন পরে এই প্রথম আমার চোখের পাতায় ঘুমের ঢেউ নামল। কি আরামে যে চোখ দুটো বুজে এল, আমি টেরও পেলাম না।

আমাদের প্লেনের চাকা ওয়াশিংটন ন্যাশনাল বিমানবন্দরের রাণওয়ে ছুঁলো। একখানা গাড়ি অপেক্ষা করছিল, সেটা আমাদের সোজা হোয়াইট হাউসে হাজির করল। তার কয়েক মিনিটের মধ্যেই বনিকে আমার সামনে দেখে খুব অবাক হয়ে গেলাম। নৌ-বিভাগের আর একখানি বিমান ওকে মিষ্টিক থেকে তুলে এনেছে। এই বিস্ময়ের ঘোর

তখনো কাটিয়ে উঠতে পারি নি, আমার কানে কে যেন ফিস্ ফিস্ করে বলল—'প্রেসিডেন্ট অপেক্ষা করছেন।'

আমি এতই আচ্ছন্ন যে ঘাবড়াবার মতো অবস্থাও আমার আর নেই। উত্তর মেরুতে বসে যে চিঠি লিখেছি সেটা প্রেসিডেন্টের হাতে দিলাম। আর শ্রীযুক্তা আইজেনহাওয়ারকে নটিলাসের নাবিকদের পক্ষ থেকে যে বিশেষ উপহার এনেছি সেটাও তাঁর হাতে দিলাম—জাহাজের একটি ঘড়ি, যেটা আমাদের উত্তর মেরু অতিক্রমের সময় বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে, তাতে বাজছে সিয়াট্ল-সময় ৭-১৫। প্রেসিডেন্ট যৎপরোনাস্তি খুশি হয়েছেন, নটিলাসের জাহাজীদের উপর প্রসন্ন ত হয়েছেনই, ততোধিক উচ্ছ্বসিত তিনি উপঢৌকন পেয়ে। আমি শুধু বললাম; "আপনার সদাশয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এ অভিযান আদৌ সম্ভব হ'ত না।" আমার একথা মোটেই তোষামোদ নয়, কেন না আমি ত সবকিছুই জানি, এ বিষয়ে আমার চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না।

কিছুক্ষণ এমনি আলাপ-আলোচনা হ'ল। তারপর প্রেসিডেন্টকে অনুসরণ করে আমি আর বনি যে কক্ষে ঢুকলাম সেখানে ফোটোগ্রাফার সাংবাদিকে ঠাসাঠাসি। টেলিভিশন আর চলচ্চিত্রের ক্যামেরার ছড়াছড়ি। সেখানেই অভিযানের সংবাদ ঘোষণা করা হ'ল। এবং শান্তিকালীন অবস্থায় সেই প্রথম একটি অর্ণবপোতকে "Presidential Unit Citation" তিনি পুরস্কৃত করলেন।

ক্যাপ্টেন অরাণ্ড সেই সম্মানসূচক অভিনন্দন বাণী পাঠ করলেন।

বেরিং প্রণালী থেকে গ্রীন্ল্যাণ্ড সমুদ্রে মেরু তুষার মণ্ডলের তলদেশ দিয়ে বিশ্বইতিহাসে প্রথম সফল অভিযানের অতুলনীয় কৃতিত্বের জন্য! ২২-জুলাই থেকে ৫ অগাস্ট ১৯৫৮ এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীর প্রথম আণবিক শক্তি চালিত পোত ইউ, এস, এস, নটিলাস, মেরু সমুদ্র অতিক্রম করেছে, বেরিং সমুদ্র থেকে গ্রীনল্যাণ্ড সমুদ্রে—ভৌগোলিক উত্তর মেরুর তলদেশ দিয়ে তার ডুবো যাত্রা সফল হয়েছে। এই সফর সামুদ্রিক বাণিজ্যের এক নূতন পথ দেখিয়ে দিয়েছে—পৃথিবীর দুই প্রধান সমুদ্রের মধ্যে উত্তর ও পশ্চিমে এক নূতন রাস্তা খুলে দিয়েছে এই অভিযাত্রা। আণবিক শক্তির মালবাহী ডুবো জাহাজ ভবিষ্যতে এই পথের সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে।

যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তির সর্বোত্তম ঐতিহ্যের ধারারক্ষক হিসেবে নটিলাসের অফিসার আর নাবিকদের যোগ্যতা প্রশংসনীয়, তারা আমাদের দেশের জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে কর্ম ও মনোভাবের দিক দিয়ে অক্ষুণ্ণ রেখেছে, সমুজ্জ্বল করেছে।

সাংবাদিক-বৈঠকের পর বনি আর আমি এ্যাডমিরাল রিকোভারের দপ্তরে এলাম, তাঁকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য। তিনি খুব খুশির মৌজে ছিলেন। তাঁর কাছে বেশিক্ষণ থাকি নি। কেন না তিনি খুব ব্যস্ত। যদিও যে আণবিক শক্তি আমাদের সফরকে সাফল্য মণ্ডিত করেছে সেটা তাঁরই মানস পুত্র, তার সাফল্যে তিনিও খুশি তবু সেটা নিয়ে মাতামাতি করা তাঁর রীতিবিরুদ্ধ—তিনি এখন ভবিষ্যতের আণবিক সাবমেরিনের পরিকল্পনায় বুঁদ হয়ে রয়েছেন।

রবিবার ১০ অগাস্টে আমি আবার উড়োজাহাজে চড়ে নটিলাসকে ইংলণ্ডের পথে পোর্টল্যাণ্ডের বাইরে ধরবার জন্য যাত্রা করলাম। ইংলণ্ডের কাছাকাছি এসে প্যান আমেরিকান এয়ার লাইনের ক্যাপ্টেন বেতারে নটিলাসের সংগে যোগ স্থাপন করলেন। যা যা ঘটেছে তার বিবরণ বেতারে নটিলাসে জানালাম—বিশেষ ক'রে, দুনিয়াতে আমাদের সফরকে কেন্দ্র ক'রে যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে সেটাই বললাম। ফ্র্যাঙ্ক এ্যাডাম্‌স্‌কে জিজ্ঞাসা করলাম—আমার বাঙ্কের স্পর্শ তার কাছে আরামদায়ক হয়েছে ত? জাহাজীরা বি-বি-সির মাধ্যমে সব খবরেই ওয়াকেফহাল দেখলাম। এ্যাডামস বলল, এখনো পর্যন্ত ঘুমোবার ফুরসত ভাগ্যে জোটে নি।

মঙ্গলবার ১২ তারিখে আমি হেলিকপ্টারে চড়ে পোর্টল্যাণ্ডের থেকে জাহাজে উঠলাম। তারপর পুরোদমে দৌড়দানী ক'রে ইংলণ্ডে এক অভাবনীয় অভিনন্দন অভ্যর্থনা সম্বর্ধনার মধ্যে ইংলণ্ডে ছ'দিন কাটিয়ে অবশেষে ডুবো পথে ক্রুতির চরম নিউইয়র্কে পৌঁছলাম। এখানে সমারোহের অভিনব আ

বনি আর নটিলাসের অন্যান্য সকলের স্ত্রী-রা নিউ মঞ্চে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আমাদের জাহাজ তখন

ওদের দেখলাম। ওদের দেখে আমার মনে পড়ল চার্লস পেইনের কবিতার দুটি ছত্র, এই কবিতাটি আমাদের জাহাজের দৈনিক পত্রের বিশেষ উত্তরমেরু সংস্করণে ছাপা হয়েছিল। এই কবিতায় ওদের আত্মত্যাগের, ঐকান্তিক সমর্পণের প্রতি অকৃত্রিম মর্যাদা ব্যক্ত হয়েছে। সত্যি নটিলাসের সাফল্যের মূলে ওদের অবদান অতুলনীয়। পেইনের কবিতার সেই দুটি ছত্র আমার মনে গাঁথা রয়েছে :

"ওরা এমনিতে কিছুই চায় না। আমরা যা দিতে পারি না তা ওদের দাবি নয়—ওরা শুধু চায়, আমরা ঘরে ফিরি, আর চায়-সাধারণ গৃহস্থজীবন।"

আমরা ত এসেই পড়েছি, দেখতে পাচ্ছি বাড়ির কাছেই এসে গেছি। কিন্তু, যারা নটিলাসে কাজ করে তাদের কপালে সাধারণ গেরস্ত জীবন খুব কমই জোটে!